কেশবচন্দ্র
মণি বাগচি

কেশবচন্দ্র

মণি বাগচি

জিজ্ঞাসা । কলিকাতা

"Never again England heard from the East a voice like that of Keshub Chunder Sen. Here was a voice of rare power, eloquence and charm."

—*Rev. J. Eastline Carpenter*

VICE-PRESIDENT
INDIA
NEW DELHI
December 4, 1959.

Dear Shri Moni Bagchee,

Thank you for your letter of the 2nd inst.

The concept of Secular State does not mean that we should gipe up religions and run after comfort and security. It means that we should treat impartially all religions and emphasise their points of agreement. Shri Keshubchandra Sen did this important work years ago.

Yours sincerely,

(S. Radhakrishnan)

Shri Moni Bagchee,
Author & Journalist,
4/2B, Rajendra Lal Street,
Calcutta.6.

"To be great is to be misunderstood"—এমার্সনের এই কথাটি কেশবচন্দ্র সম্পর্কে যতখানি সত্য, উনিশ শতকের আর কোনো বরণীয় বাঙালি যুগনায়কের পক্ষে বোধহয় ততখানি সত্য নয়। তাঁহার নিকট হইতে আমরা অনেক বেশি পাইয়াছি বলিয়াই কি তাঁহাকে আমরা ভুল বুঝিয়াছি? স্বতন্ত্র জীবনানুভূতি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন কেশবচন্দ্র। সমন্বয়ের বার্তাবহ তিনি। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা দ্বারা তিনি শুধু একটি নবযুগই সৃষ্টি করিয়া যান নাই, জাতির চিত্তলোক পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন চিরকালের মতন। স্বাধীনতা ও মানবতা—এই দুইটি মহৎ আদর্শের অমূল্য সম্পদ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার জাতির হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে সেই ইতিহাস কিছুটা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

৪।২বি রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬
১৯৬০

মণি বাগচি

॥ উৎসর্গ ॥

"Young Bengal, this is for you."
—*Keshubchandra* in 1860.

॥ মণি বাগচির অন্যান্য বই ॥

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
মুস্তাফা কামাল পাশা
সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র
ছোটদের বার্ণার্ড শ
ছোটদের অরবিন্দ
ছোটদের বিবেকানন্দ
ছোটদের ছত্রপতি
ছোটদের গৌতমবুদ্ধ
মহাচীনে শ্রীনেহরু
বাংলা সাহিত্যের পরিচয়
কাজলরেখা
লীলা-কঙ্ক
অমর জীবন
নিবেদিতা
নিবেদিতা-নৈবেদ্য
গৌতম বুদ্ধ
সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস
সিপাহী বিদ্রোহ
বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র
আমাদের বিদ্যাসাগর
কেমন করে স্বাধীন হলাম
আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ
নানাসাহেব
রামমোহন
বিদ্যাসাগর
মাইকেল
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

SISTER NIVEDITA
OUR BUDDHA

॥ পরবর্তী বই ॥

শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার
র বি র আ লো
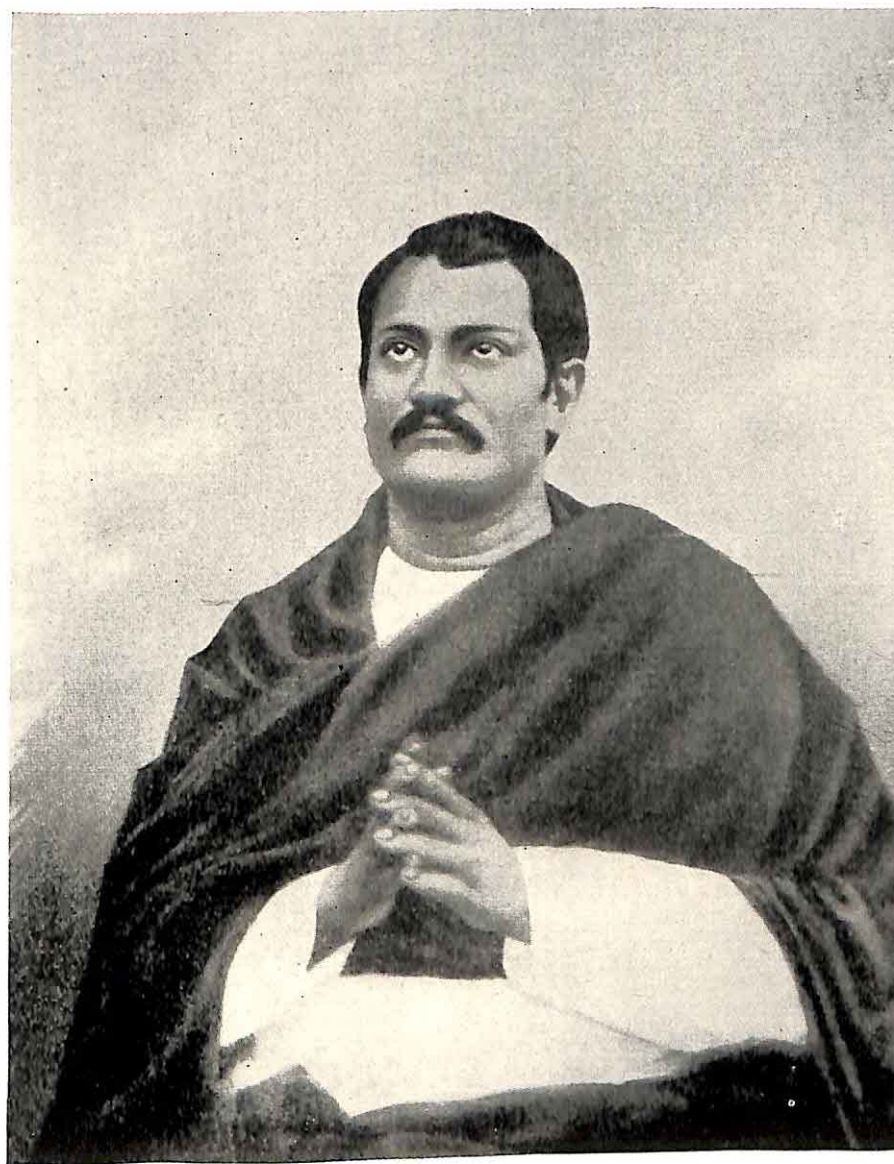
॥ এক ॥

কলিকাতা টাউন হল।

১৮৮৩, ২০শে জানুয়ারি। শনিবার।

এক সৌম্যদর্শন বাঙালি বক্তৃতা করিতেছেন। প্রতি বৎসরই তিনি এই সময় টাউন হলে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। সে বক্তৃতা শুনিবার জন্য শহরের যত শিক্ষিত লোক ভীড় করিয়া আসেন, আর আসেন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষেরা। লাটসাহেব পর্যন্ত বাদ যান না। আজ বহু বৎসর যাবৎ তাঁহারা এই বাৎসরিক ভাষণ শুনিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন—বৎসরান্তে এমন দিনে তাঁহারা এখানে আসিয়া সমবেত হন, তারপর স্তব্ধচিত্তে বসিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মতন সেই বক্তৃতা তাঁহারা শোনেন। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল আজিকার বক্তৃতা। বক্তৃতা নয়—বাগ্-বিভূতি। সে বাগ্-বৈদগ্ধ্য শ্রোতাদের বিস্মিত করিত, তাহাদের সমস্ত সত্তাকে আলোড়িত করিত। বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া যাইত বক্তার উচ্চারিত প্রতিটি কথায়। গম্ গম্ করিত সমস্ত টাউন হলের ভিতরটি। উদাত্ত সেই কণ্ঠস্বর মুহূর্তমধ্যেই শ্রোতাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তোলে।

আজকার বক্তৃতার বিষয়—"য়ুরোপের নিকট এশিয়ার বাণী।"

টাউন হলে তিল ধারণের স্থান নাই। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা আজ দর্শক সমাগম অনেক বেশি—সারা শহর যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ, বৌদ্ধ, মুসলমান, হিন্দু, বাঙালি, অবাঙালি পাশাপাশি বসিয়া বক্তৃতা শুনিতেছে। বক্তৃতা যেমন সুদীর্ঘ, তেমনি ওজস্বী। যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের দ্বারা তাহার প্রত্যেকটি শব্দ অনুপ্রাণিত।

কমনীয় কান্তি ও মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় তেজোময় সেই বক্তার মুখের এক একটি কথার ভিতর দিয়া যেন একটি বিরাট আদর্শ ও বিশ্বপ্রীতির ভাব বাঙ্ময় রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এমন বিশুদ্ধ ইংরেজি, এমন অনর্গল বাক্যস্রোত, শহরে পূর্বে কেহ দেখে নাই, শোনে নাই। বক্তা বলিতেছেন আর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনিতেছে ঃ

"য়ুরোপ যে কল্যাণ করিয়াছে, যে সকল বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উপকার করিয়াছে সে সবের জন্য এশিয়ার মানুষ কৃতজ্ঞ। এশিয়ার আমি পক্ষ সমর্থক সন্তান। এশিয়ার দুঃখ আমার দুঃখ, তাহার আনন্দ আমার আনন্দ। এই ওষ্ঠাধর এশিয়ার পক্ষ সমর্থন করিবে। বিশ্বস্ত অনুরক্ত সেবক—অনুরক্ত পুত্রের ন্যায় আমি আমার পিতৃভূমির সেবা করিব। এশিয়া কি প্রধান প্রধান ঋষি মহাজনগণের জন্মভূমি নহে? পৃথিবীর পক্ষে কি এই ভূখণ্ড মানুষের সর্বপ্রধান ও পবিত্র তীর্থস্থান নহে? যাঁহাদিগের পদতলে পৃথিবী পড়িয়া রহিয়াছে,—হাঁ, তাঁহারা এই এশিয়ার ভূমিতেই আবির্ভূত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। যে সকল ধর্ম লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবন দিয়াছে, মুক্তি-পথের সন্ধান দিয়াছে,—এই এশিয়াতেই তাঁহাদের সর্বপ্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল। আমার কাছে এশিয়ার ধূলি স্বর্ণ-রৌপ্য অপেক্ষা মূল্যবান। পৃথিবীতে যত ধর্মসম্প্রদায় আছে, এশিয়া তাহাদের আবাস স্থল। ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ—সকলেই এশিয়াকে সাধারণ গৃহ বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা তাই য়ুরোপকে বলি—এস, আমরা এক ঈশ্বর, এক সমাজ, এক সত্যে আবদ্ধ হই; সমস্ত মনুষ্য জাতিকে এক করিয়া ফেলি।"

এক ঈশ্বর, এক সমাজ, এক সত্য।

প্রত্যেকটি শ্রোতার চিত্তে এই কথার প্রতিধ্বনি উঠিল।

জাতীয় সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করিয়া কী উদার কী বিশ্বজনীন এই চিন্তা! সত্যই এমন বক্তৃতা, এমন অমৃতবর্ষী মধুর কণ্ঠ তাহারা কখনো শোনে নাই।

এই বক্তা কেশবচন্দ্র সেন।

পরবর্তীকালে ইনিই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের যে বাংলা, সেই বাংলার প্রাণ ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। জাতীয়তাবোধের বিজয়শঙ্খ 'সুলভ সমাচার' ছিল তাঁহার হস্তে। সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক, জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ পূজারী, নারীপ্রগতির উদ্বোধক, জ্ঞান-বিদ্যার প্রসারক, অসাধারণ বাগ্মী ও ধর্মপ্রবক্তা বলিয়া কেশবচন্দ্র যে শুধু ভারতবর্ষেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন তাহা নহে, ইংলণ্ডেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির অন্ত ছিল না। সত্যানুরাগ ও তেজস্বিতার মূর্তবিগ্রহ কেশবচন্দ্র উনবিংশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাসে একজন অসাধারণ মনস্বী পুরুষ। অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তি। অনন্যসাধারণ তাঁহার ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসের নবীন প্রেরণা কেশবচন্দ্র। বাংলার নবযৌবনের ললাটে তিনিই প্রথম রাজতিলক আঁকিয়া দিয়াছিলেন। নবজাগ্রত সমাজ-চেতনার তরঙ্গশীর্ষে যেদিন কেশবচন্দ্র প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেইদিন হইতে পরবর্তী প্রায় দুই যুগের ইতিহাস, বলিতে গেলে, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইয়াছিল। সেদিন তাঁহার অস্তিত্বে দেশ কাঁপিয়াছে। তাঁহার মহত্ত্ব সন্দর্শনে লোকে ধর্মপথে অগ্রসর হইয়াছে। সেই বিদ্যা, সেই বুদ্ধি, সেই প্রতিভা, সেই জ্ঞান, সেই রূপ, সেই তেজ—বাঙালি একবারই দেখিয়াছিল।

সাধারণতঃ আমরা কেশবচন্দ্রকে একজন ধর্মপ্রবক্তা বলিয়া জানি। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন ধর্ম-বিপ্লবী এবং ধর্মসমন্বয়কারী এক প্রতিভাধর ব্যক্তি। সেইখানেই তাঁহার সত্যকার পরিচয়। তাঁহার জীবনে-তিহাসে তাই আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মপ্রচারে কেশবচন্দ্রের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিভা ও দূরদর্শিতা কি বিপুল পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল এবং দেশের পরবর্তীকালের রাজনৈতিক জাগরণ ও সমাজ-বিপ্লবকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, কেশব-মনীষা আলোচনা প্রসঙ্গে তাহারও উল্লেখ অপরিহার্য। উনিশ শতকের বাংলার সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা, নীতি ও রাজনীতি—জাতির জীবনের এমন দিক নাই যাহা কেশবচন্দ্রের প্রতিভার স্পর্শে উদ্দীপ্ত না হইয়াছে। বাংলার ঝটিকাতাড়িত আধ্যাত্মিক গগনে কেশবচন্দ্রের আবির্ভাব একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রামমোহন-দেবেন্দ্র-

নাথের সাধনাকে তিনিই একটি ঐতিহাসিক সম্পূর্ণতা দান করেন; নববিধানের ভিতর দিয়া তিনি যে নবশক্তির, যে নবীন আদর্শের উদ্বোধন করিয়াছিলেন—তাহার তাৎপর্য বাঙালি হৃদয় দিয়া গ্রহণ করে নাই, বুদ্ধি দিয়া বিচার করে নাই। আচার্যের বেদীতে বসিয়া কেবশচন্দ্র যেভাবে নববিধানের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, আমরা তাহা সেদিন বুঝিতে চাহি নাই, তাই তাঁহার নববিধানকে পাঁচফুলের সাজি বলিয়া উপহাস করিয়াছি। কিন্তু সমগ্র মানবজাতির আত্মোন্নতি বিধানের যে অব্যর্থ ইঙ্গিত সেদিন সেই নববিধানের মধ্যে ছিল, আজ কি তাহা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া যায় নাই? এক ঈশ্বর, এক সমাজ, এক সত্য—ছিয়াত্তর বৎসর পূর্বে উচ্চারিত এই কথা, আজ সভ্যজগতের প্রতিটি মানুষের চিন্তায় বাস্তব রূপ লইতে চলিয়াছে—ইহা দেখিয়া এবং জানিয়াও আমরা কি কেশব-মনীষা অনুশীলনে আর বিরত থাকিতে পারি? কেশবজীবন বাস্তবিকই এক আশ্চর্য শাস্ত্র; বেদ-বেদান্ত, বাইবেল, কোরান, গীতা, ভাগবৎ—সবই এই শাস্ত্রে সম্মিলিত হইয়াছে। কালের প্রান্তর অতিক্রম করিয়া আজ তাই শোনা যায় কেশবচন্দ্রের ঘোষণার সেই ঝঙ্কার—এক ঈশ্বর, এক সমাজ, এক সত্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে আর কাহারো চেতনায় বা চিন্তায় বা কর্মে এই মহান আদর্শ রূপ লয় নাই। কেশবচন্দ্রের প্রকৃত মহত্ত্ব এইখানেই। অগ্নিস্নাত এই মহাজীবনের কথাই আজ বলিব।

কেশবচন্দ্রের জীবন প্রার্থনার জীবন। তিনি মূর্তিমান প্রার্থনা।

কেশবচন্দ্রের জীবন জলন্ত বিশ্বাসের জীবন। তিনি মূর্তিমান বিশ্বাস।

কেশবচন্দ্রের জীবন একজন ঈশ্বর পিপাসুর জীবন।—"তোমরা কি ধর্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য পাগল হইতে পারো না?"—এই কথা একদিন আমরা কেশবচন্দ্রের মুখ হইতেই শুনিয়াছি। সেদিন মনে করিয়াছি, ইহা বুঝি তাঁহার ভাববিলাস, অথবা হৃদয়ের বাষ্পীয় উচ্ছ্বাস। কিন্তু ঈশ্বর-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ সেই জীবনে উচ্ছ্বাস বা ভাবের যে বিন্দুমাত্র স্থান ছিল না, ইহা সেদিন আমরা বুঝি নাই।

এক ঈশ্বর, এক ধর্ম, এক সমাজ।

ইহাই কেশবচন্দ্রের সমগ্র জীবনের সার কথা।

ইহাই তাঁহার জীবনের মূল সূত্র এবং এই সূত্রকে অবলম্বন করিয়াই আমরা কেশব-চরিতানুশীলনে প্রবৃত্ত হইব। বাংলার নবযুগের প্রথম মানুষ রামমোহন। চরিত্রে মহৎ এবং মনুষ্যত্বে বৃহৎ রামমোহনই জাতির প্রাণ-দাতা। তিনিই জাতিকে নূতন পথে চলিবার প্রেরণা দান করিতে পারিয়াছিলেন। সার্বভৌমিক ধর্মের আদর্শ তিনিই প্রথম প্রচার করেন। কেবল-মাত্র ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, রাজা রামমোহনের বিরাট জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও নূতন প্রাণসঞ্চার ও প্রেরণা উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। তারপর দেখা দিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। লোকোত্তর মহামনীষী তিনি। মন ও মুখ ছিল তাঁহার এক। ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, এবং ধ্যান ধারণার মধ্যেই তিনি রামমোহনের আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এ দেশে ভারত-সংস্কৃতির আলোচনার সূচনা তিনিই করেন। বাঙালির অন্তরে মহর্ষিদেব জাগাইয়া দিয়াছিলেন একটি নবীন ভাব, নবীন শক্তি, নবীন উন্মাদনা। তখন হইতেই শিক্ষিত বাঙালির মনে আত্মোন্নতি বিধানের জন্য ব্যাকুলতা এবং মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। রামমোহনের ঈশ্বরজ্ঞান দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুভূতিতে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল।

এই ধারায় এই শতাব্দীর তৃতীয় মানুষ কেশবচন্দ্র। রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথ—ইঁহাদের উভয়ের আধ্যাত্মিক চেতনার পরম পরিণতি আমরা লক্ষ্য করি একমাত্র কেশবচন্দ্রের মধ্যেই। কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা আরো নূতন, আরো অসাধারণ। তিনি যেন ইতিহাসের বরপুত্র। শৈশব হইতেই তিনি অন্তরে উচ্চ জীবনের আদর্শের সন্ধানের আহ্বান অনুভব করেন। শৈশব হইতেই তাঁহার জীবনে বিপ্লবী স্বভাবের অঙ্কুর দেখা দেয়। কেশবচন্দ্র বাস্তবিকই একজন বিরাট বিপ্লবী পুরুষ—রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের যথার্থ উত্তরসাধক। জাতিকে ব্রহ্মমুখী করা—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের সংকল্প। সেইজন্যই কি তিনি যুবকদের বলিতেন—তোমরা কি ধর্মের জন্য পাগল হইতে পার না? সেদিন বাংলার সমাজজীবনের চরম সংকটমূহূর্তে কেশবচন্দ্র যদি ব্রাহ্মধর্মের সাধন ও সংজ্ঞা লইয়া বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের

সম্মুখে না দাঁড়াইতেন, বাংলার ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিত। কেশবচন্দ্রের জীবনের অগ্নিময় স্পর্শ লাভ করিয়াই বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস এক নূতন গরিমা, নূতন ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছিল।

বাঙালির জীবনে কেশবচন্দ্রের স্থান আজ নির্ণয় করিবার দিন আসিয়াছে। উনবিংশ শতকের বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের যথার্থ এবং পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন আজো একজন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের অপেক্ষায় আছে। বিগত শতকে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটির পর একটি যেসব যুগান্তকারী ঘটনা ঘটিয়াছে এবং এই শতকে যেসব মনীষীর কর্ম, চিন্তা ও সাধনার ফলে নবজাগরণ সার্থক হইয়াছিল, সেগুলির ইতিহাস-সম্মত বিচার ও বিশ্লেষণ করিবার দিন আজ আসিয়াছে। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন বিচ্ছিন্ন প্রয়াস বা বিচ্ছিন্ন অনুশীলনের দ্বারা বাংলায় উনবিংশ শতকের ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি ঠিকমত বুঝিতে পারা যাইবে না। এ পর্যন্ত আলোচনা যাহা হইয়াছে বা এখনো যাহা হইতেছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ব্যক্তি-বিশেষ বা ঘটনা-বিশেষের মূল্যায়নে কেহই নিরপেক্ষ চিন্তার পরিচয় দিতে পারেন নাই। ইহার ফলে বিগত শতাব্দীর ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই খণ্ডিত ও বিকৃত হইয়াছে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহা অতিরঞ্জিতও হইয়াছে এবং সেই ইতিহাসকে যাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা গড়িয়াছেন তাঁহাদের অনেকের সম্পর্কেই আমাদের বিচার-বিবেচনা একদেশদর্শী হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে রামমোহনের পর যাঁহার গুরুত্ব সর্বাধিক তিনি কেশবচন্দ্র সেন। অথচ এই কেশবচন্দ্রকেই বাঙালি গ্রহণ করে নাই। ইতিহাসে কেশবচন্দ্র এক রকম উপেক্ষিত বলিলেই হয়। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা, অত্যাশ্চর্য চরিত্র ও কর্মময় জীবনের অনুশীলন বিরল। অনুসন্ধিৎসু কোনো সাহিত্যিকই আজ পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের জীবন ও সাধনার প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন নাই, স্কুল-কলেজের কোনো পাঠ্য পুস্তকে কেশবচন্দ্রের কোনো রচনাই স্থান পায় নাই। অথচ তিনি দেশকে ও জাতিকে যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের অমূল্য

সম্পদ। বাঙালি সেই সম্পদের সন্ধান লইল না, কেশবচন্দ্রের ইংরেজি ও বাংলা রচনাবলী বাঙালি আগ্রহের সহিত পাঠ করিল না। বাঙালির জীবনে কেশবচন্দ্রের স্থান হইল না কেন?—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার দিন আজ আসিয়াছে মনে হয়।

বিগত শতাব্দীর নবজাগৃতির অভিপ্রায় ও তাৎপর্য যদি আমরা সর্বাগ্রে শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারি তাহা হইলে কেবলমাত্র ব্যক্তি-বিশেষের প্রশস্তিরচনা দ্বারা বিগত শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা কোনো-দিন সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইবে না। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস তো কেবলমাত্র রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর বা রামকৃষ্ণকে লইয়া নয়—আরো অনেককেই লইয়া সেই ইতিহাস স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়াছে। এই অনেকের মধ্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কেশবচন্দ্র সর্বাগ্রগণ্য। তাঁহার প্রতি তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই অবিচার করিয়াছেন; অনেকেই তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছেন ও ভুল বুঝাইয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান-বিশেষ হইতে প্রকাশিত সাহিত্যে বহু বিকৃত উক্তি এবং অসত্য বা অর্ধসত্য বিবরণ স্থান পাইয়াছে। ফলে আমরা 'ভক্ত কেশব'কে পাইয়াছি, যুগ-বিপ্লবী চিন্তানায়ক ও সুগভীর অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন কেশব-চন্দ্রকে পাই নাই।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে পর্যন্ত দেখিতে পাই যে, কেশবচন্দ্রের জন্য অতি সংকীর্ণ স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, অথচ ব্রাহ্মসমাজের যে পরিণত রূপ আজ আমরা নববিধানের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা কি কেশবচন্দ্র ভিন্ন সম্ভব হইত? রামমোহনের উত্তরাধিকারত্বের দাবী অনেকেই করিয়াছেন, কিন্তু রাজার প্রকৃত উত্তরসাধক বলিতে দুইজনকেই বুঝায়—এক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় কেশবচন্দ্র। জানি, সমসাময়িকদের দৃষ্টি সব সময় অভ্রান্ত হয় না, সম্পূর্ণ হয় না—কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের বিচার-বিবেচনা যে নিরপেক্ষ হইবে না, ইতিহাসসম্মত হইবে না, ইহার কি অর্থ আছে? দেখিতেছি যে কেশবচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনায় কি কেশব-বিরোধী, কি কেশব-ভক্ত, কি রামকৃষ্ণ মিশন, এমন কি, তাঁহার পরিবারবর্গের কেহ কেহ পর্যন্ত সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে পারেন নাই। বুঝিতেছি যে,

কেশবচন্দ্র সম্পর্কে সমগ্র ইতিহাসই যেন বিকৃত হইয়া, অতিরঞ্জিত হইয়া আমাদের নিকট এ যাবৎকাল পরিবেশিত হইয়া আসিয়াছে। অবিলম্বে ইহার প্রতিকার হওয়া দরকার। এ কথা অতি সত্য যে, কেশবচন্দ্রের জীবনেতিহাসের যথাযথ ও ব্যাপক আলোচনা এবং তাঁহার বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টার মূল্যায়ন ভিন্ন উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির প্রকৃত গুরুত্ব আমরা বুঝিতে পারিব না। কেশবচন্দ্রকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা হিসাবে বা নববিধানের উদ্গাতা হিসাবে দেখিলে চলিবে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ইতিহাসের মানুষ এবং ইতিহাসের মানুষকে ইতিহাসের দৃষ্টি দিয়াই দেখিতে হইবে, বুঝিতে হইবে।

সমসাময়িক ইতিহাসে রামমোহনের পর দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মূল্যই সর্বাধিক। যাঁহারা শুধু রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ বা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই কেশবচন্দ্রের চিন্তা ও অনুভূতির সীমার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, অথবা তাঁহার তন্নিষ্ঠ মনের নাগাল পান নাই—ইহা আমি প্রতিবাদের আশঙ্কা না রাখিয়াই বলিতে পারি। ইতিহাস-সচেতন মানসিকতার অভাবেই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পুরোধাগণের কর্মপ্রয়াস ও চিন্তাধারার মূল্যনিরূপণ প্রায় ক্ষেত্রেই একদেশদর্শী হইয়া উঠিয়াছে। 'জীবনবেদে'র উদ্গাতা কেশবচন্দ্রের প্রকৃত মহিমা বাঙালির নিকট তাই অবজ্ঞাত ও অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি পর্যন্ত (এবং যিনি কেশবচন্দ্রকে প্রাণাধিক পুত্রতুল্য জ্ঞান করিতেন) কেশবচন্দ্রকে 'অবতার' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' লইয়া বাঙালি যে উপহাস করিয়াছে, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার দিন আসিয়াছে। কি সমাজ-সংস্কারে, কি ধর্ম-সাধনায়, কি জাতিগঠনে কেশবচন্দ্রের অনন্যসাধারণ কর্মকীর্তির সমগ্র ইতিহাস যদি আমরা নিরপেক্ষভাবে অনুশীলন করি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, বাংলা তথা ভারতে নবজাগৃতির ইতিহাসের দ্বিতীয়ার্ধ কেশবচন্দ্রের কীর্তিতেই ছাইয়া আছে। ধর্মকে সমাজমুখী করিয়া তুলিবার কথা ইতিপূর্বে আর কেহই চিন্তা করেন নাই।

১৮৫৯ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ—এই পঁচিশ বৎসর কালই কেশবচন্দ্রের প্রকৃত কর্মজীবন। এই শতকের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সকল বিষয়ে, বিশেষ করিয়া ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে—কেশবচন্দ্রের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব অবিসম্বাদিত এবং তাঁহার কর্মপ্রয়াসও সুদূরপ্রসারী। বস্তুতঃ কেশবচন্দ্রের জীবনেতিহাস পাঠ করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, যে সমাজে তিনি তরুণ বয়সে যোগদান করিলেন সেই ব্রাহ্মসমাজের নিকট তাঁহার শিখিবার কিছুই ছিল না, বরং তিনিই ব্রাহ্মসমাজকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়া ইহাকে ইতিহাস-নির্দিষ্ট পরিণতির পথে লইয়া গিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবনই ব্রাহ্মসমাজকে এক পরিষ্কার বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। হিন্দুসাধনার মর্মমূলে কেশবচন্দ্র প্রবেশ করিয়াছিলেন—এবং এইখানে তিনি অনন্য। সকল ধর্মই সত্য, এমন কথা প্রত্যয়ের সহিত বুঝি রামমোহনও অনুভব করিতে পারেন নাই, বলিতে পারেন নাই—রামকৃষ্ণ তো পরের কথা! দুঃখের বিষয়, রামমোহন বা রামকৃষ্ণের মহিমা-কীর্তনে ব্রাহ্মসাহিত্য বা রামকৃষ্ণ-সাহিত্য যেমন অতি মুখরিত, কেশবচন্দ্র সম্পর্কে ইহা তেমনি নীরব। মহত্ত্বের অতিরঞ্জন হইয়া থাকে, স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া একজনকে জনচিত্তে বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কি আরেকজনকে খর্ব বা তাঁহার মূল্যকে অস্বীকার করিতে হইবে?

কেশবচন্দ্র সম্পর্কে ঠিক তাহাই করা হইয়াছে। হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজ দুই বিপরীত দিক হইতে কেশব-চরিত্রের মহিমাকে, ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে, ইহার আন্তর্জাতিক মূল্যকে খর্ব করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। বাঙালি তাই কেশবচন্দ্রের বাণী—তাঁহার প্রবুদ্ধ জীবন ও সাধনার মর্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্র যেদিন দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন: "I was destined to be a man of faith. I was destined and commissioned by God to be a spiritually-minded and not a worldly-minded man... For the last twenty years have I laboured in the cause of God and of India." (*Lectures in India*)—সেদিন বাঙালি বধির ছিল। বিরোধীদলের অক্লান্ত কেশব-

বিদ্বেষ প্রচারের ফলে বাঙালির চিন্তা সেদিন এমনই আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল যে, কেশবচন্দ্রকে বাঙালি তাহার জীবনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্রের একখানি নূতন জীবনচরিতের প্রয়োজনীয়তা এইখানেই। বলা বাহুল্য, তাঁহার জীবনচরিতের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্যেই নিহিত আছে। তাঁহার ইংরেজি ও বাংলা রচনার পরিমাণ বড় কম নয়। তাঁহার বক্তৃতা, প্রার্থনা, উপদেশ, পত্রাবলী—এইসবের ভিতর কেশবচন্দ্র তাঁহার মানস-জীবনের সমগ্র পরিচয়ই রাখিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, কেশবচন্দ্রের রচনাবলীর সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত, এমন শিক্ষিত বাঙালির সংখ্যা খুবই কম। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর আমরা প্রায় একটি শতাব্দী অতিক্রম করিতে চলিলাম। অতীতের মতবিরোধের কথা ভুলিয়া গিয়া, ইতিহাস সচেতন মন এবং স্বচ্ছ বুদ্ধি লইয়া কেশবচন্দ্রের মনীষা ও তাঁহার বহুমুখী কর্মপ্রয়াস ও প্রত্যয়সিদ্ধ আশ্চর্য চিন্তাধারার অনুশীলন ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার দিন আজ আসিয়াছে।

॥ দুই ॥

প্লেটোকে জানা মানেই য়ুরোপকে জানা ; য়ুরোপের মানসলোকের পরিচয় লইতে হইলে প্লেটোর সহিত সর্বাগ্রে পরিচিত হওয়া দরকার। তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের মানসলোকের পরিচয় লইতে হইলে কেশবচন্দ্রকে জানিতে হয়, তাঁহার জীবনাদর্শকে বুঝিতে হয়। বহুভঙ্গিম চরিত্রের এই মানুষটি একাধারে ছিলেন ধর্মপ্রবক্তা, দার্শনিক, লেখক, বক্তা, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাপ্রবর্ত্তক, নীতিপ্রণেতা, সমাজসংস্কারক, স্বদেশপ্রেমিক, জনসেবক ; আর সর্বোপরি ধর্মসংস্কারক, ধর্মপ্রবর্তক, ধর্মপ্রচারক ও ধর্মাচার্য। আজ দেশে ধর্ম, সমাজ, শিল্প, রাষ্ট্র, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির কর্ম ও চিন্তাক্ষেত্রে জনহিতকর যেসব প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করি, বলিতে গেলে, কেশবচন্দ্রই সে সমুদয়ের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। যে নবযুগ আজ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, কেশবচন্দ্রের চিন্তা ও কর্মের ভিতর দিয়া সেই নবযুগের প্রায় সব কয়টি আদর্শ অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এমন কি, বিংশ শতাব্দীর মানবসভ্যতার যে পর্বে আমরা আজ উপনীত হইয়াছি, সেখানে দেখিতেছি যে সমগ্র মানবসমাজ যেন তিনটি বিষয়ের জন্য প্রবলভাবে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, যথা স্বাধীনতা, উন্নতি ও সামঞ্জস্য। কেশবচন্দ্রের কর্মবহুল জীবনে এই আদর্শগুলি যে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিয়া দেখাইব। সর্বমানবীয় বিশ্বজনীন ধর্মের অনুশীলন দ্বারাই একদিন পৃথিবীর এই মানব-সমাজ যে এক অখণ্ড মানবপরিবারে পরিণত হইবে—কেশবচন্দ্রের অনু-ভূতিতে ইতিহাসের এই সত্যটি অতি পরিষ্কার ভাবেই ধরা পড়িয়াছিল। 'All religion is science and all science is religion'—এত বড় উক্তি যিনি করিতে পারেন, তাঁহার মনীষা ও প্রতিভা কি আমাদের বিচারের অপেক্ষা রাখে? মহাকালের বিচারেই কেশবচন্দ্রের চিন্তাভাবনার যাথার্থ্য চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, কেশবচন্দ্রকে না বুঝিতে পারিলে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির তাৎপর্য অনুধাবন করা বৃথা।

ইতিহাসের বিচারে রাজা রামমোহন রায়কে বাংলার নবযুগের প্রথম মানুষ বলা হইয়াছে। তিনি উন্নতিকর প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন এবং অবনতিকরগুলির বিরোধিতা করিয়াছিলেন। বাঙালির সমাজকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে মুক্ত করার চেষ্টার মধ্যেই রামমোহনের প্রতিভা সার্থক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মহত্তম কার্য হইতেছে হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের চেষ্টা। তিনি যে একটি উদার, সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মমত প্রবর্তনের চেষ্টা আরম্ভ করেন, তাহাই পরবর্তী-কালে ব্রাহ্মধর্মরূপে পরিণত হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখটি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়। এই তারিখে চিৎপুর রোডে জোড়াসাঁকোর ভাড়াবাড়ি সমেত এক খণ্ড জমি ক্রয় করা হয় ৪২০০৲ টাকায়। এই টাকা দিয়াছিলেন রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও টাকির কালীনাথ রায়। এই ভূমিখণ্ডের উপরই রামমোহন-পরিকল্পিত ব্রহ্মসভার উপাসনা-গৃহ নির্মিত হয়। তারপর ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি তারিখে ঐ গৃহে প্রথম প্রকাশ্য উপাসনা হয়। যে তিন ব্যক্তি মিলিয়া পূর্বোক্ত ভূমিখণ্ড ক্রয় করেন তাঁহারাই পরে একটি ট্রষ্টডীড সম্পাদন পূর্বক ট্রষ্টিদিগের হস্তে ঐ উপাসনা গৃহটি সমর্পণ করেন। এই ট্রষ্টডীড রামমোহন রচনা করিয়াছিলেন। এই দলিলটির মধ্যে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের রূপটি ভ্রূণাকারে নিহিত ছিল বলিলেই হয়। ইহার অর্ধশতাব্দীকাল পরে কেশবচন্দ্র যে Church Universal-এর আদর্শ পৃথিবীতে স্থাপন করেন, তাহার সূচনা এই দলিলটির মধ্যেই ছিল। রামমোহনের এই ট্রষ্টডীডকে অনেকে ভবিষ্যতের মানব-সমাজের ঐক্য ও মিলনের এক অবিস্মরণীয় দলিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং তাহা সর্বতোভাবে সত্য।

রামমোহন-পরিকল্পিত ব্রহ্মসভাকে ব্রাহ্মধর্মে রূপায়িত করেন দেবেন্দ্রনাথ। শুধু তাহাই নহে। প্রণালীবদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা তিনিই প্রবর্ত্তন করেন। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের সাধনার পূর্ণ পরিণতি কিন্তু কেশবচন্দ্রে—এবং এইখানেই কেশবচন্দ্রের গুরুত্ব। ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মানবতার দাবীতে একটি জাতি-বর্ণ-শ্রেণীহীন সমাজ গঠন—ইহাই ছিল ব্রাহ্মসমাজ তথা ব্রাহ্মধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি।

ইহাই কেশবচন্দ্রের নববিধান—ইহাই তো তাঁহার বিপ্লবী দর্শন। এই দর্শন বুঝিতে না পারিলে উনবিংশ শতকের নবজাগৃতির তাৎপর্য বুঝিতে পারা যাইবে না। ইতিহাসের গতিপথেই একদিন ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং তাহার ঐতিহাসিক পরিণতি কী হইতে পারে, কি হওয়া উচিত, তাহা কেশবচন্দ্রের প্রতিভা অভ্রান্তভাবে আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, য়ুরোপের মানসলোকের পরিচয় লইতে হইলে যেমন প্লেটোকে জানিতে হয়, তেমনি আধুনিক বাংলা তথা ভারতের মানস-লোকের পরিচয় লইতে হইলে কেশবচন্দ্রকে জানিতে হয়, বুঝিতে হয়।

কেশবচন্দ্র সম্পর্কে নূতন করিয়া বলিবার কী আছে? তাঁহার জীবন-চরিতের অপ্রতুলতা নাই এবং বহু যোগ্য ব্যক্তিই কেশব-চরিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার বিষয়ে নূতন কিছু লেখা অর্থাৎ তাঁহার জীবনের স্থূল ঘটনাবলীর উপর নূতন আলোকপাত করিবার অবকাশ সামান্যই আছে। তথাপি, পূর্বেই বলিয়াছি, একখানি নূতন জীবনীর প্রয়োজনীয়তা আছে, এই জন্য যে আমরা অনেকেই হয়ত কেশবচন্দ্রের কোন না কোন জীবন-চরিত পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার জীবনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিতে পারিয়াছি কয়জন? কয়জনই বা তাঁহার জীবনাদর্শকে ইতিহাসের দৃষ্টি লইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি? সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে কেশবচন্দ্র একটি master-mind, একটি অলোক-সামান্য প্রতিভা এবং একমাত্র তাঁহারই চিন্তা-ভাবনার মধ্যে আমরা রামমোহনের ভাবাদর্শের পূর্ণ পরিণতি লক্ষ্য করি। তাঁহার মানস-জীবনই প্রকৃত জীবন আর সেই জীবনের পরিচয় আছে সমগ্র কেশব-সাহিত্যে। আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া কেশবচন্দ্রকে বুঝিবার চেষ্টা করিব। তবে তাঁহার স্থূল জীবনের ঘটনাবলীকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিবার জন্য আমাকে প্রচলিত জীবন-চরিতগুলির উপর কিছুটা নির্ভর করিতে হইবে।

কেশবচন্দ্র সম্পর্কে যতগুলি জীবনচরিত আজ পর্যন্ত লিখিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে তিনখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রণীত *The Life and Teachings of Keshub Chandra*

Sen ; দ্বিতীয়, পণ্ডিতপ্রবর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের 'আচার্য কেশবচন্দ্র' এবং তৃতীয় গ্রন্থখানি হইল প্রশান্তকুমার সেন প্রণীত *Biography of a New Faith*—ইহা দুইখণ্ডে প্রকাশিত। প্রতাপচন্দ্রের বইখানি কেশব-জীবনের একটি সুন্দর আলেখ্য। লেখক অনুরাগীর দৃষ্টিতে যাঁহাকে দেখিয়াছেন, ঐতিহাসিকের মন লইয়া তাঁহার চরিত্র ও কার্যাবলী তিনি যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রতাপচন্দ্র তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় একস্থানে লিখিয়াছেন : "Keshub Chandra Sen was the embodiment of a great internal force. It upraised his character, like some stupendons edifice, ascending tier above tier, till the heights were lost in mystic communion with the Spirit of God."—ইহা অনুরাগীর কথা নয়, শিষ্যের স্তুতি-নিবেদন মাত্র নয়, ইহা যথার্থই একজন ঐতিহাসিকের উক্তি। উপাধ্যায় মহাশয়ের 'আচার্য কেশবচন্দ্র' সকল দিক দিয়াই বাংলা সাহিত্যে একখানি অতুলনীয় জীবনীগ্রন্থ। আয়তনে বিশাল হইলেও, এই গ্রন্থের তথ্য সমাবেশ ও ঘটনা বিশ্লেষণ গ্রন্থকারের অপূর্ব মনীষা ও যত্নের পরিচায়ক। 'আচার্য কেশবচন্দ্র' কেশবচন্দ্রের জীবনী মাত্র নহে, উহা তাঁহার বহুমুখী জীবনের একটি নিখুঁত ভাষ্য। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র সত্য ও সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হওয়ায়, ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত অধিক। এই গ্রন্থে সুপণ্ডিত লেখক কেশব-চন্দ্রের জীবনানুশীলন করিবার পক্ষে একটি চমৎকার সূত্র দিয়াছেন। গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তিতে উপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন : "যে জীবন ভগবানের আদেশ পালনে অবিচ্ছেদে ব্যাপৃত ছিল, সে জীবনের বৃত্তান্তনিচয় কোন ব্যক্তি যে সমগ্রভাবে গ্রন্থবদ্ধ করিবেন, তাহার সম্ভাবনা অল্প।" অতি সত্য কথা।

তৃতীয় গ্রন্থখানি কেশবচন্দ্রের জীবনাদর্শকে বুঝিবার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান—অপরিহার্য বলিলেই হয়। কেশবচন্দ্রের সমগ্র জীবনের চিন্তা-ভাবনা নববিধানের মধ্যে একটি সুমহৎ ঐতিহাসিক পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং প্রশান্তকুমার সেনের বইখানি তাহারই একটি মনোজ্ঞ ও ভাবসমৃদ্ধ আলোচনা। কেশব-যুগে কি করিয়া ব্রাহ্মসমাজ একটি সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, লেখক এই গ্রন্থে তাহাই ইতিহাস-

সম্মত প্রণালীতে বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। 'All religions are true'—কেশবচন্দ্রের এই মহৎ বাণীর একটি চমৎকার ব্যাখ্যানও তিনি দিয়াছেন। নববিধানের মধ্যে নূতনত্ব কি, তাহা বুঝিতে হইলে এই বইখানি পড়িতেই হইবে।

কেশবচন্দ্র তো সাধারণ ধর্মপ্রবক্তা বা ধর্ম-সংস্কারকের জীবন যাপন করিয়া যান নাই। তাঁহার জীবন তো কেবলমাত্র একটি শতাব্দীর জীবন নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়, কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত পুরাতন ঋষি-বাক্য উদ্ধার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তিনি পুরাতনকে নূতন করিয়া গ্রহণ করিয়া ইহাকে যুগোপযোগী একটি রূপ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা, তিনি প্রার্থনা করিয়া অপেক্ষা করিতেন, এবং আদেশলাভ করিতেন, সেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্মজীবনে কোন্ উন্নত স্তরে বাস করিতেন তাহা সর্বাগ্রে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, কেশবচন্দ্রের জীবনের মধ্যে অনুপ্রবেশ একরকম দুঃসাধ্য। তিনি জীবনে একটিমাত্র মন্ত্রই লাভ করিয়াছিলেন—তাহা অগ্নিমন্ত্র। তাঁহার সমগ্র জীবনে আমরা যে অদম্য তেজ, উৎসাহ, সাহস ও শক্তির লীলা দেখিতে পাই, তাহার উৎস ছিল এই অগ্নিমন্ত্র। কেশবচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন—"যদি জিজ্ঞাসা করি, হে আত্মন্! ধর্মজীবনের বাল্যকালে কি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলে? আত্মা উত্তর দেয়,—অগ্নিমন্ত্রে। বাল্যাবধি আমি অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, অগ্নিমন্ত্রেরই পক্ষপাতী। অগ্নির অবস্থাকে পরিত্রাণের অবস্থা মনে করি। অগ্নিমন্ত্র কি? শীতলতা, অলসতা, মৃদুতা, নিস্তেজতা, কোমলতা, নিবীর্যতা, উদ্যমহীনতা, অবসন্নতা, ভীরুতা প্রভৃতি লক্ষণগুলির বিপরীত দিকে যা কিছু দেখিতে পাও, তৎসমুদয় অগ্নি। এ জীবনে উৎসাহ উদ্যমের অগ্নি ক্রমাগত জ্বলিতেছে···উত্তাপের অর্থ ই জীবন। উত্তাপের বিপরীতই মৃত্যু। ধর্মজীবনেও উত্তাপ না থাকিলেই মৃত্যু!"

এই উত্তাপ কেশবচন্দ্রের সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত ছিল; তাঁহার সমগ্র সত্তা এই উত্তাপদ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল এবং ইহাই তিনি প্রত্যেকের জীবনে অব্যর্থভাবে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারিতেন। এই উত্তাপই তাঁহার প্রকৃতিতে আনিয়া দিয়াছিল তেজস্বিতা ও স্বাধীনতাপ্রীতি। এই অগ্নিমন্ত্রের

সিদ্ধসাধক ছিলেন বলিয়াই কেশবচন্দ্রের শক্তি ও সাধনা ভারতের ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও সাহিত্যকে এমনভাবে উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারিয়াছিল। তিনি সেই মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন বলিয়াই তাঁহার উচ্চ আকাঙ্ক্ষার অনল জীবন থাকিতে নির্বাপিত হয় নাই, হৃদয়ের পাত্রে এই ব্রহ্মাগ্নি সঞ্চিত ছিল বলিয়াই রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের সাধনাকে তিনি অমন একটি সার্থক পরিণতির পথে লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন—ব্রাহ্মধর্মের মৌলিক একেশ্বরবাদকে ইহার ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির পথে লইয়া গিয়া ইহাকে পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট একটি ধর্মে রূপ দিতে পারিয়াছিলেন।

আজ ইতিহাসের আলোকে আমরা দেখিতেছি যে কেশবচন্দ্র সত্যই একজন দিব্য-দৃষ্টি সম্পন্ন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জীবনব্যাপী কার্যকলাপের মহৎ ফল আজ আমরা যেমন ভোগ করিতেছি, তেমনি তাঁহার ধর্মসাধনার ফলও আজ সভ্যজগতের মানুষ উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক ঈশ্বর, এক ধর্ম, এক সমাজ—কেশবচন্দ্রের এই যে বিশ্বজনীন উদার আদর্শ, ইহাই তো সভ্য মানুষের নিয়তি-নির্দিষ্ট পথ। এই পথে চলিবার অজস্র পাথেয় কেশবচন্দ্রের চিন্তার মধ্যে, তাঁহার রচনার মধ্যে আছে। আজ সেইগুলি আমাদিগকে একে একে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

কলুটোলার রামকমল সেন।

পরম বৈষ্ণব এবং সৎকর্মশীল মানুষ।

সামান্য অবস্থা হইতে বড় হইয়াছেন। দশ টাকা বেতনের সামান্য কম্পোজিটর হইতে ট্যাঁকশালের সর্বোচ্চপদ—দেওয়ানী লাভ করিয়াছেন। এই পদে তাঁহার পূর্বে আর কোন বাঙালি নিযুক্ত হয় নাই। অবশেষে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতায় তিনি হইলেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান। রাশি রাশি অর্থ তিনি উপার্জন করিয়াছিলেন এবং দশ হাতে তাহা ব্যয় করিয়াছিলেন সৎকর্মে। সৎকর্ম বলিতে রামকমল বুঝিতেন দেশে শিক্ষা বিস্তার। উনবিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকের মানুষ তিনি—অনেকটা রামমোহনেরই সমসাময়িক। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রে এবং সম্পদে—

দেওয়ান রামকমল সেনের খ্যাতি তখন সর্বত্র। এমন কি, ইংরেজ মহলেও তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি বড় কম ছিল না। এসিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সভ্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন।

এই রামকমল সেন কেশবচন্দ্রের পিতামহ।

কেশবচন্দ্রের পিতামহ বলিয়াই তাঁহার গৌরব নয়—তাঁহার নিজের কৃতিত্বেই তিনি বাংলার উনবিংশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। দেশের উন্নতি কেমন করিয়া হইবে—ইহাই ছিল রামকমল সেনের অবসর সময়ের একমাত্র চিন্তা। নূতন যুগ আসিয়াছে, লোককে ইংরেজি শিখিতে হইবে, শিখিতে হইবে বাংলা ও সংস্কৃত। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল, তার পরের বছর কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি এবং তাহারো পাঁচ বছর পরে শিক্ষা বিভাগের কাউন্সিল সংস্থাপিত হইল। সমসাময়িক বিবরণ হইতে জানা যায় যে, রামকমল সেন হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই ইহার কার্য-নির্বাহক সভার সভ্য ছিলেন এবং পুস্তক সংগ্রহ ও অনুবাদে তিনি সর্বদা বিশেষ সহায়তা করিতেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রামকমল শিক্ষা-বিভাগের কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। কিন্তু ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। রামকমল সেনের অক্ষয় কীর্তি ইংরেজি-বাংলা অভিধান। কথিত আছে, স্বনামধন্য উইলিয়ম কেরির বড় ছেলে ফেলিক্স কেরির সহায়তায় তিনি এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। দীর্ঘকালের পরিশ্রমে তিনি এই সুবৃহৎ অভিধান রচনার কাজ শেষ করেন এবং নিজ ব্যয়ে উহা মুদ্রিত করেন।

রামকমলের পরিশ্রম ও উৎসাহ কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল না। সকল বিষয়েই যাহাতে দেশের লোকের উন্নতি হয় সেই সম্পর্কে তিনি সমান উদ্যোগী ছিলেন এবং এই বিষয়ে রামকমলের প্রয়াস রাম-মোহনের প্রয়াসেরই সমতুল্য ছিল। তাঁহার জীবনেতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত—সকলের জন্য দেওয়ান রামকমল সেন নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এত যে দেশহিতকর কার্য করিতেন, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, খ্যাতি বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন, আত্মপ্রচারে বিমুখ বলিলেই হয়, যাহা তখনকার বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে খুব বিরল ছিল।

তারপর তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার কথা। দেখিতে পাই যে, এই বিষয়ে রামকমল ছিলেন সর্বপ্রকারে কুসংস্কারবর্জিত একজন মানুষ। রামমোহনের সমসাময়িক হইলেও, রামমোহনের প্রভাব তাঁহার উপর পড়ে নাই—তবে ধর্মের বিষয়ে রামকমলের মতবাদ অনেকটা রামমোহনের মতবাদের অনুরূপ ছিল। গোস্বামী বংশের সন্তান হইলেই যে গোস্বামী হইবে—এই কথা রামকমল বিশ্বাস করিতেন না, মানিতেনও না। ধর্ম বলিতে তিনি বুঝিতেন শাস্ত্রজ্ঞতা ও স্বানুভূতি। কথিত আছে, রামকমল সেন স্বোপার্জিত অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যেও আজীবন বৈরাগ্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন; দিনান্তে প্রতিদিন তিনি স্বহস্তে সিদ্ধপক্ক হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। কলুটোলার সেন-বংশ সেদিন এই প্রগতিশীল এবং পুণ্যাত্মা মানুষটির কল্যাণে যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, সমসাময়িক সমাজজীবনকে তাঁহার চারিত্রিক আদর্শ যেভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, সে ইতিহাস জানিবার মতন।

এই রামকমল সেনের পৌত্র কেশবচন্দ্র সেন।

রামকমল সেনের চার ছেলে—হরিমোহন, প্যারীমোহন, বংশীধর ও মুরলীধর। প্যারীমোহনও টঁ্যাকশালের দেওয়ান ছিলেন। পিতার গুণ তিনি ষোল আনাই পাইয়াছিলেন—তেমনি ধর্মপরায়ণ, তেমনি বদান্য-প্রকৃতির। কেশবচন্দ্র ইঁহারই মধ্যমপুত্র। কেশবচন্দ্রের জন্মকাল ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১৯শে নভেম্বর। পিতা এবং পিতামহ উভয়েই তখন জীবিত। কেশবচন্দ্রের মাতামহ গৌরহরি দাস ছিলেন একজন স্বধর্মনিষ্ঠ শক্তি-মন্ত্রোপাসক এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পারদর্শী চিকিৎসক। কেশব-জননী সারদা ইঁহারই তৃতীয়া কন্যা। পিতৃকুল ও মাতৃকুলের সকল পুণ্য যেন কেশবচন্দ্রের মধ্যে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। বলিতে গেলে, বিশুদ্ধ হিন্দু ও বৈষ্ণব পরিবারেই তাঁহার জন্ম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র—তিনজনেই বৈষ্ণব বংশের সন্তান। কথিত আছে, শিশুকাল হইতেই কেশবচন্দ্রের দেহের এমন একটি পুণ্যমাখা লাবণ্য ছিল যাহা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত। পৌত্র যে ভবিষ্যতে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে, একজন ধর্মসংস্কারক হইবে, এই সম্পর্কে পিতামহ রামকমলের

নাকি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। পুত্র এবং পুত্রবধূ উভয়কেই তিনি এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। সে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নাই।

প্যারীমোহন অতি প্রিয়দর্শন সুন্দর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ছিল যেমন কোমল, তেমনি দয়ার্দ্র। পিতার ন্যায় তিনিও বিচক্ষণ ও ভদ্র ছিলেন। বৈষ্ণবোচিত গুণগুলি তাঁহার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। গোপনে দুঃখী ও বিপন্নদিগকে দানে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। বস্তুতঃ, কলুটোলার সেন-পরিবারে ঈশ্বর-আরাধনা যেমন পারিবারিক ধর্ম ছিল, তেমনি বদান্যতা, বিশেষ করিয়া গরীব দুঃখীদের প্রতি সমবেদনা ছিল ইঁহাদের সহজাত। কেশবচন্দ্রের মাতৃসৌভাগ্যও বড় কম ছিল না। তাঁহার মাতা সারদা দেবী একজন পুণ্যশীলা এবং আদর্শস্থানীয়া মহিলা ছিলেন। সারদাদেবীর জীবনেতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, "পঁচিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া, তিনি তিনটি নাবালক পুত্র এবং কয়েকটি কন্যার সহিত যেরূপ কষ্ট সহিয়া জীবনের মহত্ত্ব এবং স্বর্গীয় চরিত্র রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা শুনিলে হৃদয় বিগলিত হয়। সারদাসুন্দরী অল্প বয়সে বিধবা হইয়া আপনার পুত্রদের সহিত অতি সাবধানে অভিভাবকদের অধীনে বাস করিতেন। পূজা আহ্নিক, ব্রত উপবাস, তীর্থভ্রমণ, গঙ্গাস্নান, সাধুভক্ত-দর্শন, ভদ্রাভদ্র কুটুম্ব ও দুঃখী কাঙালজনের সেবা, সংসারের রন্ধনাদি কার্য তাবৎ বিষয়েই তাঁহার চিরদিন সমান অনুরাগ দেখা গিয়াছে।"

কেশবচন্দ্রের জন্মের এই হইল পারিবারিক পরিবেশ।

বাংলার সামাজিক জীবনের পরিবেশ তখন কেমন ছিল, তাহাও আমাদের একটু জানা দরকার। কেশবচন্দ্রের জন্মকালে আমরা উনিশ শতকের তৃতীয় দশক প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। ব্রিস্টলে রামমোহনের মৃত্যুর ঠিক পাঁচ বৎসর পরে কেশবচন্দ্রের জন্ম। বাংলার সমাজ ও ধর্মজীবনে বিবিধ সংস্কারের সূচনা করিয়া যান রামমোহন এবং নবজাগৃতি তখন ধীরে ধীরে তাহার সকল রূপ ও রেখা লইয়া জাতির ইতিহাসের উদয়াচলে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রাচীন জীবনযাত্রা যাহা এতকাল নানাবিধ অন্ধ

কুসংস্কারের কঙ্করময় পথে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা তখন নূতনের স্পর্শ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহাদের চিন্তা, কর্ম ও প্রতিভা দ্বারা এই নব-জাগৃতি সার্থক হইয়া উঠিবে নবযুগের সেইসব ক্ষণজন্মা নায়কদের অনেকেই ইতিমধ্যে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আসিয়া গিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকটে উপনিষদ্ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর তখনো সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। হিন্দু কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদল 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ইঁহারাই ছিলেন সেদিনের বহু খ্যাত এবং বহু নিন্দিত 'ইয়ং বেঙ্গল'। ইঁহাদের শিক্ষাদাতা ছিলেন ডিরোজিও। হিন্দুকলেজের এই প্রথম দলের ছাত্রগণের মধ্যে আমরা যুগপৎ দুইটি ভাব লক্ষ্য করি—প্রাচ্যবিরোধিতা আর বিপ্লবমুখীনতা। তথাপি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে তাঁহারাই এ দেশের সর্ববিধ কল্যাণ কর্মের অগ্রণী ছিলেন, এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা মন্ত্রের প্রধান উপাসক ছিলেন। কেশবচন্দ্রের জন্মের কালেই দেখিতে পাইতেছি দ্বারকানাথ ঠাকুর বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এ্যাসোসিয়েসন স্থাপন করিয়াছেন। যে আন্দোলনের ফলে সেদিন বাঙালি সমাজের চক্ষু ফুটিয়াছিল, সে ইতিহাস সুপরিচিত। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, এবং স্থায়ীভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন জাগাইয়া রাখিবার কোনো আয়োজন করা যে কত আবশ্যক, বাঙালি তাহা প্রথম বুঝিতে পারিল। এই প্রয়োজনের তাগিদেই বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এ্যাসোসিয়েসনের সৃষ্টি। ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' তখন দেখা দিয়াছে, অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় এবং রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সভাপতিত্বে 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' স্থাপিত হইয়াছে। ইংরেজি শিক্ষায় তখন মেকলের যুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এবং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাপ্রদ আইন প্রবর্তিত হইয়াছে। বাংলার সমাজজীবনে সংবাদপত্রের বিকাশ ও জনমত প্রকাশের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতায় পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপিত হইয়াছে।

উনবিংশ শতকের এই সামাজিক পরিবেশেই কেশবচন্দ্রের জন্ম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই পরিবেশে এবং এই একই বৎসরে (১৮৩৮ খ্রীঃ)

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র— ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের দ্বিতীয়ার্ধের ইতিহাসে ইঁহাদের উভয়েরই বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কেশবচন্দ্র যেমন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি বাংলা সাহিত্যে এক বিরাট যুগান্তর আনিয়াছিলেন। তিনিই আধুনিক বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিক, মননশীল লেখক এবং বাঙালির প্রথম সাহিত্যগুরু। বাংলা গদ্যের সর্বোত্তম সংস্কারক তিনিই। কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই স্ব স্ব প্রতিভা দ্বারা বাঙালির সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনকে একটি নূতন গরিমায় ভূষিত করিয়া গিয়াছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালিমানস-গঠনে যে তিনটি প্রতিভা সবচেয়ে বেশি কার্য করিয়া গিয়াছে তাঁহারা হইলেন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র।

॥ তিন ॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে দেখিতে পাই যে, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জীবনে ঘোরতর পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, বিবিধ অশান্তির ফলে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগ্রত হইয়াছে। আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবার পর তের বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং এই কালের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ রচনা করিয়া, তিনি রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজকে একটি নূতন রূপ দিয়াছেন ; যাহা ছিল বীজাকারে, তাহাকেই তিনি বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়াছেন। সত্যান্বেষী দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ তখন যথেষ্ট পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তারপর কি হইল? মহর্ষি নিজেই লিখিয়াছেন : "অক্ষয়কুমার দত্ত একটা 'আত্মীয়-সভা' বাহির করিলেন, তাহাতে হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত।...এখানে যাঁহারা অঙ্গস্বরূপ, যাঁহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না। কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। কোথাও মনের মত সায় পাই না। আমার বিরক্তি ও ঔদাস্য অতিশয় বৃদ্ধি হইল।" এই সময়ে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। সেই বক্তৃতা দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা তাহা পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য মনে করিলেন না। ক্ষুব্ধচিত্তে দেবেন্দ্রনাথ এক পত্রে লিখিতেছেন : "কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে। ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।"

ব্রাহ্মসমাজের জীবনে এই সময়ে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছিল, 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে' মহর্ষি তাহা পরবর্তীকালে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন : "শেষে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়াই ব্রাহ্মদলের মধ্যে বিবাদ পড়িয়া গেল। তাঁহারা তর্ক উপস্থিত করিলেন, 'ঈশ্বর অনন্ত কি প্রকারে হইতে পারেন? হস্তোত্তোলন করা

দেখি, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ কি না?' কি হাস্যাস্পদ। দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তোত্তোলন দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যে কি হাস্যাস্পদ, ইহা তাঁহারা তখন বুঝিতে পারেন নাই।...আমি এই সকল বিবাদ বিসম্বাদ দেখিয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলাম।"

দেবেন্দ্রনাথ এইসকল গোলযোগের নাম দিয়াছিলেন 'ব্রহ্মগোল'। তিনি তখন ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টিদিগের দোহাই দিয়া এই বিবাদ নিরস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মানসিক অশান্তি এমনই গভীর হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি এইবার হিমালয় হইতে ফিরিবেন না সঙ্কল্প করিয়াই গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে-ব্রাহ্মসমাজের জন্য তিনি যৌবনকালেই তাঁহার দেহ মন ও অর্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মসমাজে যেন তাঁহার নেতৃত্বের সঙ্কট দেখা দিল। অন্তরঙ্গ সহকর্মিদের ধর্মবিশ্বাসে আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্য করিয়া দেবেন্দ্রনাথ যারপর নাই বিচলিত হইয়া পড়িলেন, যুক্তিবাদী নাস্তিকদের লইয়া তিনি যেন কতকটা বিব্রত বোধ করিলেন। তাই হিমালয়ের নিভৃত প্রশান্তির মধ্যে চিত্তের শান্তি খুঁজিবার জন্য, মহর্ষি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি ভ্রমণে বাহির হইলেন। তারপর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

আর গৃহে ফিরিবেন না, এই সঙ্কল্প লইয়াই দেবেন্দ্রনাথ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুই বৎসর পরে তাঁহার এই সঙ্কল্প পরিবর্তিত হইল কেন? আত্মজীবনীতে তিনি লিখিয়াছেন: "একদিন আশ্বিন মাসে খদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম।" নদীর সেই নিম্নগামী স্রোতোধারার মধ্যে তিনি যেন তাঁহার অন্তর্যামী পুরুষের অভ্রান্ত ইঙ্গিত পাইলেন: "এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।" তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন, ইহা ঈশ্বরের আদেশ। তারপর ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করিয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছা মিশাইয়া দিয়া মহর্ষি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মনের মধ্যে যে ভাব লইয়া এবং ঠিক যে সময়ে দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিলেন, ব্রাহ্মসমাজের ক্রমবিকাশের ধারা বিচার করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, ঠিক সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে আর একটি নূতন প্রতিভার আবির্ভাবের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। সমাজের সেই পরিবর্তিত পরিবেশে ইহাকে পরিচালিত করা কিম্বা ইহাকে অগ্রগতির পথে, ইহার স্বাভাবিক পরিণতির পথে লইয়া যাওয়া একা দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে আর তখন সম্ভব ছিল না। ঈশ্বরবিশ্বাসী দেবেন্দ্রনাথ জানিতেন যে, তাঁহার সকল কার্য অন্তর্যামী পুরুষের ইচ্ছা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। আজ জীবনের ৪১ বৎসর বয়সে উপনীত হইয়া তিনি যেন নূতন করিয়া ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিলেন। বীজ হইতে যখন এতদিনে বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে, তখন ইহাতে ফুল ফুটিবেই—ব্রাহ্মসমাজ তাহার নিয়তি-নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করিবেই, হৃদয়ের মধ্যে এইরূপ একটি ধারণা লইয়াই মহর্ষি যে সেদিন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, এই অনুমান অসঙ্গত নয়।

আমরা দেখিয়াছি, প্রথম যৌবনেই কল্যাণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তের বৎসরকাল পর্যন্ত তিনি সমাজকে পরিচালিত করিয়াছেন। তারপর ব্রাহ্মসমাজের জীবনে সঙ্কট দেখা দিল, প্রেরণার অভাব বোধ হইল, মধ্যপথে অসিয়া ইহার গতি যেন সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ঠিক সেই যুগসন্ধিক্ষণেই দেবেন্দ্রনাথের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন কেশবচন্দ্র। এই দুই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের মিলনের কাহিনী যথাস্থানে বলিব।

কেশবচন্দ্রের জীবনেতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার জন্য গোপনে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া পাঠান। কথিত আছে, ব্রাহ্মসমাজের একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করিয়া তিনি সর্বপ্রথম ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্বের বিষয় অবগত হন এবং "এই পুস্তিকায় 'ব্রাহ্মধর্ম কি?' এই অধ্যায়টি পাঠ করিয়া, তাঁহার অন্তরের বিশ্বাসের সহিত উহার সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিতে পান। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহার অভিলাষ উদ্দীপ্ত হয়।" এই যে অন্তরের বিশ্বাস, ইহা কেশবচন্দ্রের মধ্যে কিভাবে জাগ্রত হইয়াছিল, সেই ইতিহাসের কথাই আগে বলিব।

দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় কেশবচন্দ্রও ধনী পরিবারের সন্তান।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের ন্যায় কলুটোলার সেন-বংশের ঐশ্বর্যের গরিমা বড় কম ছিল না, তবে সে ঐশ্বর্যের সহিত আড়ম্বর ছিল না, বিলাসিতা তো ছিলই না। দ্বারকানাথের সহিত রামকমলের পার্থক্য এইখানেই। রামকমল ধনী ছিলেন, কিন্তু মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন এবং সমকালীন বাংলার সমাজজীবনে তিনি যে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল এই মহানুভবতা। সত্য কথা বলিতে কি, ঐশ্বর্যের সহিত বৈরাগ্য—এ দৃষ্টান্ত সে যুগে একমাত্র ধর্মনিষ্ঠ রামকমলই প্রথম স্থাপন করেন। এই ধর্মনিষ্ঠাই ছিল সেন-পরিবারের প্রকৃত সম্পদ। সুতরাং কেশবচন্দ্র এক ধর্মনিষ্ঠ ধনী পরিবারের সন্তান। এই সুবিখ্যাত প্রাচীন পরিবারের সকল ঐতিহ্য লইয়াই কেশবচন্দ্র ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

কলুটোলার সেন-পরিবার ছিলেন হুগলী জেলার অন্তর্গত গৌরীভার (গরিফা) আদি অধিবাসী। কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিলেও এই পরিবারের লোকেরা অবকাশ পাইলেই স্বগ্রামে যাইতেন। সেখানে তাঁহারা সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন, ঐশ্বর্যের কোন ভেদ রাখিতেন না। স্বভাবতঃই তাঁহাদের এই প্রকার আচার-আচরণ স্থানীয় অধিবাসীদিগকে চমৎকৃত করিত। শৈশবে পরিবারবর্গের সহিত কেশবচন্দ্রও মাঝে মাঝে গরিফায় আসিতেন। এইখানেই তিনি সেইসময়ে তাঁহার সমবয়সী এবং আত্মীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে যিনি কেশবচন্দ্রের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া খ্যাতিলাভ করিবেন, সেই প্রতাপচন্দ্রের সহিত শৈশবেই কেশবচন্দ্রের পরিচয় ও সখ্যতা ইতিহাসের নিগূঢ় বিধানেই যে সাধিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বয়সে প্রতাপচন্দ্র কেশবচন্দ্র অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট ছিলেন।

কেশবচন্দ্র তাঁহার জীবনে রামমোহনকে ধর্মপিতামহ এবং দেবেন্দ্রনাথকে ধর্মপিতা বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। একেশ্বরবাদের ভূমির উপর দাঁড়াইয়া রামমোহন সকলের সহিত ভ্রাতৃত্বে মিলিতে চাহিয়াছিলেন এবং ইহার

জন্য তিনি দেশীয় ও বিদেশীয় ধর্মশাস্ত্র সমূহকে একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠার উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশবাসীগণকে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মে আনয়ন করিবার জন্য রামমোহনের প্রয়াস সুবিদিত। তিনি প্রচলিত সকল প্রকার পৌত্তলিকতার উচ্ছেদসাধন করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। মোট কথা, রামমোহন শাস্ত্র এবং যুক্তিকে অবলম্বন করিয়াই ধর্মের সংস্কার চাহিয়াছিলেন; সকল শাস্ত্রের প্রতিই তিনি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধু মহাজনদিগের কোনো জাতি নাই, ইঁহারা সকলেই ঈশ্বরের প্রভাব ও শক্তি, রামমোহন ইহা যেমন বিশ্বাস করিতেন, তেমনি আবার ধর্মের অলৌকিকত্ব তিনি স্বীকার করিতেন না, ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষদের জীবন ও উপদেশকেই তিনি স্বীকৃতি দিতেন। হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান—প্রধানতঃ এই তিন সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্রের গূঢ় আলোচনাই রামমোহন তাঁহার জীবনে করিয়াছিলেন এবং এই অলোচনার ফলে তিনি এইসিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলেন যে, "ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় ও তিনিই উপাস্য, এই মূল মতে সকলের ঐক্য আছে, কেবল অবান্তর ভেদ লইয়া বিবাদ বিসংবাদ।" এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই রামমোহন একেশ্বরবাদের ভূমিতে পৃথিবীর সকল ধর্মের লোককে এক করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের ট্রস্টডীডে তিনি তাঁহার এই মতকেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

তারপর আসিলেন দেবেন্দ্রনাথ। তাঁহার জীবনে আমরা দেখিয়াছি যে ঐশ্বর্যের সুখশয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া ধর্ম তাঁহাকে তাহার পথের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিল। ক্ষুরধারনিশিত অতি দুর্গম সেই পথে নির্ভয়ে পদ নিক্ষেপ করিয়া তিনি কিভাবে অমৃতের সন্ধান করিয়াছিলেন সে ইতিহাস সুপরিচিত। রামমোহনের আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই দেবেন্দ্রনাথ কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া ভারতবর্ষের ঋষিকল্পিত চিরন্তন ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক পূজা তাঁহার দেশবাসীর নিকট মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথও একজন সর্বজনীন ধর্মমতের প্রবক্তা। তিনিও একদিন রামমোহনের মতো তাঁহার পূর্বতন সমস্ত সংস্কার, সমস্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া একেবারে রিক্তহস্তে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন—শাস্ত্র

নয়, প্রচলিত প্রথা নয়, তাঁহার ব্যাকুলতাই একদিন তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ যখন প্রথম ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন তখন তিনি সমাজকে কি অবস্থায় দেখিয়াছিলেন তাহা তাহার নিজের কথাতেই আমরা জানিতে পারি। তাঁরপর তিনি রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবীজ কিভাবে বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, সে কাহিনীও অতি সুপরিচিত।*

দেবেন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার সংগঠনী প্রতিভা দ্বারা তিনি যতদূর পারিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজকে অগ্রগতির পথে লইয়া গিয়াছিলেন, তারপর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সহযোগিগণের শুষ্ক জ্ঞানতর্কে বিরক্ত এবং বিব্রত হইয়া সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা একরকম ত্যাগ করিয়াই তিনি হিমালয়ের নির্জনতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর কাল সেইখানে বাস করেন। দুই বৎসর পরে হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া (১৫ই নভেম্বর ১৮৫৮ খ্রীঃ) তিনি নব উদ্যমে, নব উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, শুষ্ক উপাসনা প্রণালীকে সজীব করিয়া তুলিলেন। শুষ্ক বিতর্কের স্থল তত্ত্ববোধিনী সভা ভাঙিয়া গেল; ব্রাহ্মসমাজের মৃতভাব অপসারিত হইল। ব্রাহ্মসমাজ তথা মহর্ষির জীবনের সেই শুভক্ষণে তরুণের উৎসাহ লইয়া তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন অদ্ভুতকর্মা কেশবচন্দ্র সেন। তখন কেশবচন্দ্রের বয়স কুড়ি বৎসর।

কেশবচন্দ্রের জীবনেতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, আঠার বৎসর বয়সেই তাঁহার জীবনে ধর্মের ভাব জাগ্রত হইয়াছিল এবং "তাহা দিন দিন ঘনীভূত হইয়া বৈরাগ্যের তীব্রতায় পরিণত হইল।" আঠার হইতে কুড়ি এই দুই বৎসরের আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের ইতিহাস কেশবচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার 'জীবনবেদ' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন: "যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্মসমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্মগুলি বিচার করিয়া কোন একটি ধর্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক শ্রেণীতে যাই নাই,—ধর্মজীবনের সেই উষাকালে 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর', এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতর উত্থিত হইল। ধর্ম কি, জানি না ও ধর্মসমাজ কোথায়, কেহ দেখায় নাই; গুরু কে, কেহ বলিয়া

* লেখক-প্রণীত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

দেয় নাই—জীবনের সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভাস স্বরূপ প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই' এই শব্দ উচ্চারিত হইত।"

এই প্রার্থনার ভিতর দিয়াই কেশবচন্দ্র ধর্মকে পাইয়াছিলেন, যেমন পাইয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ হইতে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কি দেবেন্দ্রনাথ, কি কেশবচন্দ্র উভয়েরই ধর্মজীবন ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিবার বহু পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ তাঁহার 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থে বাল্যকালে কেশবচন্দ্রের ধর্মানুরাগ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "কেশবচন্দ্র বাল্যকাল হইতে ধর্মপ্রিয় ছিলেন। তিনি যখন নিতান্ত শিশু, তখন তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে অন্যান্য শিশুগণ সহ হরিনাম অর্পণ করেন। অন্যান্য সকলে সে নাম ভুলিয়া যান, কিন্তু কেশবচন্দ্র সে নাম কখন ভোলেন নাই। ইনি বাল্যকাল হইতে শুদ্ধসত্ত্ব জীবন যাপন করিয়াছেন। ইনি স্নানান্তে পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া হরিনামের ছাপে সর্বাঙ্গ ভূষিত করিতেন।" রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের বাল্যপ্রকৃতি হইতে কেশবচন্দ্রের বাল্যপ্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্যটুকু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। তাঁহার সমগ্র জীবন এবং সেই জীবনের যাবতীয় চিন্তা ও কার্য এই এক সুরে রণিত, এক ছন্দে গ্রথিত। ব্রহ্মানন্দের পরিণত জীবনের ভাব ও আচরণ যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা বুঝিতে পারিবেন যে, ধর্মের ভাবটি শৈশবেই অতি স্বাভাবিক ভাবে পারিবারিক পরিবেশের মধ্য দিয়া কেশবচন্দ্রের জীবনে প্রবেশ করিয়াছিল। আরো একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহার প্রধান জীবনীকারদের বৃত্তান্তের সাক্ষ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, বাল্যকাল হইতেই কেশবচন্দ্রের চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল। ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনাকে যিনি উত্তরকালে একটি সম্পূর্ণ পরিণতি দান করিবেন, তিনি যে নির্মল চরিত্রের মানুষ হইবেন, ধর্মবোধ যে তাঁহার স্বাভাবিক ও সহজাত হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। তাই না কেশবচন্দ্র নিজে বার বার বলিয়াছেন—"I am a singular man"—আমি একটি বিশিষ্ট মানুষ। সেদিন বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে এমনই একজন 'Singular man'-এর প্রয়োজন ছিল।

॥ চার ॥

তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার ইতিহাস কেশবচন্দ্র স্বয়ং এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"ইংরাজি শিক্ষা আমার মনকে বিচলিত করিয়া দিয়াছিল, সকলই যেন শূন্য বোধ করিতাম। পৌত্তলিকতা ছাড়িলাম, কিন্তু তাহার স্থলে কোন অসন্দিগ্ধ নিশ্চিত ধর্মের সন্ধান পাইলাম না। সাংসারিকতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ভগবৎ করুণার প্রভাবে আমি উচ্চতর বিষয়ের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। স্বয়ং ভগবান আমাকে আধ্যাত্মিক জীবনের রহস্য—প্রার্থনার আশ্রয় লইতে বলিয়া দিলেন। আমি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা লিখিয়া ব্যবহার করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ আমি জ্ঞান, পবিত্রতা ও প্রেমে উন্নত হইতে লাগিলাম। তখন আমি একটা সুনির্দিষ্ট ধর্ম ও সমাজের অভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। কিছু সময় পূর্বে আমার নিজ গৃহে 'দি গুডউইল ফ্রেটারনিটি' (The goodwill fraternity) নামক একটি ক্ষুদ্র সভা বা সমাজ স্থাপন করিয়াছিলাম; 'ঈশ্বর আমাদের পিতা, আমরা পরস্পর ভাই'—ইহাই ছিল আমাদের মত। প্রচলিত পুরাতন কোন ধর্ম বা সমাজ আমার উপযোগী বলিয়া বোধ হইল না। এমন সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশিত একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা আমার হাতে আসিল। 'ব্রাহ্মধর্ম কি?'—এই অধ্যায় পড়িয়া, আমার অন্তরস্থিত বিশ্বাস ও অভিমতের সহিত তাহার মিল দেখিলাম। মানুষ বা গ্রন্থের শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া অন্তরাত্মায় ঈশ্বরের প্রকাশিত বাণী গ্রহণ করাই সর্বদা কর্তব্য, এই আমার অনুভূতি। আমি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিলাম।"

উল্লিখিত ফ্রেটারনিটি সভাতেই আসিয়া দেবেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম কেশব-চন্দ্রকে সন্দর্শন করেন। তাঁহার নিজমুখের বিবরণ এইরকম ঃ "আমি যখন কেশববাবুর নাম ও ধর্মভাবের কথা প্রথম শুনিলাম, এবং শুনিলাম যে, তিনি তাঁহাদের কলুটোলাস্থ বাটীতে সভা করিয়া তাহাতে বক্তৃতা করেন, তখন

একদিন গোপনে আমি তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম।” সেই প্রথমবার দেখিয়াই মহর্ষিদেব তাঁহার প্রতি যে একটি দিব্য আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন, সে কথাও তিনি পরবর্তীকালে নানাভাবেই প্রকাশ করেন। এই ফ্রেটারনিটি সভার মূল আদর্শ ছিল—“ঈশ্বর আমাদের পিতা, আমরা পরস্পর ভাই।” সহপাঠীদের অনেকেই কেশবচন্দ্রের এই সভায় আসিতেন এবং তিনি তাহাদের লইয়া ধর্মের আলোচনা করিতেন। শুধু আলোচনা নয়, কিশোর কেশব সেখানে একেশ্বরবাদীদের উপদেশ পাঠ করিতেন এবং ইংরেজিতে বক্তৃতাও করিতেন। বলিতে গেলে তাঁহার অপ্রতিম বাগ্মীতার সূচনা এই ফ্রেটারনিটি সভাতেই। সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র। সম্ভবতঃ পুত্রের মারফৎ দেবেন্দ্রনাথ কলুটোলার বিখ্যাত রামকমল সেনের পৌত্র কেশবচন্দ্রের পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। কেশবচন্দ্রের বয়স তখন উনিশ বৎসর। উনিশ বৎসরের ছেলে—এবং সঙ্গতি সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে—এমন ভাবে সভা করিয়া ধর্মের কথা আলোচনা করিতেছেন—উনিশ শতকের বাংলার নবজাগৃতির ইতিহাসে এই ঘটনা বিরল।

উনিশ বৎসর বয়সের একটি ধনীর ছেলের পক্ষে সমাজ ও সংসারের প্রচলিত বিলাস ব্যসনে প্রমত্ত হওয়াই যে যুগে স্বাভাবিক ছিল সেই যুগে কেশবচরিত্রে ঈশ্বরানুরাগের এই যে আভাস আমরা লক্ষ্য করি, ইহা গভীরভাবে অনুধাবনের বিষয়। ঈশ্বরের কথা, ধর্মের কথা বুঝিবার বয়স তো ইহা নহে। তখন তিনি সদ্য বিবাহিত কিশোর, কিন্তু সংসার তাঁহাকে আকর্ষণ করিল না, সাংসারিক বিলাস-ব্যসনও তাঁহাকে আকর্ষণ করিল না। এ বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার, অন্ততঃ সেই যুগের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে তো বটেই। আবার প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম নয়, একেবারে সুপ্রাচীন আর্যধর্মের মূল তত্ত্ব—একেশ্বরবাদ! কেশবচন্দ্রের জীবনচরিত যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত এবং গভীর অভিনেবেশ সহকারে আলোচনা করিবেন তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন যে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। তাঁহার জীবনেতিহাসে দেখিতে পাই যে, হিন্দু কলেজে পড়িবার সময়ই তিনি সহপাঠী ও বন্ধুদের নৈতিক উন্নতির জন্য সভা সমিতি, খেলিবার দল, স্কুল প্রভৃতি ছোটখাটো

কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রতি তাঁহার কেমন যেন একটি একাগ্র লক্ষ্য ছিল—তাহাই ছিল কেশব-জীবনের কেন্দ্রীয় বিন্দু। সতর বৎসর বয়সেই তিনি কলুটোলা সান্ধ্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পল্লীর অনেকগুলি কিশোর বালক ছাত্ররূপে সেই স্কুলে সমবেত হইল। এই স্কুলে কেশবচন্দ্রের সহকর্মীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ইঁহারা সকলেই এই স্কুলে শিক্ষকতার কার্য করিতেন। কথিত আছে, এই সান্ধ্য স্কুলে ইংরেজি সাহিত্যের পঠন-পাঠন হইত, সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত, আর সকলের চেয়ে বড়ো কথা—এখানে ধর্ম ও নীতি বিষয়ে নিয়মিত উপদেশ দেওয়া হইত। এই দুইটি ঘটনা হইতে একটি সিদ্ধান্ত অপরিহার্য—শৈশবকাল হইতেই সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের উপর কেশবচন্দ্রের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এখানে একটি প্রশ্ন আছে। এত অল্প বয়সে স্কুল করা, সভা করা কেবলমাত্র নেতৃত্বশক্তি থাকিলেই কি সম্ভব, না, কিছু বিদ্যাবুদ্ধিরও দরকার? তাঁহার জীবনেতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, "কলেজে পড়ার সময় শুধু কলেজের পরীক্ষা পাশ করিবার জন্য উদ্বিগ্ন না হইয়া জীবনের বৃহত্তর পরীক্ষা সকল পাশের জন্য তিনি জ্ঞান উপার্জনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।" কলিকাতায় তখন পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (১৮৩৬ খ্রীঃ)। হিন্দুকলেজ ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিদ্যার্জন শেষ হইয়া যায় নাই। তিনি মেটকাফ হলে (এইখানে পাবলিক লাইব্রেরি সংস্থাপিত হয়) গিয়া প্রতিদিন আট-দশ ঘণ্টা কাল অধ্যয়নে রত থাকিতেন। সে সময়ে তিনি পাশ্চাত্ত্য দর্শন, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, ধর্মবিজ্ঞান, বাইবেল, ইংরেজি সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থ একান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। শেক্সপিয়র, মিলটন, বেকন তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। হিন্দুকলেজ ও মেট্রোপলিটন কলেজে তাঁহার ছাত্রাবস্থা অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার ছিল অদম্য অধ্যয়ন-স্পৃহা। কলেজের লাইব্রেরি, মেটকাফ হলের লাইব্রেরি তিনি পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন। সেই বয়সে নিবিষ্ট মনে তিনি যখন ইংরেজি দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিতেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার দর্শনের অধ্যাপক মিঃ জোনস পর্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই অধ্যয়নস্পৃহা

তাঁহার প্রকৃতিতে একটি আশ্চর্য পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল। ইহার ফলেই শৈশবকাল হইতেই তিনি বিলাস-ব্যসনে বা হালকা আমোদ-প্রমোদে বীতস্পৃহ হইয়া উঠেন। সেই বয়সেই তিনি সর্বদাই গম্ভীর, স্বল্পভাষী ও চিন্তাশীল থাকিতেন। তাঁহার নির্মল নৈতিক চরিত্রের প্রভাব সেই বয়সেই তাঁহার বন্ধুদের অনেকের চরিত্রকেই প্রভাবিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল (১৮৫৬ খ্রীঃ)। কিন্তু সে বিবাহ নাম মাত্র। দাম্পত্য-জীবনের প্রতি তিনি তখনই বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বোধ করিলেন না। বাড়ির অনেকেই সেদিন কেশবচন্দ্রের এই ভাব দেখিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন; কেহ কেহ বিস্মিতও হইয়াছিলেন।

জীবনের এই অধ্যায়ের কথা বলিতে গিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহার 'জীবনবেদ' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন: "বিধাতা জানেন প্রথম হইতেই বৈরাগ্যের মেঘ দেখা দিয়াছিল। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অল্প অল্প ধর্মজীবনের সঞ্চার হয়; কিন্তু চতুর্দশ বৎসরেই মৎস্য ভক্ষণ পরিত্যাগ করিলাম। কে মতি দিল? কে বলিল আমিষভক্ষণ নিষিদ্ধ? এক গুরু জানিতাম, তাঁহাকেই মানিতাম; তাঁহাকে বিবেক বলিতাম।...যতপ্রকার সুখভোগ যৌবনে হয়, তৎসমুদয় বিষবৎ ত্যাগ করিলাম। তখন ধর্ম জানিতাম না,—জানিতাম সংসারী হওয়া পাপ, স্ত্রৈণ হওয়া পাপ। সংসারের বিলাসে অনেকেই মরিয়াছে।" কেশবচন্দ্রের এই বয়সের মানসলোকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি নিজেকে নিজেই তৈরি করিয়াছেন। সেই বয়সেই অল্পভাষী হইয়াছেন, চপলতা ত্যাগ করিয়াছেন। অথচ এই বয়সের এই যে বৈরাগ্যভাব আমরা কেশবচন্দ্রের চরিত্রে দেখিতে পাই, ইহার কোনো বাহ্য লক্ষণ ছিল না, অথবা ইহার জন্য শরীরকে কোনো প্রকারে কষ্ট দিয়া তাঁহাকে অস্বাভাবিক উপায়ও অবলম্বন করিতে হয় নাই। সহজ স্বাভাবিক বৈরাগ্যই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন; শরীরে ভস্ম লেপন করিয়া তাঁহাকে বৈরাগ্য সাধন করিতে হয় নাই। স্পষ্টতঃই কেশবচন্দ্রের অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এই বৈরাগ্যের ভাব তাঁহার জীবনে দেখা দিয়াছিল এবং ইহাই ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের সুষমা। ইহার জন্য পরিবারে তাঁহাকে কম নির্যাতন ভোগ

করিতে হয় নাই; অভিভাবকদের অনেকেই তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া জীবনবিধাতা কেশবচন্দ্রের চরিত্রকে যেভাবে গড়িয়া তুলিতেছিলেন, তাহা সেদিন অনেকের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে নাই। ইহার ফলে কেশবচন্দ্রের জীবনের নৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হইয়াছিল, আর চরিত্র হইয়াছিল নির্মল—একেবারে নিখাদ সোনা। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, উনিশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের অনন্যসাধারণত্ব সর্বাংশে স্বীকৃত। আজ যখন আমরা কল্পনা করি যে, সেই পৌত্তলিক পরিবারে সাকার দেবদেবীপূজা মহোৎসবের মধ্যে যাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, যাঁহার চারিদিকে ছিল বিলাস ও সুখভোগের অজস্র উপকরণ—তিনি কেমন করিয়া অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের জীবন্ত শক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন—তখন আমাদের মনে হয়, জীবনে তিনি এই মহামূল্য সত্য প্রার্থনার ভিতর দিয়াই লাভ করিয়াছিলেন। এই বৈরাগ্য, এই প্রার্থনাই ছিল কেশব-জীবনের ভিত্তিভূমি। নৈশবিদ্যালয় অথবা সভা স্থাপন করিয়া, সেই সতের-আঠার বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র যে তাঁহার সমবয়সী একদল শিক্ষিত তরুণের চরিত্রকে অমনভাবে প্রভাবিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার রহস্য তো এইখানেই। নিঃসন্দেহে "তাঁহার বৈরাগ্য, উৎসাহ ও বিশুদ্ধ জীবন একত্র মিলিত হইয়া যুবকবৃন্দের মনকে সবিশেষ প্রোৎসাহিত করিয়াছিল।"

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন।

এখন হইতে তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হইল। এই পর্বের স্থায়িত্বকাল ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। যে সাত বৎসরকাল তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই সাত বৎসরকালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের কর্মধারায় ও সংগঠনে যে বিপুল পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল, সে ইতিহাস জানিবার মতন। "ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ তাঁহার পক্ষে যতটা প্রয়োজনীয় ছিল, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষেও যেন তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ছিল মনে হয়। ব্রাহ্মসমাজই এইরূপ একজন শক্তিশালী ব্যাখ্যাতা, সংস্কারক,

সংগঠক, প্রচারক ও নেতার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।" প্রতাপচন্দ্রও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"It would almost seem that he entered the Brahmo Samaj not to learn but to teach"—এবং ইহা যে অনুরাগীর অত্যুক্তি নহে তাহা আমরা রামমোহন হইতে দেবেন্দ্রনাথের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ-কাল পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিয়াই বুঝিতে পারি। "রাজা রামমোহন ব্রাহ্মধর্মের যে বীজ এদেশে বপন করিয়া গিয়াছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় সবেমাত্র তাহা অঙ্কুরিত হইতেছিল, তাহার ক্রমবিকাশের অনন্ত পথ অনাবিষ্কৃত অবস্থায় সম্মুখে প্রসারিত ছিল। সেই পথ আবিষ্কার ও তাহার সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্যই যেন বিধাতা কেশবচন্দ্রকে এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। সেই সুমহৎ ও সুকঠিন কর্মভার লইয়াই কেশবচন্দ্র ধর্মজীবনে প্রবেশ করিলেন।"

প্রবেশ করিয়া তিনি যখন দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসিলেন তখন তরুণ কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে শুধু একজন যৌবন-সম্পন্ন সুন্দর সতেজ পুরুষকেই দেখিলেন না, পরন্তু তাঁহার মধ্যে তিনি সেই মানুষকেই প্রত্যক্ষ করিলেন যাঁহার জীবনে ঈশ্বরানুভূতি ছিল প্রত্যক্ষ সত্য বস্তু, কল্পনাবিলাস নয়। কেশবচন্দ্র তাঁহার সকল সত্তা দিয়া অনুভব করিলেন যে, তিনি যেন এক বিরাট ধর্মজীবনের সান্নিধ্যে আসিয়াছেন—যে জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মসান্নিধ্য নিত্য সাধনে পরিণত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার সমস্ত হৃদয়-মন দিয়া ব্রহ্মানুভূতি উদ্ভাসিত সেই মূর্তি নিরীক্ষণ করিলেন এবং সেই প্রথম দর্শনেই কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে সেই মূর্তি মুদ্রিত হইয়া গেল—তিনি দেবেন্দ্রনাথকে পিতৃরূপে অর্থাৎ ধর্মজীবনের পিতারূপে বরণ করিলেন। অন্যদিকে তরুণ কেশবচন্দ্রের মধ্যে বিশুদ্ধ ধর্মভাব দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই তরুণের সহিত তিনি এক আধ্যাত্মিক যোগ অনুভব করিলেন। এই দীর্ঘকাল তিনি এই ব্রাহ্মসমাজকে গড়িয়াছেন, ব্রাহ্মধর্মকে রূপ দিয়াছেন, কত নবীন প্রাণে এই নবধর্মের প্রতি উৎসাহ এবং আগ্রহ প্রদীপ্ত করিয়া দিয়াছেন, তথাপি দেবেন্দ্রনাথের মনে হইয়াছে, কোথায় সেই মানুষ যাহার নিকট ধর্ম নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতন স্বাভাবিক, কোথায় সেই

সংগঠনী প্রতিভা যাহাকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজ তাহার নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিণতির পথে অগ্রসর হইবে? সেই মানুষকেই আজ তিনি যেন এই তরুণ কেশবচন্দ্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিলেন। এইভাবেই সেদিন দেবেন্দ্রনাথের জীবন-চেতনার সহিত বিপ্লবী কেশবচন্দ্রের অগ্নিময়ী চেতনা আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। ইতিহাস ইহারই অপেক্ষায় ছিল।

কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ সত্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ব্রাহ্মসমাজের যে অবস্থায় তিনি ইহাতে যোগদান করেন, সেই অবস্থায় সমাজের পক্ষে ইহা যে কত প্রয়োজনীয় ছিল ব্রাহ্মসংঘের পরবর্তী ইতিহাসই তাহার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ব্রাহ্মসমাজের যে ইতিহাস তাহা কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইয়াছে। এই সময় হইতেই ব্রাহ্মসমাজ তাহার ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে পদক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জ্ঞান, মনীষা ও ধ্যাননিষ্ঠার দ্বারা সমাজের যতটুকু উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক। কিন্তু তাঁহার চিত্ত যতই ব্রহ্মধ্যানের নিবিড়তার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে লাগিল ততই যেন দেবেন্দ্রনাথ সমাজ হইতে নিজেকে পৃথক করিয়া লইতে লাগিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটীতে এই কলিকাতা শহরে ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে রাজা রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মসমাজের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন, যে সর্বজনীন ধর্মের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছিলেন—তাহার ঐতিহাসিক পরিণতি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভায় ধরা পড়ে নাই; যদি পড়িত তাহা হইলে কেশবচন্দ্র সেনের প্রয়োজন হইত না। রামমোহনকে কেশবচন্দ্র সর্বমানবজাতির প্রতিনিধি হিসাবে দেখিয়াছেন, আর-সকলে তাঁহাকে দেখিয়াছেন কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের একজন সংস্কারক হিসাবে, ভারতপথিক হিসাবে। ধর্মজগতে রামমোহন একজন দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ধ্যানসমাহিতচিত্ত একজন সাধক। অথচ এই দুইজনকেই কেশবচন্দ্র ধর্মপিতামহ ও ধর্মপিতার স্বীকৃতি দিয়াছেন। রামমোহনের পর ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ধর্মসংস্কারের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রই এ-কালে দ্বিতীয় যোদ্ধা পুরুষ।

ধর্মপিতামহ রামমোহন সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। "Among India's great men Rammohun Roy holds a high rank. Like all great men he brought into the world his own idea and devoted his life to its realisation. That idea was **catholic worship.** Whoever has deeply studied his life and carefully looked into his speculations and movements, cannot but admit this to have been his guiding principle. That he was a religious reformer of India is universally admitted, and as such he is universally admired. He is also reputed as an extraordinary theologian. He knew English, Arabic, Sanskrit, Greek, Latin, and Hebrew and his writings bear testimony to his vast and varied learning." কেশবচন্দ্র রামমোহনকে "Giant mind" বলিয়াছেন এবং এই বিরাট মনের পরিচয় দিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন: "The ruling idea of his mind was **to promote the universal worship of the One Supreme Creator, the Common Father of mankind.**" শুধু তাহাই নহে। বিলাত যাইবার পূর্বে রামমোহন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে ট্রষ্ট ডিড সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন তাহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন: "Who can contemplate, without emotion, the grandeur of such a universal church—a church not local or denominational, but wide as the universe, and co-extensive with the human race, in which all directions of creed and colour melt into one absolute brotherhood? Who can look without wonder and profound reverence upon moral grandeur of that giant mind which conceived and realised such a church?"

তারপর ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে আলোচিতব্য। রামমোহনের

মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব যে দেবেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, ইহা কেশবচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথকে তিনি "original genius of a revolutionary reformer" বলেন নাই। দেবেন্দ্রনাথের মিশন ছিল, "The worship of God as a living reality, in spirit and love" এবং ইহাকে সার্থক করিয়া তোলাই ছিল মহর্ষির জীবনব্রত এবং তিনিও যে ইতিহাসের একটি গুরুতর প্রয়োজনকে সর্বতোভাবে সার্থক করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কেশবচন্দ্র নিঃসন্দেহ ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে তিনিও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়াছেন, তবে রামমোহনের মানসিকতা মহর্ষির ছিল না। কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন: "In vain would we expect to find Babu Debendra Nath occupying the front ranks of the battlefield of reform, doing desperate battle with absurd usages and institutions, reducing the old castle of error into ruins with single-handed valour and purchasing triumph with hard sacrifices. This is quite foreign to his ideas and his quiet misson. Not war but peace is his watch-word; not action but contemplation. He summons us not to the stirring activities of social battles but takes us into the closet and beside the altar". কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতি যে রামমোহন অপেক্ষা গভীরতর ছিল, এ-কথা কেশবচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন। প্রার্থনা এবং ধ্যানের ভিতর দিয়া মহর্ষি ব্রহ্মসান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাই ধর্মসংস্কারক হিসাবে তাঁহার পক্ষে যোদ্ধ্ভাব অবলম্বন করা অসম্ভব ছিল। আবার এই নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তা, ব্রহ্মধ্যান যে মানুষের জীবনে শুষ্কতা বা নীরসতা আনিয়া দেয় না, ইহা জীবনকে সরস ও সুন্দর করিয়া তোলে, মহর্ষির জীবন তাহারই সাক্ষ্য বহন করে। কেশবচন্দ্র তাই বলিয়াছেনঃ "Thus God was to him both life and love...this life is a standing rebuke to those who represent theism as a dry abstract creed incapable of influencing the heart much less of administering comfort and

peace to it...Here is a life which show us vividly the influence of theistic faith, its vitality and its joys. "আর মহর্ষির তত্ত্ববোধিনী সভার প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, সমাজের পুনর্জীবনের পক্ষেই ইহার প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং "This society lived to do immense good to the Brahmo Samaj and to Bengal, and entitled itself to the enduring gratitude of the nation few will venture to deny."

রামমোহনের বিশ্বব্যাপক মানসিকতা ও বিশ্ববিজয়ী যোদ্ধভাব আর দেবেন্দ্রনাথের অখণ্ড শান্ত ব্রহ্মানুরাগ—পিতা ও পিতামহের এই দুই ভাবের সম্যক অনুশীলনের ভিতর দিয়াই কেশবচন্দ্রের জীবন ও জীবনাদর্শ দুই-ই সার্থক হইয়াছিল।*

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের উক্তিগুলি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

॥ পাঁচ ॥

ব্রহ্মসমাজে যোগদান করিবার এক বৎসর পরে কেশবচন্দ্রের জীবনে একটি অগ্নিপরীক্ষা আসিল। ইহা পারিবারিক দীক্ষা। কুলগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ হিন্দুসমাজের একটি অতি পুরাতন প্রথা বলিয়া স্বীকৃত ছিল। কলুটোলার সেন-পরিবার পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব এবং দীক্ষা-বিষয়ে বৈষ্ণবপরিবারমাত্রের নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ়। কেশবচন্দ্র যখন শুনিলেন যে পরিবারের চিরাচরিত প্রথানুসারে তাঁহাকে তাঁহাদের কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে, তখন স্বভাবতঃই তাঁহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বিবেক বজ্রধ্বনিতে পৌত্তলিক গুরুর নিকট পৌত্তলিক মন্ত্র গ্রহণের সুদৃঢ় প্রতিবাদ করিল। দীক্ষাগ্রহণে তিনি সম্মত হইলেন না এবং সে-কথা তিনি স্পষ্টভাবেই তাঁহার অভিভাবকদের জানাইয়া দিলেন। পরিবারের মধ্যে যাঁহারা কেশবচন্দ্রের অপৌত্তলিক মনোভাব অবগত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে এমন উপদেশও দিলেন যে—"গুরু যেমন মন্ত্র দিবার দিয়া যান, সে-মন্ত্র জপ বা পূজাদি কিছু না করিলেই হইল।" বলা বাহুল্য, কেশবচন্দ্রের বিবেক ইহাতে সায় দিতে পারিল না। তিনি দীক্ষা তো গ্রহণ করিলেনই না পরন্তু অনুষ্ঠানের দিন তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সোজা জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথের নিকট চলিয়া গেলেন। প্রতিবেশিরা ভাবিলেন, সেন-পরিবারের পুত্র কেশবচন্দ্র বুঝি খ্রীষ্টান হইবার জন্য পাদরিদের নিকট চলিয়া গিয়াছেন। সেইদিন গভীর রাত্রেই তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

সেন-পরিবারে এই ব্যাপারটি লইয়া অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব; তাঁহাদের জীবনের আচার-আচরণ সবই পুরাতন ধারায় চলিয়া আসিতেছে। সে-ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের এই বিসদৃশ আচরণে তাঁহার অভিভাবকদের পক্ষে ক্ষুব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। অধিকন্তু যখন তাঁহারা পরিষ্কাররূপে জানিতে পারিলেন যে, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম হইয়াছেন, তখন তাঁহাদের ক্ষোভের সীমা-পরিসীমা ছিল না। তখনকার দিনের

নিষ্ঠাবান ও প্রাচীনপন্থী হিন্দুদিগের চক্ষে খ্রীষ্টান হওয়া আর ব্রহ্মে হওয়াতে খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। পরিবারের সকলেই যে তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেন, কেশবচন্দ্র তাহা বুঝিলেন। বুঝিবার মত বয়স তখন তাঁহার হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের প্রধান জীবনচরিতকার উপাধ্যায় মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "কেশব দীক্ষা গ্রহণ করিলেন না, ধর্মান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, ম্লেচ্ছবৎ বিদ্বিষ্ট ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে যোগ দিলেন, ইহাতে পরিবারমধ্যে একটি হুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেনের অত্যন্ত প্রতাপ, কিন্তু কেশবের ধীরতা দৃঢ়নিষ্ঠতার নিকটে উহা পরাজয় লাভ করিল।"

কলুটোলার সেন-পরিবারে এই ঘটনাটির গুরুত্ব বড় কম নয়। ইহার পর হইতে এই পরিবারের আর কোনো যুবক কুলগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। দৃষ্টান্তের প্রভাব এইরকমই হইয়া থাকে। আবার কেশবচন্দ্রের জীবনের বহু ঘটনার মধ্যে এই ঘটনাটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যই পরবর্তীকালে কেশব-চরিত্রকে এক আশ্চর্য গরিমা দান করিয়াছিল। বিবেক যে কাজ অনুমোদন করিত না, অন্তর যে কাজে সায় দিত না, মন যে কাজে উল্লসিত হইয়া উঠিত না, কেশবচন্দ্রের পক্ষে সেইরকম কোন কাজ করা অসম্ভব ছিল। ইহার নিকট পারিবারিক আনুগত্য যেমন তুচ্ছ মনে হইত, তেমনি পরবর্তী জীবনে যখনই প্রয়োজন বুঝিয়াছেন, বিবেকের কঠিন নির্দেশ মানিয়াই চলিয়াছেন, কখনো কপটাচার করেন নাই। ইহাই কেশবচন্দ্র।

বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে বিভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় কলিকাতার একাধিক স্থানও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ি, শোভাবাজার রাজবাটী, কলুটোলার সেনেদের বাড়ি, সিন্দুরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বাড়ি—এইরকম বিভিন্ন স্থানগুলিও সমসাময়িক বহু ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাদেরও ঐতিহাসিক মূল্য আছে, কারণ ইহারা বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। কালের প্রবাহে আজ কলিকাতার এইসব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি একে একে নিশ্চিহ্ন প্রায় হইয়া

যাইতেছে—দেখা যাইতেছে, তিন পুরুষের মধ্যেই উনিশ শতকের সেই বিরাট ব্যাপক নবজাগরণের যেন সমাধি শয্যা রচিত হইয়া গিয়াছে। যে বিপুল সম্পদ একদিন আমাদের পূর্বপুরুষেরা অর্জন করিয়াছিলেন, যাঁহাদের অলোক-সামান্য প্রতিভার স্পর্শে জাতির জীবনের সকল দিক—শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম—উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—সেই সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াও আমাদের জীবনে আজ এত দৈন্য কেন? কেন জাতির মানসলোক আজ ধূসর? সেই প্রতিভার উত্তাপ আমরা কেমন করিয়া হারাইলাম? তাহা হইলে কি উনিশ শতকের নবজাগরণ মিথ্যা? অথবা সেই নবজাগৃতির পুরোধাগণের জীবনসাধনা মিথ্যা? আজ এই প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক কারণেই আমাদের মনে জাগিয়াছে। আর এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারিলে উনিশ শতকের যুগমানস-স্রষ্টাদের জীবনানুশীলন বৃথা। আদর্শ নাই, আদর্শের স্মৃতিমাত্র আছে। শহরের ঐতিহাসিক স্থানগুলি আজ একে একে অবলুপ্তির পথে চলিয়া যাইতেছে, ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি আমাদের স্মৃতিপটে ক্রমেই ধূসর হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের রচনা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি—বাঙালি তবে কী লইয়া মহৎ জীবনের পথে অগ্রসর হইবে? দেশের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে আজ সমগ্র উনিশ শতকের সাধনাকে নূতন করিয়া দেখিতে হইবে এবং বিগত শতাব্দীর বাঙালির অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামোতে কী ত্রুটি ছিল, আজ তাহা আমাদের নূতন করিয়া বুঝিবার দিন আসিয়াছে।

যে কথা বলিতেছিলাম। উল্লিখিত ঐতিহাসিক স্থানগুলির মধ্যে সিন্দুরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বাড়ির সহিত কেশবচন্দ্রের কর্মজীবনের কিছু স্মৃতি বিজড়িত আছে। দেখিতে পাই, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি এই বাড়িতে মঞ্চনির্মাণ করিয়া বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয় করেন। তখন পাইকপাড়ার রাজারা বেলগাছিয়া থিয়েটার খুলিয়াছেন। কলিকাতায় বিদেশী সভ্যতার অন্যান্য বহু জিনিসের সঙ্গে থিয়েটারও আসিয়া গিয়াছে, এবং শিক্ষিত বাঙালির চিত্ত সেই সময় হইতেই মঞ্চাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। পাইকপাড়ার রাজাদের ব্যয়বহুল থিয়েটার দেখিয়া কেশবচন্দ্রের মনে ইচ্ছা জাগিল, ইহার চেয়ে ভালো অভিনয় করিতে হইবে। অভিনয়-

প্রীতি তাঁহার স্বাভাবিক ছিল এবং হিন্দুকলেজে পাঠ্যাবস্থায় তিনি সহপাঠীদের লইয়া শেক্সপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটক অভিনয় করেন ; তিনি স্বয়ং হ্যামলেটের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহা ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। এই অভিনয়ে আর যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার. অক্ষয়কুমার মজুমদার, ভোলানাথ চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি। কিশোর বয়সের এই নাট্যাভিনয়-প্রীতির পরিণতি জীবনশেষে 'নববৃন্দাবন' অভিনয়। গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্য-লীলা' অভিনয় একদা কলিকাতায় সর্বশ্রেণীর দর্শকচিত্তে যেরকম আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, কেশবচন্দ্রের 'নববৃন্দাবন' ঠিক তাহাই করিয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন বাংলার সমাজজীবনে এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই আন্দোলনকে সমর্থন জানাইয়াই বিধবা-বিবাহ নাটক রচিত হইয়াছিল। উমেশচন্দ্র মিত্র এই নাটক রচনা করেন। বিদ্যাসাগরের এই মহৎ সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার প্রতি কেশবচন্দ্রের অনুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি উদ্যোগী হইয়া এই নাটক অভিনয় করেন। "অভিনয় জন্য যুবকদিগকে প্রস্তুত করা এবং রঙ্গভূমি প্রভৃতি সজ্জিত করার যাবতীয় কার্য তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অভিনয় কার্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি দেশস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিসকল সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অভিনয় দেখিয়া একান্ত সন্তোষ লাভ করেন।" 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নাটকের পর সামাজিক সমস্যা লইয়া নাটকের অভিনয়ে কেশবচন্দ্রই সেদিন অগ্রণী ছিলেন। জনচিত্তে ইহার প্রভাব ও আবেদন গভীর ও দূরপ্রসারী হইয়াছিল।

কেশবচন্দ্র চিরদিন অভিনয়কলার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, "অভিনয় দ্বারা নীতি ও সমাজ সম্বন্ধে সংস্কার অতি সহজে নিষ্পন্ন হয়।" সিন্দুরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বাড়ির সহিত কেশবচন্দ্রের কর্মজীবনের আর একটি স্মৃতি বিজড়িত আছে। ইহা ব্রহ্মবিদ্যালয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল কেশবচন্দ্র যুবকদিগের ধর্মশিক্ষার জন্য ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদ্যালয়টি প্রথমে কলুটোলায়

তাঁহাদের বাড়িতেই বসিয়াছিল, পরে ইহা গোপাল মল্লিকের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই বিদ্যালয়টি সম্পর্কে আমরা এই বিবরণ দেখিতে পাই : "সম্প্রতি সিন্দুরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বাটীতে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তথায় প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ৭ ঘণ্টা অবধি ৯ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে।...শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহার প্রতি প্রীতি এবং তাহাতে আত্ম-সমর্পণ বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন; এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ঈশ্বরের প্রিয়কার্য সাধন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মের লক্ষণ ও তদনুষ্ঠান বিষয়ে সুচারু উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।"

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। একেশ্বরবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমি এইখানেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই ব্রহ্মবিদ্যালয় দ্বারাই ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস, বেদ ও উপনিষদের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া একটি সার্বভৌমিক মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের অনুরাগী যুবকবৃন্দই এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন; ইঁহারা সকলেই যে ব্রাহ্ম ছিলেন, এমন নয়। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় দুইটি। প্রথম, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ১৮৫৫ হইতে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই চারি বৎসর কালের মধ্যে কেশবচন্দ্রের কর্মপ্রতিভা (১) নৈশ-বিদ্যালয়; (২) ফ্রেটারনিটি সভা; (৩) বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয় এবং (৪) ব্রহ্মবিদ্যালয়—এই চারিটি বিভিন্ন প্রয়াসের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছিল। এই চারিটি কাজ একটি গোষ্ঠীকে সঙ্গে লইয়া তিনি একসঙ্গেই চালাইয়াছেন। সমষ্টি-মনের (Group mind) স্রষ্টা যেমন দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন, তেমনই ছিলেন কেশবচন্দ্র এবং পরিণত কর্মজীবনে তিনি ইহার যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। "একদিকে বৈরাগ্যনিষ্ঠা, অপরদিকে আমোদ, একদিকে ধর্মজ্ঞান অধ্যয়ন অধ্যাপন, অপরদিকে সৎকার্যানুষ্ঠান—এইরূপ বিপরীত বিষয়ের সামঞ্জস্য প্রথম হইতেই তাঁহাতে দেখা গিয়াছিল।" এইসব বিভিন্ন কর্মপ্রয়াস হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, জীবনের প্রথম হইতেই কেশবচন্দ্র একজন কর্মীপুরুষ ছিলেন, ভাবসর্বস্ব মানুষ ছিলেন না। যুগ-মন স্পষ্টতঃই তাঁহার ভিতর দিয়া

অভিব্যক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া কেশবচন্দ্র বুঝিলেন সপ্তাহে একদিন উপাসনার ভিতর দিয়া ধর্মের অনুশীলন কতটুকু হইতে পারে? নূতন যুগ আসিয়াছে, নূতন ধর্মচিন্তা আসিয়াছে, যুবকদিগের মনে ইহাকে স্থায়ী করিয়া তুলিবার কথা তিনি চিন্তা করিলেন, বৃহত্তর সমাজ-জীবনের মধ্যে ধর্মের আগুন তিনি ছড়াইয়া দিতে চাহিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সহিত তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া সমর্থন পাইলেন এবং তাঁহারই সহায়তা ও উৎসাহে তিনি ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ১৮৫৯-এর বাংলায় নিঃসন্দেহে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেশবচন্দ্র ইংরেজিতে এবং মহর্ষি বাংলায় উপদেশ দিতেন। কথিত আছে, নানা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও একেশ্বরবাদের আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া কেশবচন্দ্র বিদ্যালয়ে তাহা ব্যাখ্যা করিতেন। নীতি, চরিত্র সংগঠন, প্রার্থনা, ঈশ্বরপ্রেম প্রভৃতি বহু বিষয়ে ছাত্রদের উপদেশ দেওয়া হইত। শুধু উপদেশ দিয়াই তাঁহারা তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিতেন না; নিয়মিত পরীক্ষা ও প্রশংসাপত্রের ব্যবস্থাও ছিল। দর্শন ও বিজ্ঞান—যুগপৎ দুইটি বিষয়ে শিক্ষা দিয়া সেদিন তিনি এইভাবে তরুণ বাংলাকে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের উপদেশ শুনিবার জন্য বহু সংখ্যক যুবক আকৃষ্ট হইত। কথিত আছে, কোনো কোনো ইংরেজ অধ্যাপক ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে আসিয়া কেশবচন্দ্রের অধ্যাপনা দেখিয়া, দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। এইভাবেই তরুণ কেশবচন্দ্রের উদ্যম ও উৎসাহ বাংলার নবজাগরণকে দ্রুত অগ্রগতির পথে লইয়া গিয়াছিল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সত্যই বলিয়াছেন, "Keshub's zeal and energy knew no bounds", কেশবের উৎসাহ ও শক্তির সীমা ছিল না।

ব্রহ্মবিদ্যালয় গোপাল মল্লিকের বাড়িতে বেশি দিন থাকে নাই; পরে উহা জোড়াসাঁকোর আদি ব্রাহ্মসমাজের দোতলার ঘরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই বিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ যেসব উপদেশ দিয়াছিলেন, সেগুলি প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। এবং পরে 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে

প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্রের উপদেশগুলি তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয় নাই ; স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। তবে এই সময়ে তিনি যেসব উপদেশ দিয়াছিলেন; পরবর্তীকালে উহাই তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকার (tract) মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে কথা আমরা পরে বলিতেছি। এইখানে একটি প্রশ্ন আছে। ব্রহ্মবিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয় তখন কেশবচন্দ্রের বয়স মাত্র একুশ বৎসর। এই অল্প বয়সে বিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশাবলীর বৈচিত্র্য ও গভীরতা দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। এই জ্ঞান তিনি কোথায় পাইলেন ? ধর্মের মূল কোথায়—উপনিষদে, না মানুষের সহজবুদ্ধিতে ?—এই চিন্তা তখন অনেকের মনেই দেখা দিয়াছিল। তৎকালীন ব্রাহ্মদের যে বিশ্বাস তাহার ভিত্তি ছিল পরোক্ষ জ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান তখনো পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে স্থানলাভ করে নাই। আমরা জানি, শৈশবাবধি কেশবচন্দ্রের চিত্তের গতি ছিল সহজজ্ঞানের প্রতি। "কোন শাস্ত্র বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মত আশ্রয় না করিয়া কেশবচন্দ্র সহজে ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, প্রার্থনাযোগে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।" বলিয়াছি, কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের প্রথম ও প্রধান কথা, প্রার্থনা। প্রার্থনার ভিতর দিয়া যে পথ তিনি পাইয়াছিলেন তাহাকে তিনি অভ্রান্ত বলিয়াই জানিয়াছিলেন। তাই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবার পর কেশবচন্দ্রের মনে হইয়াছিল যে, নিশ্চয়ই ইহার একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। সেই ভিত্তি খুঁজিয়া পাইতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। কলিকাতা লাইব্রেরিতে গিয়া রাশি রাশি পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং ইতিহাস গ্রন্থ তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ নয়, একাগ্র অধ্যয়ন। "রিড, ষ্টুয়ার্ট, কুজিন, কোলেরিজ, মোরেল, হ্যামিল্টন প্রভৃতি সহজ জ্ঞান-বাদিগণ তাঁহাকে এ সম্বন্ধে সাহায্যদান করিয়াছিলেন।" ব্রহ্মবিদ্যালয়ে তিনি এই সহজ জ্ঞানের তত্ত্বই বিশেষরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম যে ইহারই উপর সংস্থাপিত, এই সহজ সত্যটি কেশবচন্দ্র সেদিন সকলকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ধর্মজগতে ইহা একটি বড় রকমের বিপ্লব। কেশবচন্দ্রের ধর্মচিন্তার সহিত দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার ইহাই ছিল মৌল পার্থক্য।

১৮৫৯, ২৭শে সেপ্টেম্বর।

দেবেন্দ্রনাথ এই বৎসরে সিংহল-ভ্রমণে বাহির হইলেন। ইহাই তাঁহার দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রা। এইবার তাঁহার ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন তিনজন—পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্রতুল্য কেশবচন্দ্র ও বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ গাঙ্গুলী পরিবারের কালীকমল গাঙ্গুলী। কেশবচন্দ্র তাঁহার পরিবারবর্গের অজ্ঞাতসারেই গিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'বোম্বাই চিত্র' গ্রন্থে এই ভ্রমণের বর্ণনা দিয়াছেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার সিংহলভ্রমণের দিনলিপি ইংরেজিতে লিখিয়াছিলেন। কৌতুহলীপাঠক "ইহাতে কেশবচন্দ্রের তরুণ বয়সোচিত ভাববিকাশ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবেন।" ইহা *Diary in Ceylon* নামে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই দিনলিপিতে ১৮৫৯-র ২৭ শে সেপ্টেম্বর হইতে ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কেশবচন্দ্রের চিত্তবিকাশের পক্ষে এই ভ্রমণ বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন: "প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের যে আশ্চর্য বন্ধুতা ছিল, সেই বন্ধুতা তাঁহাকে উদার মহান গভীর সাগরের সঙ্গে মিলিত করিয়া সকল প্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন ছেদন করিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। তাঁহার মন ক্ষুদ্র চিন্তা পরিহার করিয়া একেবারে মহত্বের ভিতরে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে ঈশ্বরপ্রীতির প্রতিভা মিশিয়াছে।" মনে রাখিতে হইবে, কেশবচন্দ্র তখন সবে মাত্র বিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন; সেই বয়সেই তিনি তাঁহার হৃদয়ের উদারতা ও ভাবের মধুরতা সুন্দর ইংরেজিতে প্রকাশ করিয়াছেন—ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের দেশে সুরুচি-সম্পন্ন ভ্রমণবৃত্তান্তের লেখক হিসাবে মহর্ষির পরেই কেশবচন্দ্রের স্থান। সম্ভবতঃ এই দৃষ্টান্তই রবীন্দ্রনাথকে ভ্রমণসাহিত্য রচনায় প্রেরণা জোগাইয়া থাকিবে।

সিংহল-ভ্রমণ অন্তে কেশবচন্দ্র যখন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন তখন তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে হয়ত স্বগৃহের দ্বার তাঁহার জন্য চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। হইবার কথাই বটে। তিনি হিন্দুর বহুনিন্দিত সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন, বিদ্বিষ্ট ঠাকুর-পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আবদ্ধ হইয়াছেন,

পরিবারের সকল প্রকার শাসন অতিক্রম করিয়া অনেকখানি স্বাধীনচেতা হইয়া উঠিয়াছেন, ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন—এতগুলি অপরাধ যে কোনো সংরক্ষণশীল হিন্দুপরিবারের ছেলের পক্ষে অমার্জনীয় বৈকি! তথাপি ফিরিবার পর কেশবচন্দ্র গৃহে সাদরে স্থান লাভ করিলেন। তবে এইবার তাঁহার অভিভাবকবর্গ তাঁহাকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটি চাকরি করিয়া দিলেন। সেনেরা পুরুষানুক্রমে এই ব্যাঙ্কে দেওয়ানী করিয়া যশস্বী হইয়াছেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন তখন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান, তাঁহার বড়দাদা নবীনচন্দ্র ব্যাঙ্কের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত, একান্নবর্তী পরিবার—সংসারের দায়-দায়িত্ব এই সময়ে কেশবচন্দ্রের উপর ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন কেশবচন্দ্র বিবাহিত, তাই তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহারা চাহিলেন যে ধর্ম ধর্ম করিয়া তিনি যেন আর সময়ের অপব্যয় না করেন। কাজেই চাকরি করিবার কথা যখন উঠিল, কেশবচন্দ্র সে অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন না। তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকরি লইলেন (পরবর্তীকালে ইহাই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত হয়; বর্তমানে ইহার নাম ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া)। কিন্তু "কেশব-চন্দ্রের বিষয়কর্মে প্রবৃত্তি অন্য আর দশজন সংসারীর ন্যায় ছিল না; তিনি কার্য করিয়া যে অবসর লাভ করিতেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইত।" মেধাবী এবং পরিশ্রমী কেশবচন্দ্রের পক্ষে চাকরি-জীবনে পদোন্নতি লাভ করা কিংবা অর্থোপার্জন করিয়া ধনী হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু পুরা দুই বৎসরও তাঁহাকে ব্যাঙ্কের চাকরি করিতে হয় নাই। এখানেও সেই বিবেকের প্রশ্ন ছিল—ব্যাঙ্কের প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইয়াই অবশেষে কেশবচন্দ্র ঐ চাকরি পরিত্যাগ করেন। অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার জীবন-বিধাতা তাঁহার জীবনের গতি এইভাবে উঁহার নিয়তি-নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিলেন। এই ঘটনার ছয় বৎসর পরে অবশ্য আর একবার পারিবারিক প্রয়োজনে কেশবচন্দ্র দুই মাসের জন্য চাকরি করিয়াছিলেন।

॥ ছয় ॥

"Young Bengal, this is for you" !

"তরুণ বাঙালি, ইহা তোমাদেরই জন্য।"

১৮৬০, জুন মাস। বাংলার নবজাগরণ তখন (১৮৫৫-৬০) অনেকখানি পথ অগ্রসর হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, সিপাহী বিদ্রোহের মত একটি প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে, নীলকর আন্দোলন হইয়াছে, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক বাহির হইয়াছে, বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হইয়া বাংলা গদ্যসাহিত্যে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে—এইসব ঘটনা একটির পর একটি তরঙ্গ তুলিয়া নবজাগরণকে যখন বেগবান করিয়া তুলিয়াছে সেই সময় একদিন বাঙালি শুনিল :

"Young Bengal, this is for you." !

"তরুণ বাঙালি, ইহা তোমাদেরই জন্য।"

কাহার কণ্ঠস্বর? কে এই আহ্বান পাঠাইল? ইহাই ছিল সেদিন বাঙালির প্রতি কেশবচন্দ্রের আহ্বান। বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকরি করিবার অবসর কালে কেশবচন্দ্র সমসাময়িক জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করিয়া সেই সম্পর্কে একাধিক পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রথম বয়সের সুপ্রসিদ্ধ রচনা—*The Tracts for the Times* এবং এই প্রধান শিরোণামায় তিনি জুন ১৮৬০ হইতে জুন ১৮৬১-এর মধ্যে বারোখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বারোখানি পুস্তিকার নাম : (১) **Young Bengal, this is for you,** (২) **Be prayerful,** (৩) **Religion of Love,** (৪) **Basis of Brahmaism,** (৫) **Brethren, Love your Father** ; (৬) **Signs of the Times,** (৭) **An Exhortation** ; (৮)-(৯) **Testimonies to the validity of intuitions—Parts I & II,** (১০)

The Rev. S Dyson's questions on Brahmaism answered, (১১) Revelation এবং (১২) Atonement and Salvation. যে দেড় বৎসরকাল কেশবচন্দ্র ব্যাঙ্কের চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন, দেখা যাইতেছে যে, কাজের অবসরে তিনি ব্রাহ্মসমাজের কথা চিন্তা করিয়াছেন। প্রথম পুস্তিকায় "ধর্মহীন শিক্ষার কুফলে যুবকগণের কি প্রকার হীনাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, অসার বাক্যব্যয় তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র সার কার্য হইয়াছে, কার্যকালে অত্যন্ত ভীরুতা প্রদর্শন তাঁহাদিগের জীবনের লক্ষণ হইয়াছে ;—এই সকল বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া, কি উপায়ে এই হীনতা বিদূরিত হইতে পারে", তাহাই কেশবচন্দ্র অল্প কথায় অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তরুণ বাঙালিসন্তানকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন: "Alas ! the moral nature is asleep ; the sense of duty is dead. There is lack of moral courage—want of an active religious principle in our pseudo-patriots. Else, why is it that while there is, on the one hand, so much of intelligence and intellectual progress, there is on the other so little of practical work for the social advancement of the country ? There is a line of demarcation between a mind trained to knowledge and a heart trained to faith, piety and moral courage."

কেশবচন্দ্রের এই কথাগুলি গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। হিন্দু কলেজের ধর্মহীন, নীতিহীন শিক্ষা দেশের যুবচিত্তে বিপ্লব আনিয়া দিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বিপ্লব উত্তেজনার নামান্তর মাত্র ছিল। ধর্ম ও নীতি ভিন্ন অন্য কিছু জাতীয় জীবনের যে সুদৃঢ় ভিত্তি হইতে পারে না—এই কথা সেদিন স্পষ্টভাবে বলিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন ছিল। "Faith, piety and moral courage"—বিশ্বাস, সাধুতা এবং সৎসাহস, জাতীয় চরিত্র গঠনের এই তিনটি যে প্রধান উপাদান, এই কথা সেদিন কেশবচন্দ্রের ন্যায় আর কেহই এমন নির্ভীকভাবে বলিতে পারেন নাই।

এই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে চতুর্থ প্রবন্ধে তিনি সহজজ্ঞান ব্রাহ্মধর্মের মূল—ইহা অতি সুন্দররূপে প্রতিপাদন করেন। "ব্রাহ্মধর্মের ঈশ্বর তর্কলব্ধ বা পুরাণ-

বর্ণিত ঈশ্বর নহেন। ইহার ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর। বিশ্ব এই ধর্মের মন্দির, প্রকৃতি পুরোহিত, সকল অবস্থার মানব ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইয়া পূজা করিবার অধিকারী।" দেবেন্দ্রনাথও বুঝি এতখানি প্রত্যয়ের সহিত এমন কথা বলিতে পারেন নাই। এতদিন ব্রাহ্মসমাজের কোনো সাহিত্য ছিল না, কেশবচন্দ্র তাহার গোড়াপত্তন করিলেন। ব্রাহ্মধর্মে ইহাই তাঁহার মৌলিক দান। প্রতাপচন্দ্র যথার্থ ই লিখিয়াছেন: There was no antecedent to Brahmo literature...Keshub created that literature—"এবং এই কারণেই বোধহয় ব্রাহ্মসমাজের দ্রুত প্রসার ঘটিয়াছিল। ষষ্ঠ প্রবন্ধটির বক্তব্য বিষয় আরো মূল্যবান। সমসাময়িক ইতিহাসের ধারা গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া কেশবচন্দ্র তখন এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌছিয়াছেন যে, "The independent spirit of the age will not brook the prostration of the soul beneath any other authority except that of God...Freedom and progress are the watchwords of the 19th century." যুগমনের এমন সুন্দর বিশ্লেষণ সে যুগে আর কেহ দিতে পারেন নাই।—স্বাধীনতা এবং উন্নতি—উনিশ শতকের পৃথিবীর এই জাগ্রত বাণীকে সেদিন বাঙালির অন্তরে তিনি যে ভাবে ও যে ভাষায় পৌছাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। ইতিহাসে সুপণ্ডিত কেশবচন্দ্র তাঁহার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিবার জন্য মোরেল, উইলসন, কাক্সটন, গ্রেগ, থিওডোর পার্কার, এবং ডবলিউ নিউম্যান—প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন মনীষীর বহু রচনার উদ্ধৃতি দিয়াছিলেন। সেই বয়সেই তাঁহার জ্ঞানের পরিধি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

এদেশে ট্রাক্ট জাতীয় রচনার প্রথম সূত্রপাত করেন রামমোহন এবং কেশবচন্দ্র সেই ধারার সার্থক অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই বারোটি প্রবন্ধ এক হিসাবে তাঁহার মানসলোকের প্রতিচ্ছবি এবং যে চিন্তা-ভাবনার পরিচয় কেশবচন্দ্র এইখানে দিয়াছেন, তাঁহার জীবনেতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার জীবনের চিন্তা ও কর্মপ্রণালী যেন অনেকটা এই ছকেই বাঁধা। এই প্রবন্ধগুলিকে আমরা তাই কেশবচন্দ্রের মানস জীবনের Blue print বলিয়া ধরিতে পারি। শুধু তাহাই নহে।

ঈশ্বরেক দর্শন করা, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করা এবং অন্তরে তাঁহার অস্তিত্বকে অনুভব করা—এই বিষয়ে বিশ বৎসর পরে তাঁহার প্রসিদ্ধ 'God-Vision' বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, দেখিতে পাইতেছি ১৮৬০-এও তিনি সেই কথাই বলিতেছেন। প্রবন্ধাবলীর তৃতীয় প্রবন্ধটির অন্তর্নিহিত কথাই তাই। এখানে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহারই পরিণত প্রকাশ ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের গড্-ভিসন্ বক্তৃতাটি। সকল বিরোধ পরিহার পূর্বক সার্বভৌমিক এক ধর্মে পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় একদিন আসিয়া মিলিবে—এই আশা-ই কেশবচন্দ্র তাঁহার 'প্রেমের ধর্ম' প্রবন্ধে প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে প্রত্যয়ের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের সর্বশেষ উক্তিটি—"May all nations unite in a holy chorus and joyful chant of the sweet anthem—'The Fatherhood of God and the Brotherhood of man' "—আজো তাহার মূল্য হারায় নাই। বলিয়াছি, এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে কেশবচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের পরিধি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এ্যারিস্টটল হইতে আরম্ভ করিয়া উনিশ শতকের সকল সুপরিচিত পাশ্চাত্ত্য মনীষীর চিন্তাধারার সহিত তাঁহার যে গভীর পরিচয় ছিল, তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ তিনি এইসব প্রবন্ধে তাঁহাদের রচনাবলী হইতে উদ্ধৃত বাক্যাংশে রাখিয়া গিয়াছেন। এই প্রতিভা আর এই সুগভীর ঈশ্বরানুভূতি লইয়াই কেশবচন্দ্র সেদিন দেবেন্দ্রনাথের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে ইহার প্রয়োজন ছিল। কেশবচন্দ্রের এই ট্রাক্টগুলিই ব্রাহ্মসাহিত্যের প্রকৃত ভিত্তি রচনা করিয়াছিল।

কেশবচন্দ্রের কর্মোদ্যম দেখিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। একই সময়ে তিনি ব্যাঙ্কের চাকরি করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিয়াছেন, অধ্যয়ন করিয়াছেন আবার এই রকম জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাবলী রচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই ধর্মভাব দেখিয়া এবং তাঁহাকে সঙ্গী পাইয়া দেবেন্দ্রনাথও যেন এখন হইতে অদম্য উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে অগ্রসর হইলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দেই কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; মহর্ষি নিজেও তখন ইহার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন আর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

ছিলেন সহকারী সম্পাদক। এইবার আমরা কেশবচন্দ্রের প্রথম ধর্মপ্রচারের কাহিনী বলিব।

১৮৬০। স্থান কৃষ্ণনগর।

কেশবচন্দ্র তখনো বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকরি করিতেছেন। শরীর অসুস্থ হইল। বায়ুপরিবর্তনের প্রয়োজন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন কলিকাতার বাহিরে কৃষ্ণনগর একটি স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া গণ্য হইত। কেশবচন্দ্র তাই মহর্ষির পরামর্শ অনুযায়ী কৃষ্ণনগরে চলিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল, ঠাকুর পরিবারের কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। বিখ্যাত ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ এবং বিখ্যাত বক্তা লালমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষ তখন কৃষ্ণনগরে বাস করিতেন। কেশবচন্দ্র তাঁহারই বাড়ি গিয়া উঠিলেন। কলিকাতা সমাজের পরই তখন কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ। খ্রীস্টান মিশনারিদের তখন এখানে একটা বড়ো কেন্দ্র ছিল। কেশবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিলেন। সমস্ত শহর মাতিয়া উঠিল ; স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্র ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই বক্তৃতা তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করিল। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার সুফল ফলিল। পাদরিরা ইহাতে জ্বলিয়া উঠিল ; আর কোনো হিন্দু খ্রীষ্টান হইতে চাহে না। মিশনারি-দের স্বার্থে আঘাত পড়িল। পাদরি ডাইসন কেবশচন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

এই দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে কেশবচন্দ্র শেষ পর্যন্ত এমন ভাবে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাহা একটি গৌরবজনক অধ্যায়। কেশবচন্দ্র নিজে এই প্রচারের বিবরণ দেবেন্দ্রনাথের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার কাজের পদ্ধতি ছিল ইহাই। সেই বিবরণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এইখানে তাহার কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হইল : "ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য আমরা কি করিতেছি, তাহা জানিতে আপনার কৌতূহল হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ...কৃষ্ণনগরে আশার অতীত ফল পাইয়াছি। শনিবারে সন্ধ্যার পর সমাজগৃহে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম ; তাহাতে দেশের বর্তমান অবস্থা, তাহার উন্নতির পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম একমাত্র উপায়, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্য, এবম্বিধ কতিপয় বিষয় বলিয়া অবশেষে মুখে একটি ঈশ্বরের নিকট

প্রার্থনা করিলাম।...প্রীতি যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের প্রধান উপায়, এই বিশ্বাসটি মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। প্রীতিবিহীন প্রচারক কোনো কর্মেরই নয়। প্রীতি থাকিলে সহিষ্ণুতা হয়, পরের কটূক্তি, গ্লানি, উপহাস, অত্যাচার সহ্য করা যায়। প্রচারের জন্য আমাদের আরো যত্ন করিতে হইবে।" এই চিঠির তারিখ ১২ই মে, ১৮৬১। পূর্বে উল্লিখিত বারোখানি ট্রাক্টের মধ্যে দশম প্রবন্ধটি এই কৃষ্ণনগরে পাদরি ডাইসনের সহিত বিতর্ক-যুদ্ধের বিষয়বস্তু লইয়াই রচিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্মের মূল সম্পর্কে ডাইসন যেসব প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র তাহার চূড়ান্ত জবাব দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের অস্ত্রনিক্ষেপ অব্যর্থ হইয়াছিল, অথচ কোনো অপ্রীতিকর ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। প্রিয়দর্শন কেশবচন্দ্রের সমগ্র সত্তা এমনই প্রীতি-স্নিগ্ধ ছিল যে প্রতিপক্ষ পর্যন্ত তাহা অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইত। সেদিন কেশবচন্দ্রের হস্তে খ্রীষ্টান পাদরিদের পরাজয়ে নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা পর্যন্ত তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়াছিলেন।

কলিকাতায় বসিয়া দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণনগরে কেশবচন্দ্রের প্রচার-কার্যের উত্তাপ বোধ করিলেন। বুঝিলেন ব্রাহ্মধর্ম এইবার যথার্থ ই একজন প্রচারক পাইয়াছে, ইহার অগ্রগতি আর রোধ করিবে কে? কৃষ্ণনগরে কেশবচন্দ্রের 'মিশন' সম্পর্কে তখনকার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছিল: "কৃষ্ণনগরে এক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মিশনারিদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে, বৃদ্ধদের দলের মধ্যে, সকল স্থানেই তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল।...সকল স্থানেই রব উঠিল খ্রীষ্টানদের পরাজয়, ব্রাহ্মধর্মের জয় হইয়াছে।" এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথম, কৃষ্ণনগরে তিনি চারটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন; কোনো বক্তৃতায় শ্রোতার সংখ্যা ৩০, কোনটায় ১৫০ হইয়াছিল; কলেজের ছাত্ররাও বক্তৃতা শুনিতে আসিত, শিক্ষকেরাও বাদ যাইতেন না। বক্তৃতার বিষয় শুধু ধর্ম নয়, দেশের অবস্থা সম্পর্কেও কেশবচন্দ্র ধর্মসভায় আলোচনা করিতেন, দেখা যাইতেছে। ধর্মের সহিত সমাজের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, ধর্ম সমাজ ছাড়া নয়, সমাজও ধর্ম ছাড়া নয়—এই ভাব সেদিন, উনিশ শতকের সেই ষষ্ঠ দশকে, নূতন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন ছিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যদি লোকসমাগম কম হইত

তাহাতে কেশবচন্দ্র কিছুমাত্র নিরুৎসাহ বোধ করিতেন না ; কারণ "তিনি সকল সময়েই সংখ্যাপেক্ষা লোকের উৎসাহ ও ব্যগ্রতার দিকে সমধিক দৃষ্টি রাখিতেন।"

ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের সমসাময়িক কেশবচন্দ্রের আর একটি প্রচেষ্টার কথা এইবার উল্লেখ করিব। ইহা সঙ্গত সভা। কেশবচন্দ্রের জীবনের ইহা একটি অক্ষয় কীর্তি। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা যায়। কেশবচন্দ্র ছিলেন একটি প্রচণ্ড কর্মের আধার—যুগপৎ তিনি বহু কর্মের সূচনা করিতেন, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যেন এক প্রচণ্ড কর্মের আবর্ত রচিত হইত। সৎসাহসী ও সত্যাশ্রয়ী তরুণদের তিনি এই কর্মস্রোতে টানিয়া আনিতেন। ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে তিনি যখন ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা করিতেন বক্তৃতার সেই উত্তাপ সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিত। অগ্নিমন্ত্রের সাধক কেশবচন্দ্র ছিলেন একটি magnetic personality—যে একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, কিম্বা তাঁহার বক্তৃতা শুনিত, তাহার সকল সত্তা মুহূর্ত মধ্যে যেন অগ্নিস্নাত হইয়া যাইত। অন্যের হৃদয়ে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অসাধারণ। ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে উপদেশ দিবার সময়ে কেশবচন্দ্র যখন বলিতেন—তোমরা ধর্মেতে পাগল হইবে না ?—তখন শ্রোতাদের হৃদয় সত্যেই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিত। ধর্মের কথা এমন সহজ ভাষায় ও ভঙ্গিতে আর কেহ বলিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস, মনোবিজ্ঞনের ইতিবৃত্ত,—এইসব কঠিন কঠিন বিষয় কেশবচন্দ্র এমন সহজভাবে বলিতে এবং বুঝাইতে পারিতেন, তাহা দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্মিত, মুগ্ধ হইতেন। ইহার একটি সুফল দেখা দিয়াছিল। "যে কয়েকটি যুবা অল্পদিন পরেই প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম বিদ্যালয় তাঁহাদিগকে প্রথমে প্রস্তুত করে। উপদেশ দিয়াই তিনি নিরস্ত হইতেন না, ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া (যাহার বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে) ছাত্রদের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেদিন কেশবচন্দ্রের নূতন নূতন ট্রাক্ট পাইবার জন্য ছাত্ররা উদ্‌গ্রীব থাকিত। এইভাবেই সেদিন কেশবচন্দ্রের নিরলস উদ্যমের ফলে স্কুল ও কলেজের যুবকদের উপরে ব্রাহ্ম-

সমাজের প্রভাব প্রবলভাবেই আসিয়া পড়িয়াছিল। "ব্রাহ্মধর্মে যে বিজ্ঞান আছে, মনোবিজ্ঞানরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ইহা যে সংস্থাপিত এবং ব্রাহ্মধর্মের মত ও নীতিশাস্ত্র যে কুসংস্কারশূন্য, সার্বভৌমিক, অবিমিশ্র এবং বিশুদ্ধতম, তাহা কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন।" এ ছাড়া উপদেষ্টা তৈরি করিবার জন্য 'ব্রহ্ম নর্মাল স্কুল' নামে একটা স্বতন্ত্র ব্রহ্ম বিদ্যালয়ও ছিল। এই স্কুল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অবস্থিত ছিল। ব্রহ্ম বিদ্যালয় আর নর্মাল স্কুলের উদ্দেশ্য একই ছিল।

ইহার পর সঙ্গত সভার কথা। এই প্রসঙ্গে 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে: "কেশবচন্দ্র দেখিলেন যে, ব্রহ্ম বিদ্যালয় দ্বারা ব্রাহ্মজ্ঞানের অভাব ব্রাহ্মদিগের মধ্য হইতে দূর হইতেছে; কিয়ৎপরিমাণে তিনি তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু তিনি অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকিবার লোক ছিলেন না।...তিনি একটি ভ্রাতৃসভা সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন।" ভ্রাতৃসভার উদ্দেশ্য ছিল চরিত্রগঠন। দেবেন্দ্রনাথ যখন কেশবচন্দ্রের এই নূতন পরিকল্পনার কথা শুনিলেন তিনি উহা সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন। অমৃতসরে গিয়া মহর্ষি শিখদের ধর্মালোচনা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে তিনি উহা প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। শিখদের ধর্মপ্রসঙ্গের সভাকে বলা হইত সঙ্গত সভা। এই নামটি মহর্ষির মনে লাগিয়াছিল। অতঃপর "তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবিত সভার তদনুকরণে সঙ্গত সভা বলিয়া নামকরণ করিলেন। প্রথমে তিনটি সঙ্গত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি কলুটোলায়, তার সভাপতি আচার্য কেশবচন্দ্র; অপর দুইটির মধ্যে একটি শিমলা ও অপরটি কলুটোলার স্বতন্ত্র স্থানে। এই তিনটি সঙ্গত সভার একটি করিয়া মাসিক সাধারণ সভা হইবে স্থির হইল। এই মাসিক সভা প্রধান আচার্য মহাশয়ের ভবনে হইত।" সঙ্গত সভা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকের ঘটনা। সঙ্গতের দলই পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। সত্যরক্ষা ও ধর্মসাধন—ইহাই ছিল ইঁহাদের জীবনের বনিয়াদ। প্রশান্তকুমার সেন লিখিয়াছেন: "If the *Brahma Vidyalaya* was a large study circle meant to be a reflective training ground for the mind and the heart,

the *Sangat Sabha* was a closer circle for intimate spiritual fellowship, for mutual interchange of ideas and aspirations... It was the first nucleus of a true brotherhood. None can estimate the signal services it rendered to the thought and life of the generation." সত্যই সেদিন জাতির জীবন ও চিন্তায় পারস্পরিক সৌভ্রাত্রের ভাব জাগাইয়া তুলিবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই কেশবচন্দ্র এই সঙ্গত সভা স্থাপন করিয়াছিলেন,—যুগ তখন ইহাই দাবী করিতেছিল। কেশবচন্দ্রের মনীষা একটি ধর্মীয় সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার নয়। তাঁহার মন ছিল আলোকচিত্রের নেগেটিভ কাচের মতন—কালের লক্ষণ সেই মনে ধরা পড়িত এবং অপূর্ব মনীষার বলে তিনি যুগের প্রয়োজনকে উপলব্ধি করিয়া স্বীয় কর্তব্য স্থির করিতেন। ঊনবিংশ শতকের ষাট বৎসর যখন অতিক্রান্ত হইল, তখন নব জাগৃতির মধ্যাহ্নকাল—সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ-সংস্কার এবং শিক্ষা—জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যুগান্তর দেখা দিয়াছে। কিন্তু, চারিদিকে চাহিয়া কেশবচন্দ্র দেখিলেন, বাঙালির জাতীয় চরিত্রে সৌভ্রাত্রের বড়ো অভাব—যদি পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি না রহিল, তাহা হইলে এই জাগরণ বৃথা। তাঁহার সঙ্গত সভা ইতিহাসের এই প্রয়োজনই সেদিন চরিতার্থ করিল।

পুরাতন ফ্রেটারনিটি সভার দিন হইতে যে তরুণ গোষ্ঠীকে লইয়া কেশবচন্দ্র কর্মজীবনে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাদের লইয়াই তিনি এইবার যেন জাতীয় জীবন গঠন করিতে, ইহার সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও বিস্তার সাধনে দৃঢ় সংকল্প হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের স্বর্ণপাত্রে যে অগ্নি ছিল, তাহারই উত্তাপ পাইয়া এইসব তরুণদের চিত্ত প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। "কেশবচন্দ্রের উৎসাহ প্রতিদিন নূতন হইতে নূতনতর হইতে লাগিল, তাঁহার বলিবার বিষয়ও যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সঙ্গত নিত্য নূতন জীবন প্রদর্শন করিতে লাগিল। এই সভায় যুবকগণকে কেশবচন্দ্র সেন অপূর্ব মোহমন্ত্রে মুগ্ধ করিতেন, তাঁহারই আকর্ষণে সকলে আকৃষ্ট হইয়া একত্রিত হইতেন। এই সভায় কেবল যে ধর্মবিষয়ে প্রসঙ্গ হইত, তাহা নহে, নানা প্রকার কথোপকথন হইত—বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনা এবং কখন কখন রাজনীতি সম্বন্ধীয়

কথাবার্তা মুক্তভাবে হইত।" উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার নব জাগরণের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের এই সঙ্গত সভার প্রভাব সুদূর প্রসারী হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তীকালে প্রচারকমণ্ডলী উন্নতিশীল ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে এই দেশে যে নবযুগের সূত্রপাত করিয়া-ছিলেন, কেশবচন্দ্রের সঙ্গত সভা ছিল তাহার বীজভূমি। ফ্রেটারনিটি সভা, ব্রহ্ম বিদ্যালয়, সঙ্গত সভা—এইগুলি প্রতিষ্ঠানমাত্র ছিল না—কেশবচন্দ্রের সত্তারই অংশ বিশেষ ছিল। জীবনের পথে তিনি কোনো দিন একা চলিতে চাহেন নাই, পাঁচজনকে লইয়া দলবদ্ধভাবেই চলিতে চাহিয়াছেন এবং জীবনে পরিণতির পথে ধাপে ধাপে তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই তিনি জাতির সামগ্রিক উন্নতি ও বিস্তারের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের প্রতিভার ইহা একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য।

॥ সাত ॥

চারিদিকে নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গেল।

বলিয়াছি, কেশবচন্দ্র উদ্যমশীল ক্ষমতাবান পুরুষ। তরুণদলের তিনি নেতা। তাঁহার জীবনেতিহাসে দেখিতে পাই যে এই সময়ে (১৮৬০-৬২) তিনি একটি প্রকাণ্ড কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্যের পরিধি ক্রমশঃই প্রসার লাভ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তাহা বাংলা তথা ভারতের বৃহত্তর সমাজজীবনকে এইবার স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল। "দুর্ভিক্ষ, মহামারী বিষয়ে সাহায্য সংগ্রহ, মিরার পত্রিকা প্রকাশ, ধর্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য কলিকাতা কলেজ স্থাপন, পুস্তক ও পত্রিকা প্রণয়ন, ধর্ম প্রচার, ইংলণ্ডের ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মবাদিনীদিগের সহিত পত্রালাপ, নানা স্থানে বক্তৃতা দান—এই সমস্ত নানা কার্যে কেশবচন্দ্র অসাধারণ উৎসাহের সহিত আপনার প্রতিভা ও কর্মশক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন।" এইবার আমরা তাঁহার সেই বহুমুখী কর্মধারার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে। এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। কেশবচন্দ্রের কর্মজীবন তাঁহার ধর্মজীবন হইতে পৃথক নয়—তাঁহার জীবনে কর্মের সহিত ধর্মসাধন যেন সমান্তরাল রেখায় চলিয়াছে। আরো একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলিবার আছে। বাংলার নব-যুগস্রষ্টাদের মধ্যে একমাত্র কেশবচন্দ্রের জীবনেই আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার ধর্মবোধের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও Religion দুইয়েরই সমাবেশ হইয়াছিল। ঈশ্বরের দিকে তিনি মুখ ফিরাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কখনো মানুষের দিকে পিছন ফিরিয়া ছিলেন না ; পরের সুখে দুঃখে, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষায় তিনি সমান সচেতন ছিলেন ; তাঁহার ঈশ্বর-প্রীতি মানব-প্রীতির মধ্যেই সার্থক হইয়াছিল। তাহা নহিলে কেশবচন্দ্র কখনো বলিতে পারিতেন না—"The first great duty which the British nation owes to India is to promote education far and wide. It is desirable that you should open up works of irrigation and that you should try in all possible ways, *to*

promote the material prosperity of the country"। ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ চিন্তা এবং তাহার জন্য পন্থা নির্দেশ করা—ইহাই ছিল কেশবচন্দ্রের রিলিজিয়ন আর ভারতবাসীর আত্মার উন্নতিসাধন, নিখিল মানব-আত্মার উন্নতিসাধন—ইহাই ছিল কেশবচন্দ্রের ধর্ম। জাতির প্রতি, মানুষের প্রতি কর্তব্যের প্রেরণা তাঁহাকে সর্বদাই কর্মচঞ্চল করিয়া রাখিত, তাই তো তিনি যুগপৎ নানাবিধ কাজের সূচনা করিয়াছিলেন। কেশব-প্রতিভার ইহাই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁহার বহুমুখী কর্মোদ্যমের ইহাই ছিল স্বাতন্ত্র্য। এখানে কেশবচন্দ্র সত্যই একেশ্বর সূর্য।

সংবাদ আসিল উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। ইংরেজ অধিকারে আসিবার পর, পলাশির যুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া ভারতবর্ষ একাধিক দুর্ভিক্ষ দ্বারা পর্যুদস্ত হইয়াছে এবং ইহার ফলে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামো ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসে দেখা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (ভারতবর্ষ যখন কোম্পানীর শাসনাধিকারে ছিল) বিভিন্ন দুর্ভিক্ষ-জনিত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল চৌদ্দ লক্ষ। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বিদ্যাসাগরের সময়ে মেদিনীপুরে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহাতে সেই হৃদয়বান পুরুষসিংহ নিজের অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত নর-নারীর সেবা করিয়াছিলেন। সে-দুর্ভিক্ষ নিবারণে ব্রাহ্মসমাজের কোনো প্রচেষ্টার বিবরণ আমরা পাই না, অথবা ব্রাহ্মসমাজপতি দেবেন্দ্রনাথেরও কোনো উদ্যমের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মসমাজ এতকাল ব্যক্তিগত উপাসনা লইয়া ছিল, কেশবচন্দ্র এইবার সমাজের প্রকৃতি, আদর্শ, কর্তব্য, ভাব ও চিন্তার ধারা সব কিছু পরিবর্তন করিতে অগ্রসর হইলেন। কেশবচন্দ্র যেই দুর্ভিক্ষের সংবাদ শুনিলেন অমনি তিনি বিচলিত হইলেন। খ্রীষ্টান মিশনারিরা গির্জাতে ও অন্যত্র বক্তৃতা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছিলেন। কেশবচন্দ্রও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। দুঃস্থদের ত্রাণকার্যে যোগ দেওয়া ব্রাহ্মসমাজেরও নৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য—ইহা তিনি দেবেন্দ্রনাথকে বুঝাইলেন। অতঃপর ব্রাহ্ম-সমাজের মঞ্চ হইতে দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানের কথা ঘোষণা করা হইল। ধর্মকে কেশবচন্দ্র সমাজমুখী করিয়া তুলিলেন। দুর্ভিক্ষের বিষয়টি দেবেন্দ্রনাথের গোচরে আনিয়া কেশবচন্দ্র যখন তাঁহাকে বলিলেন যে, সমাজের পক্ষ হইতে

কিছু করা উচিত, তখন তিনি কেশবের মধ্যে একজন মানব-দরদীকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তারপর "এই দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান করিবার জন্য ১২ই চৈত্র (২৫শে মার্চ, ১৮৬১) যে অধিবেশন হয়" তাহা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। কেশবচন্দ্রের সংগঠনী প্রতিভা সকলকে বিস্মিত করিল—ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে দেবেন্দ্রনাথ একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতার মাধ্যমে দুর্ভিক্ষপীড়িত নর-নারীর জন্য সাহায্যের আবেদন জানাইলেন; সঙ্গত সভা অগ্রসর হইয়া আসিল, সকলেই দ্বারে দ্বারে গিয়া চাঁদা ভিক্ষা করিতে লাগিল। সর্বভারতীয় সমাজ সেবার আদর্শ এই প্রথম স্থাপিত হইল—বাংলার মাটিতে বাঙালির নিজস্ব সংকটত্রাণ সমিতির জন্ম হইল। বাংলার যুবকদের সম্মুখে সেদিন এইভাবেই কেশবচন্দ্র সমাজসেবার মহৎ আদর্শকে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে এই আদর্শকে অনুসরণ করিয়াই শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসেবাকে বাংলার তরুণদের জীবনে একটা স্থায়ী ধর্মে পরিণত করিয়াছিলেন। "এই দুর্ভিক্ষে প্রায় তিন সহস্র মুদ্রা দুর্ভিক্ষনিপীড়িত স্থানে প্রেরিত হয়। বিশেষ অধিবেশনের দিনের উপাসনা ও বক্তৃতা বেদী সম্মুখে তণ্ডুল, বস্ত্র ও অলঙ্কার স্তূপীকৃত হইয়াছিল। অনেকে আপনার গাত্রের মূল্যবান বস্ত্র, অঙ্গুরীয় এবং নারীগণ অলঙ্কার ও তৈজসাদি দান করেন।"

উত্তর ভারতের দুর্ভিক্ষের কয়েক মাস পরে ত্রিবেণী, হালিসহর, বারাসত প্রভৃতি অঞ্চলে জ্বর রোগের এক ভীষণ মহামারী দেখা দিল। এখানেও কেশবচন্দ্র সঙ্কটত্রাণে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বক্তৃতায় জনসাধারণ বিচলিত হয় ও মহামারী-পীড়িতদের প্রতি সকলের হৃদয় সমবেদনায় পরিপূর্ণ হয়। কেশবচন্দ্র অর্থ সংগ্রহ করিয়া মহামারী-কবলিত গ্রামসমূহে ঔষধ, অর্থ ও চিকিৎসক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ঔষধ পাঠাইবার কাজ তিনি নিজের হাতে করিতেন। সেদিন তিনি যখন বলিয়াছিলেন—"I rise to advocate a noble cause, the cause of humanity...I rise to discharge the sacred duty of exhorting you to make a combined effort to alleviate the sufferings of thousands of our dying countrymen." কেশবচন্দ্র যে কত বড়ো একজন কর্মীপুরুষ—

'man of action'—তাহা বাঙালি বুঝিতে পারিল। তখন উনিশ শতকের মানবতাবাদ রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ভিতর দিয়া কেশবচন্দ্রে আসিয়া শুধু পূর্ণতা লাভ করে নাই, পরবর্তী বংশধরদের জন্য উহা একটি দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল। কেশবচন্দ্রই নবীন বাঙালিকে জনসেবার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন—ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। সংঘবদ্ধভাবে আর্তের সেবা এই দেশে এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল। জনসেবাকে তিনি সত্যই an article of faith হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাকে তিনি প্রতিষ্ঠানগত বিষয়মাত্র মনে করেন নাই।

কর্মের স্রোত শতধারায় বহিয়া চলিল।

ধর্মকে আশ্রয় করিয়া কেশবচন্দ্র সংস্কার ও সংগঠনের কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মজীবনের আর একটি গৌরবময় অধ্যায় 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকা স্থাপন। স্বাধীন সংবাদপত্র দেশের জনমানস গঠনে কতদূর সহায়তা করিতে পারে, রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া হরিশ্চন্দ্র পর্যন্ত একাধিক স্বাধীনচেতা বাঙালি তাহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। কেশব-চন্দ্রের সম্মুখে ছিল পূর্ববর্তী ধুরন্ধরদের দৃষ্টান্ত। এ-দেশে রামমোহনই প্রথম সংবাদপত্রের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র সংবাদপত্র ও বক্তৃতা-মঞ্চ—উভয়েরই পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাংলা তথা ভারতবর্ষে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছিলেন। রামমোহন যেমন সংবাদপত্রের স্বষ্টি করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র তেমনি যুগপৎ press ও platform দুই-ই স্বষ্টি করিয়াছিলেন। সংবাদপত্র যে লোকশিক্ষার একটি বড়ো মাধ্যম—ইহা কেশবচন্দ্রের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কেশবচন্দ্র ব্যাঙ্কের চাকরিতে ইস্তফা দিয়া তাঁহার সমস্ত প্রতিভা ও পরিশ্রম ব্রাহ্মসমাজ তথা সমগ্র দেশের উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিলেন। আগষ্ট মাসেই তিনি *Indian Mirror* নাম দিয়া একখানি ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিলেন। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই বৎসরটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। সাহিত্য-জগতে এই বৎসরে মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের আবির্ভাব যেমন একটি ঐতিহাসিক

ঘটনা কেশবচন্দ্রের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকার আবির্ভাবও তেমনি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাংলার নবজাগরণের বহু-ভঙ্গিম ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ও 'সুলভ সমাচার' (ইহা নয় বৎসর পরে প্রকাশিত হইয়াছিল)—এই দুইখানি পত্রিকা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করিয়াছে। 'সুলভ সমাচারে'র কথা পরে বলিব, এখন 'মিরারে'র কথা বলি। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' সত্যই কেশবচন্দ্রের একটি অক্ষয় কীর্তি। উনিশ শতকীয় নবজাগরণ যখন বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন যুগ-নায়কের মনীষার ভিতর দিয়া তাহার সকল বর্ণচ্ছটা লইয়া ইতিহাসের দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই 'মিরারে'র আবির্ভাব ঘটিল।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন: "Being alive to the importance of possessing a newspaper organ in English, with a view to influence the Hindu community both on educational, religious and other matters, he started the *Indian Mirror* in August 1861, in conjuction with some friends as a fortnightly journal." নৈশবিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া যে দলটিকে সঙ্গে লইয়া কেশবচন্দ্র তাঁহার কর্মজীবনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, পরিণত জীবনে তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার বিভিন্ন কর্মপ্রয়াসেরও সঙ্গী ছিলেন; ইঁহারা বন্ধুস্থানীয় হইলেও, সকলেই কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বকে মানিয়া লইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবনেতিহাস যাঁহারা গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন নেতৃত্ব করিবার বিধিদত্ত শক্তি লইয়াই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল; সত্যই—"he was a born leader of men", কিন্তু কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বের মধ্যে দম্ভ ছিল না, ডিক্টেটরী ভাব ছিল না। যদি তাহা থাকিত তাহা হইলে কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার নেতৃত্ব এমন সফল হইত না।

কেশবচন্দ্র কাগজ বাহির করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী' ছিল নিতান্তই ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র, তাই কেশবচন্দ্র একখানি সর্বভারতীয় কাগজের অভাব বোধ করিয়া এই নূতন ইংরেজি কাগজ বাহির করিলেন। পত্রিকার

সম্পাদনা ব্যাপারে তাঁহাকে সহায়তা করিলেন দুইজন—খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ এবং পামার সাহেব। কাপ্তেন পামার পূর্বে সৈন্যদলে ছিলেন, কিন্তু তিনি সংবাদপত্রের একজন সুদক্ষ লেখকও ছিলেন। সম্পাদক হইলেন মনোমোহন ঘোষ (পরে নরেন্দ্রনাথ সেন) আর ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর হইলেন কেশবচন্দ্র। সর্বভারতীয় ঐক্যের চেতনা সকলের মনে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্যই পত্রিকার নামকরণ করা হইল—'ইণ্ডিয়ান মিরার'। সেই সময়ে ভারতবাসী কর্তৃক স্বাধীনভাবে পরিচালিত পত্রিকার মধ্যে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছিল শীর্ষস্থানীয়। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে, বিশেষ করিয়া নীল আন্দোলনের ব্যাপারে, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নির্ভীক সাংবাদিকতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল, তাহার তুলনা নাই। পরবর্তীকালে আরো দুইজন 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' যোগদান করিয়াছিলেন —কৃষ্ণবিহারী সেন ও নরেন্দ্রনাথ সেন। ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় 'মিরার' সেদিন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সত্যই যুগান্তর আনিয়া দিয়াছিল। এইখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে, কর্মজীবনের বিভিন্ন স্তরে কেশবচন্দ্র একাধিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন; সেগুলির কথা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাসে জনমতগঠনে কেশবচন্দ্রের 'ইণ্ডিয়ান মিরারের' গৌরব স্বতন্ত্র। প্রশান্তকুমার সেন যথার্থই লিখেছেন: "The old files of the *Indian Mirror* show that whatsoever was goodliest and best in India's thoughts, aspirations and efforts was reflected in its columns, and for a considerable number of years it continued to shape and prepare public opinion for the national reconstruction in progress." এই পত্রিকায় ধর্মনীতি, রাজনীতি এবং সমাজনীতি সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। বলিতে কি, 'মিরার' তাঁহার হস্তে যেন একখানি শাণিত অস্ত্র-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; এই কাগজ হাতে থাকিবার দরুণ কেশব-চন্দ্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। এইখানে একটি প্রশ্ন আছে, কেশবচন্দ্র সেই সময়ে কাগজ বাহির করিলেন কেন? ব্রাহ্মধর্ম প্রচার এই কাগজের

উদ্দেশ্য ছিল না—প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাবিস্তার। কথাটি একটু বিস্তারিত-ভাবেই আলোচনা করিতে হয়।

নৈশবিদ্যালয়ের দিন হইতেই কেশবচন্দ্র এ-দেশের শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তখন শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের বিরাট প্রতিভা নিয়োজিত হইয়াছে। এই শিক্ষা-বিস্তারের কথা রামমোহন চিন্তা করিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের তো তুলনা ছিল না, কেশবচন্দ্রও এই বিষয়ে যে চিন্তা করিতেন তাহার প্রথম আভাস আমরা দেখিতে পাই কলুটোলা সান্ধ্য বিদ্যালয় স্থাপনে। তারপর ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া অবধি, দেখিতে পাই যে কেশবচন্দ্র এই বিষয়টি একাগ্রমনে চিন্তা করিতেছেন। সেই একই সময়ে যখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিস্তার ও উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তখনই তিনি ইংলণ্ডের ফ্রান্সিস উইলিয়ম নিউম্যান, মিস ফ্রান্সেস পাওয়ার কব, মিস এস.ডি. কলেট, ম্যাক্সমুলার প্রভৃতি স্বাধীন চিন্তাশীল মনীষিদের সহিত পত্রযোগে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে তিনি যুগপৎ ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে আন্দোলন করিতে চাহিলেন। অন্যান্য বিষয়ের সহিত স্বতন্ত্র স্কুল কলেজ স্থাপন এবং তাহাতে নীতিশিক্ষা-দান বিষয়ে নিউম্যানের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন। হিন্দুকলেজের নীতি-বর্জিত শিক্ষার স্রোত ফিরাইতে সেদিন কেশবচন্দ্রের ন্যায় আর কেহ চিন্তা করেন নাই। হিন্দু-কলেজকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজ সেদিন বাংলাদেশে যে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, জাতীয়চরিত্র গঠনে তাহার ফল যে ভালো হয় নাই, ইহা বোধ করি কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিতেই সর্বপ্রথম ধরা পড়িয়াছিল। পরবর্তী-কালে (১৮৭২ খ্রীঃ) তিনি শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে লর্ড নর্থব্রুককে যে নয়খানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা ভারতে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন লর্ড আমহার্ষ্টকে ইংরেজি শিক্ষাপ্রবর্তন সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক পত্রখানি লিখিয়া-ছিলেন তাহার গুরুত্ব এবং তাহার প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পরে লর্ড নর্থব্রুককে কেশবচন্দ্রের এই পত্রগুলির গুরুত্ব যে সমান, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

যে কথা বলিতেছিলাম। কেশবচন্দ্র তাঁহার পূর্বোল্লিখিত ট্রাক্টগুলি নিউম্যান ও মিস কব প্রভৃতির নিকট পাঠাইয়াছিলেন এবং সেগুলি পাঠ করিয়া তাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করেন। "ইংলণ্ডে ব্রাহ্মধর্মের কিরূপ অবস্থা, এবং কি প্রকারে উহার প্রচার ও বিস্তার হইতে পারে", কেশবচন্দ্র তাহাও জানিতে চাহিয়া নিউম্যানকে পত্র লেখেন। এইসব মনীষিদের সহিত পত্র-যোগে আলাপ-আলোচনা করিয়া কেশবচন্দ্র বুঝিলেন যে ভারতবর্ষে ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজন। বিলাত হইতে মিস কব্ জানাইলেন—"যদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিকটে শিক্ষার উন্নতিকল্পে আবেদন প্রেরিত হয়, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং উহা উপস্থিত করিতে পারেন।" অতঃপর কেশবচন্দ্র কি করিলেন? উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "কেশবচন্দ্র দেশহিতকর কার্যে কোনদিন নিরস্ত থাকিবার লোক নহেন। তিনি বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিসাধন জন্য এক সভা আহ্বান করেন।" ইহা সাধারণ সভা ছিল; সভাপতিত্ব করেন 'ব্যবস্থা-দর্পণ'-প্রণেতা শ্যামাচরণ শর্মা। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তারিখে ব্রাহ্মসমাজের দোতলার ঘরে এই সভা বসিয়াছিল। সেই সভায় কেশবচন্দ্র জাতীয় শিক্ষার একটি সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিলেন এবং ব্রাহ্ম-সমাজকেই এই বিষয়ে অগ্রসর হইতে বলিলেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার অব্যবস্থা সম্বন্ধেও বক্তৃতায় আবেগভরে উল্লেখ করেন।" তখন তাঁহার বয়স মাত্র তেইশ বৎসর। দেখা যায়, সেই পরিকল্পনায় অতি দরিদ্র সাধারণ লোক হইতে আরম্ভ করিয়া পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের শিক্ষার বন্দোবস্ত তিনি করিতে চাহিয়াছিলেন।

এই পরিকল্পনাকে সফল করিয়া তুলিবার জন্যই তিনি সংবাদপত্রকে প্রচারের অন্যতম মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্র যেদিন ঘোষণা করিলেন—"ব্রাহ্মধর্মের জ্যোতি থাকিতেও আমরা নিরুৎসাহ ও নিস্তেজ থাকিব, এমন কখনই হইতে পারে না। সকলে উত্থান কর, সকলে আপন আপন সাহায্য দান করিয়া দেশস্থ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিদ্যার আলোক প্রচার করিতে তৎপর হও"—সেদিন রামমোহনের স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজ উহার ঐতিহাসিক সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। 'ইণ্ডিয়ান

মিরার' প্রথমে পাক্ষিক পত্র ছিল, পরে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড যাইবার পূর্বে উহা সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা দৈনিকে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ভারতীয় পরিচালিত ও সম্পাদিত ইহাই প্রথম দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা। পাক্ষিক 'মিরার' ইহার আরম্ভের সময় হইতেই বিশেষ খ্যাতি ও কৃতিত্বের সহিত চলিয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত 'মিরার' নরেন্দ্রনাথ সেনের সম্পাদনায় আধুনিক হিন্দুসমাজের মুখপত্র হয় ; তখন কেশবচন্দ্রের মতামত ইহাতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইত না। তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নির্ভীকতায় হরিশচন্দ্রের পরই কেশবচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকার ভিত্তি একটু দৃঢ় হইবার পর কেশবচন্দ্র এইবার আর একটি কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইলেন। ইহা কলিকাতা কলেজ। পূর্বেই বলিয়াছি, কাগজ বাহির করিবার পর তিনি ব্রাহ্মসমাজের এক সভায় শিক্ষা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। কেশবচন্দ্র বাগ্মী ছিলেন, কিন্তু তিনি বাক্‌সর্বস্ব মানুষ ছিলেন না ; যাহা বলিতেন তাহা তিনি কার্যে পরিণত না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না। তিনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা কলেজ' নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। রামমোহন করিয়াছিলেন Anglo Hindu School (১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ) ; দেবেন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন 'হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়' (১৮৫৫ খ্রীঃ) আর কেশবচন্দ্র স্থাপন করিলেন Calcutta College—তিনজনেরই উদ্দেশ্য প্রায় একই ছিল। দেবেন্দ্রনাথের প্রয়াসের মূলে অবশ্য পরোক্ষভাবে প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন পাদ্রী ডফ্‌।* শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের স্বাধীন নিজস্ব প্রয়াস ইহার দুই বৎসর পরের (১৮৬৪ খ্রীঃ) ঘটনা। ক্যালকাটা কলেজ পরিচালনার ভার কেশবচন্দ্র স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। কেশবচন্দ্রের বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অন্যতম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি এইখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ; কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেনও এই বিদ্যালয়ে পড়িতেন।

* এই লেখকের 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক টাকা দিয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, কিন্তু কেশবচন্দ্র নিজের দায়িত্বেই বহু টাকা ধার করিয়া স্কুলটি চালাইয়াছিলেন। স্কুলটি অবৈতনিক ছিল এবং এইখানে "যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্মশিক্ষা দান করা হইত না, ইহাতে নীতিশিক্ষার প্রাধান্য ছিল। কেশবচন্দ্রের প্রথম হইতে এই মত ছিল যে, যুবকদিগকে সর্বপ্রথমে নীতিশিক্ষা দান করা উচিত।...কলেজ প্রথমে নিমতলার একটি প্রাচীন গৃহে স্থাপিত হয়, সেখান হইতে পরিশেষে বাঁশতলা ষ্ট্রীটে যায়। এখানে প্রসিদ্ধ সুবিদ্বান্ বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী ইহার প্রধান শিক্ষক হন।" কেশবচন্দ্রের এই ক্যালকাটা কলেজ ছয় বৎসর চলিয়াছিল। সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাবেই ইহা উঠিয়া যায়। স্বাধীনভাবে স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে বাংলা দেশে সেদিন একমাত্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াসই স্থায়ী হইয়াছে। তবে কেশবচন্দ্রের দৃষ্টান্ত ব্যর্থ হয় নাই। যে নীতিশিক্ষাকে তিনি ছাত্রজীবনের বনিয়াদ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, পরবর্তীকালে অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রচেষ্টার মধ্যে তাহা সুন্দরভাবে সার্থক হইয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ করা দরকার যে, কেশবচন্দ্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে ধর্মমত শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী কোনো কালেই ছিলেন না—তিনি গুরুত্ব দিতেন নীতিশিক্ষার উপর এবং ধার্মিক সচ্চরিত্র শিক্ষকদিগের সদ্দৃষ্টান্তের আবশ্যকতা তিনি চিরদিন স্বীকার করিতেন। প্রতাপচন্দ্র কেশবচন্দ্রের এই প্রয়াসকে 'A principal work of the mission of his life' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাঁহারা কেশবচন্দ্রের লোকশিক্ষা ও সমাজসেবার আদর্শ গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র এমন শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন যাহাতে ভারতবাসী ভারতবাসীই থাকে, বিদেশী ভাবাপন্ন না হয়। শিক্ষার্থীর দেহ, মন ও আত্মার সামঞ্জস্যীভূত কল্যাণের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি তাঁহার শিক্ষার আদর্শ রচনা করিয়াছিলেন। আজ প্রায় শতবর্ষ পরে দেখিতেছি, শিক্ষার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের এই আদর্শ তাহার মূল্য হারায় নাই। আজো এই আদর্শের প্রয়োজন আছে।

॥ আট ॥

ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কেশবচন্দ্র ইহার যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র মূর্তিমান উৎসাহ, প্রচণ্ড কর্মের আধার তিনি। সম্পাদক হইয়া তিনি কি কি কাজ করিয়াছিলেন, এইবার সেই বিষয়ে কিছু বলিব। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে সমাজের একটি সাধারণ সভা হইল। সেই সভার বিবরণে আমরা দেখিতে পাই যে, সভার প্রারম্ভে সম্পাদক কেশবচন্দ্র উঠিয়া বলিলেন : "গতবর্ষের কার্য-বিবরণ আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, গত বর্ষে নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। পূর্বাপেক্ষা সমাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে ; কেবল ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ইহার উদ্দেশ্য নহে, বিবিধ উপায়ে দেশের হিতসাধন করতঃ, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য করাও ইহার লক্ষণ। কিসে দেশের কুরীতি নির্মূল হয়, কিসে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হয়, কিসে আমাদের দেশ জ্ঞান ও ধর্মে ভূষিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে, এই সকল প্রশস্ত ভাব দ্বারা এখন ব্রাহ্ম-সমাজ পরিচালিত হইতেছে।···গত বর্ষে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের অনেক দূর উন্নতি হইয়াছে।" অতঃপর তিনি আগামী বর্ষের জন্য সভায় কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। প্রস্তাবগুলি এইরূপ : (১) ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপনের জন্য যেমন সঙ্গত সভা স্থাপিত হইয়াছে, তেমনি তাহাদের মধ্যে প্রীতি ও ঐক্যভাব জাগ্রত করিবার জন্য একটি প্রতিনিধি সভা স্থাপন ; (২) ব্রাহ্মসমাজের অধীনে একটি বিদ্যালয় স্থাপন ; (৩) ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য প্রণালী রচনা ও সুশিক্ষিত উপাচার্য, শিক্ষক এবং প্রচারক নিয়োগ করা।

কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ইহাই ছিল যে, তিনি যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, তখনই উহা সমগ্র দৃষ্টি দিয়া দেখিতেন ; মহর্ষির ন্যায় তাঁহারও জীবনের ব্রত ছিল ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিসাধন। তাঁহার কার্যপদ্ধতি ছিল নিখুঁত। উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে তৃতীয় প্রস্তাবটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ; তিনি সুশিক্ষিত প্রচারক নিয়োগের কথা তুলিলেন। ধর্মপ্রচারের

সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই কেশবচন্দ্র শিক্ষাবিস্তারের উপরও বিশেষভাবে জোর দিতেছেন। কলিকাতা কলেজ এই চিন্তারই পরিণত ফল। দেবেন্দ্রনাথের মনে এখন এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, কেশবচন্দ্র কাজের লোক; এই তরুণের হৃদ্গত ধর্মবিশ্বাস যেমন গভীর, কর্মস্পৃহাও তেমনি প্রবল। বুঝিলেন, কেশবচন্দ্র উদ্যমশীল ক্ষমতাবান পুরুষ। ইঁহারই সংস্পর্শে প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজ আজ সত্যই নবীন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। তাই দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আরো অধিক ক্ষমতা দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহা কেবলমাত্র তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, তিনি এই বিষয়ে স্পষ্ট প্রত্যাদেশই পাইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন: "এই সময়ে মহর্ষি জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত গুসকরা নামক গ্রামের একটা আম্র-কাননে বাস করিতেছিলেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, 'আমি কোন নির্জন প্রান্তরে একটি সাধনাশ্রম নির্মাণ করিবার জন্য স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একদা গুসকরার একটা আম্র-কাননে বাস করিতেছিলাম, সেইখানে আমার মনে হইল যে, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে বরিত হইবার উপযুক্ত। আমি ইহা প্রত্যাদেশের ন্যায় অনুভব করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ তাহা কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলাম'।" মহর্ষির অন্তর বলিয়া দিয়াছিল যে, এ-সময়ে ব্রাহ্মধর্মকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে কেশবচন্দ্র ভিন্ন দ্বিতীয় যোগ্য ব্যক্তি আর কেহ নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ব্রাহ্মসমাজে 'প্রত্যাদেশ'-এর সূত্রপাত আমরা মহর্ষি হইতেই পাইতেছি। মহর্ষির প্রত্যাদেশ উপহসিত হয় নাই? হইয়াছিল কেশবচন্দ্রের; তিনি যখন প্রত্যাদেশের কথা বলিতেন, তখন শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আরো অনেকেই উহা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই, তাঁহারা মনে করিতেন ইহার পিছনে বুঝি কেশবচন্দ্রের অধিনায়কত্ব আরোপ করিবার ইচ্ছা আছে। যাই হোক, এই ২২শে ডিসেম্বরের সভাতেই "কেশবচন্দ্রকে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হউক," এই মর্মে দেবেন্দ্রনাথের একখানি পত্র পঠিত হয় এবং তাঁহার এই প্রস্তাবে অধিকাংশেরই মত হইল।

তারপর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে

বরিত হইলেন। এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে বেদী হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঘোষণা করিলেন: "এক্ষণে আমি আহ্লাদপূর্বক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। ঈশ্বর প্রসাদাৎ ব্রাহ্মধর্মে ইঁহার যে প্রকার অনুরাগ, যে প্রকার নিষ্ঠা, তাহাতে সমাজের অবশ্যই উন্নতি হইবে।" তারপর তিনি কেশবচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কয়েকটি উপদেশ প্রদান করেন এবং অবশেষে তাঁহার হাতে 'ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ' অর্পণ করিয়া তিনি বলিলেন—"এই ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার একটি মাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবেক না। যে প্রকারে পূর্বে অগ্নিহোত্রীরা অগ্নিকে রক্ষা করিতেন, তুমি এই ব্রাহ্মধর্মকে তদ্রূপ রক্ষা করিবে।"

মহর্ষির এই নির্দেশ কেশবচন্দ্র অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রকে দেবেন্দ্রনাথ যেন স্বহস্তে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি জানিতেন, এই মহৎ ভার বহন করিবার যোগ্যতা কেশবচন্দ্রের আছে এবং তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, অপরাজিত চিত্তে এই গুরুভার বহন করিবার জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকারে এই যুবক পশ্চাৎপদ হইবে না। এই প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন: "ব্রহ্মে অত্যন্ত প্রীতি দেখিয়াই মহর্ষি কেশববাবুকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি দিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও তাঁহাতে তাঁহার অনুকূলশক্তি দেখিয়াই মহর্ষি কেশববাবুকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে অভিষিক্ত করিয়া ছিলেন।" কিন্তু এই কার্য তিনি বিনা বাধায় করিতে পারেন নাই। প্রবীণেরা ইহাতে প্রবল বাধা দিয়াছিলেন। অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল, বৃদ্ধ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকে আচার্যপদ প্রদান করিবার প্রস্তাব পর্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন রূপ ; "তিনি যাহা যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহা সম্পন্ন" করিতে তিনি কোনো বাধা-আপত্তিই গ্রাহ্য করিলেন না। তখনো ব্রাহ্মসমাজে উপবীতধারী ব্রাহ্মণের আধিপত্য ছিল, পাছে বৈদ্য কেশবচন্দ্রের আচার্যত্ব ব্রাহ্মণরা স্বীকার না করেন, সেই কারণে সম্ভবতঃ মহর্ষি তাঁহাকে 'ব্রহ্মানন্দ' বলিতেন। কেশবচন্দ্র কিন্তু চিরদিন নিজেকে 'কেশবচন্দ্র সেন' বলিয়াই গৌরব বোধ করিয়াছেন।

এই অভিষেক কার্য মহর্ষির জোড়াসাঁকোর ভবনেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই উপলক্ষে তিনি যথেষ্ট জাঁকজমকের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। তিনি লিখিয়াছেন: "Great preparations were set on foot. The ceremonies were to be of unique and unprecedented grandeur. The great courtyard was festooned with garlands and lamps, and a classical pavilion with shrubs and flowers was constructed in the middle. A long service was held, at the end of which Keshub was presented with a sort of diploma, framed in gold, in which his main duties as Minister were set forth in beautiful language, the document being signed by Devendra Nath Tagore himself. He was also presented with a brightly emblazoned, velvet-lined casket containing an ivory seal, and the *Brahmo Dharma Grantha*, those being, as it were, the insignia of his office. The title of *Brahmananda* was also conferred upon him...The festivities and banquets that accompanied the occasion were on the princely style that distinguished all procedings of the Tagores of Calcutta." প্রতাপচন্দ্রের এই বিবরণ হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, দেবেন্দ্রনাথ তখন কী চক্ষে কেশবচন্দ্রকে দেখিতেন। কেশবচন্দ্র আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই দেবেন্দ্রনাথ প্রধান আচার্য বলিয়া অভিহিত হইতে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ করিতে হয়। পূর্বে যে সভার উল্লেখ করিয়াছি, কেশবচন্দ্র সেই মাঘোৎসবে তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হইয়া অবধি কেশবচন্দ্র পুরুষদের শিক্ষার কথা যেমন চিন্তা করিয়াছেন, তেমনি সেই সঙ্গে তিনি অন্তঃপুরের মেয়েদের শিক্ষার বিষয়েও যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, কেশবচন্দ্র আমাদের দেশের

সকল সমস্যাকে সমগ্রভাবেই গ্রহণ করিয়া তাহার মীমাংসায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সমাজ যে একটি অখণ্ড জীবনের বিকাশমাত্র তাহা কেশবচন্দ্র বহুপূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মানবীয় সাধনার ইতিহাসে এই যে যুগ-পরিবর্তন, ইহার গোড়ার কথা সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি। সেই জন্যই কেশবচন্দ্র মেয়েদের অবরোধ হইতে মুক্ত করিয়া সমাজের মুক্ত প্রাঙ্গনে তাহাদিগকে আনিতে চাহিলেন। নিজের স্ত্রীকে দিয়া তিনি ইহার প্রথম পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু কাজটি তাঁহার পক্ষে খুব সহজ ছিল না। তিনি তখনো একান্নপরিবারভুক্ত ছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের চক্ষে জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়ির আচার-আচরণ তখনো বিজাতীয় বলিয়াই মনে হইত। তাহার উপর কলুটোলার সেনেরা ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। সেই বাড়ির কুলবধূ ঠাকুরবাড়ি যাইবে, ইহাতে কেশবচন্দ্রের অভিভাবকদের ঘোরতর অমত এবং আপত্তি থাকা স্বাভাবিক। স্ত্রী জগন্মোহিনী তখন বালীতে পিত্রালয়ে। কেশবচন্দ্রের ধর্মোৎসাহে ভীত হইয়াই পরিজনবর্গ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দুর্জয় বীরের নিকট কোনো বাধাই বাধা বলিয়া মনে হইত না। পরবর্তী কাহিনী উপাধ্যায় মহাশয় এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। "তিনি রজনীতে শিবিকা সঙ্গে করিয়া বালীতে উপস্থিত হইলেন। রজনীতে পিতৃগৃহ হইতে পত্নীকে বাহির করিয়া আনিয়া প্রাতে মহর্ষির গৃহে উপনীত হইলেন। মহর্ষি এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।···অন্তঃপুরে বিশেষ উপাসনা হইল।"

কেশবচন্দ্র ও মহর্ষির এই মিলনকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহার এক জীবন-চরিতকার যথার্থই লিখিয়াছেন: "The mature man of fifty joined himself to the eager youth of twenty-three, and they both agreed to work with a cherfulness and enthusiasm which none had experienced before." ব্রাহ্মধর্মের পরবর্তী ইতিহাস তাই এই তরুণ ও প্রৌঢ়ের মিলিত উদ্যমেরই ইতিহাস। মহর্ষি যে আশা লইয়া কেশবচন্দ্রকে আচার্যের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সকলেই অল্পকাল মধ্যে প্রত্যক্ষ করিলেন যে তাঁহার সেই আশা অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই।

তিনি সত্যই সেই গুরুভার অপরাজিত চিত্তে দিবারাত্র বহন করিয়া চলিলেন। এখন হইতে কেশবচন্দ্রের চিন্তা হইল কিসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হয়, কিসে ব্রাহ্মদিগের মনের মালিন্য দূর হয়। অতঃপর তিনি তাঁহার সমস্ত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য যেন এই দিকে প্রয়োগ করিলেন। আচার্যপদে বৃত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি স্বগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। কথিত আছে, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা কেশবচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাকে কলুটোলার বাড়িতে ফিরিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে কেশবচন্দ্র একটু বিচলিত বোধ না করিয়া পারেন নাই। এতদিন যাহা তিনি করিয়া আসিয়াছেন, তাহা নিজের বাড়িতে বসিয়া করিয়াছেন, তাঁহার স্বাধীনতায় অভিভাবকরা এতদিন হস্তক্ষেপ করেন নাই। এখন তিনি সহসা নিজেকে নিরাশ্রয় মনে করিলেন। বিষয়টি যখন দেবেন্দ্রনাথের গোচরে আসিল তিনি তখনি কেশবচন্দ্রকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আমার গৃহ তোমার গৃহ, তুমি সুখে এই গৃহে বাস কর।" তখন হইতে তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সস্ত্রীক পরম সমাদরে বাস করিতে লাগিলেন। মহর্ষি যে কেশবচন্দ্রকে যথার্থ পুত্রতুল্য মনে করিতেন তাহা পরবর্তী আর একটি ঘটনায় প্রকাশ পাইল। তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যাপারে কেশবচন্দ্রকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিষয়টি হাইকোর্ট পর্যন্ত গিয়াছিল, কিন্তু মোকদ্দমা অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্বে, কেশবচন্দ্রের অংশের বিংশতি সহস্র মুদ্রা জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন 'এ্যাটর্নি মারফৎ তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।' যে কারণে তিনি গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহার এক সঙ্কটময় পীড়া উপলক্ষে তাহার নিরসন হয় এবং তিনি পুনরায় স্বগৃহে স্থান পাইয়াছিলেন। এই সময় কেশবচন্দ্রের প্রথম পুত্র নির্মলচন্দ্রের জন্ম হয় (ডিসেম্বর, ১৮৬২)।

আরোগ্য লাভ করিয়া কেশবচন্দ্র আবার উৎসাহের সহিত কাজকর্ম করিতে আরম্ভ করেন, যথারীতি উপদেশ ও বক্তৃতাদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের হিতসাধন করিতে লাগিলেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত 'ব্রাহ্মসমাজ ও সমাজসংস্কার' তাঁহার এই সময়কার একটি বিখ্যাত বক্তৃতা। এই সময়ে

(১৮৬৩) আমরা কেশবচন্দ্রকে খ্রীষ্টান পাদরিদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখি। দুই বৎসর পূর্বে কৃষ্ণনগরে ডাইসনের সঙ্গে তিনি একবার বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইবার তাঁহার প্রতিপক্ষ দাঁড়াইলেন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। তাঁহার হাতে ছিল 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার' নামে একখানি ইংরেজি কাগজ। ইংরেজিতে সুপণ্ডিত ও কৃতবিদ্য এই রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র নিকট বাঙালির কৃতজ্ঞ থাকিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম, বাংলার চিরন্তন রূপকথাকে তিনিই সর্বপ্রথম *Folk Tales of Bengal* নামক পুস্তকের মাধ্যমে য়ুরোপের সাহিত্যসমাজে তুলিয়া ধরেন ; দ্বিতীয়, বাংলার চাষীর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সর্বপ্রথম রূপ দিয়া তিনিই রচনা করেন বিখ্যাত গ্রন্থ *Bengal Peasant Life* এবং ইংরেজি ভাষায় রচিত হইলেও গোবিন্দ সামন্তের জীবন-কথা শিক্ষিত বাঙালি কোনো দিনই বিস্মৃত হইবে না। যে লিপিচাতুর্য ব্রাহ্মবিরোধী রচনায় প্রকাশ পাইয়াছিল, এই বই দুইখানিতেও লালবিহারী দে তাহার অভ্রান্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে ব্রাহ্মধর্মের সহজজ্ঞান বিষয়ে দে সাহেব একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিলেন। তাঁহার এই বক্তৃতা ডাইসনের চিন্তারই প্রতিধ্বনি মাত্র। তাঁহার বলিবার কথা ছিল যে, ব্রাহ্মধর্ম একটি 'Fluctuating religion' মাত্র—ইহার অতিরিক্ত কিছু নয়। দর্শকদের মধ্যে কেশবচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। দে সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইলে পরে তিনি তখনই ঘোষণা করিলেন যে তিনি ইহার প্রতিবাদ করিবেন। কয়েকদিন পরেই সমাজের দোতলা ঘরে কেশবচন্দ্র একটি বক্তৃতা দিলেন ; ইহাই তাঁহার সেই প্রসিদ্ধ বক্তৃতা *The Brahmo Samaj vindicated*। পাদরি ডফ্ সাহেব ইহা শুনিবার জন্য স্বয়ং সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। দে সাহেবের বক্তৃতাটি 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার' কাগজে মুদ্রিত হইয়াছিল। রিফর্মারের সেই সংখ্যাটি হাতে লইয়াই কেশবচন্দ্র মঞ্চের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন বলিলেন,—"ব্রাহ্মধর্মে যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বিবেকের অনুরোধেই হইয়াছে। প্রথমে বেদান্তের প্রতি আমাদের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু যখন দেখা গেল যে, উহার মধ্যে এমন সব মত আছে যাহাতে সায় দেওয়া চলে না, তখন যদি বেদান্তের সম্যক

অভ্রান্ততায় বিশ্বাস পরিবর্তিত হইয়া থাকে, তাহা কি দোষের ?...ব্রাহ্মধর্মে যে পরিবর্তন আরোপিত হইয়াছে, সে পরিবর্তন কি খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসে নাই ?" তখন ডফ সাহেব পর্যন্ত তাঁহার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইয়াছিলেন। রেভারেণ্ড দে তাঁহার বক্তৃতায় আর একটি অপবাদ দিয়াছিলেন ; তিনি বলিয়াছিলেন—ব্রাহ্মসমাজ বাইবেলের সত্য অপহরণ করিয়াছে। ইহারই উত্তরে সেদিন কেশবচন্দ্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল সেই ঐতিহাসিক বাণী : "All truth is God's truth, and therefore common to us all, Truth is no more European than Asiatic, no more Biblical than Vedic, no more Christian than Heathen : it is no more yours than mine." কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাবলী যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই লক্ষ্য করিবেন যে, তাঁহার বক্তৃতায় emotion বা আবেগ থাকিত সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে যুক্তিও থাকিত প্রচুর। এবং সেইসব যুক্তি যেমন শাণিত, তেমনি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ভাবসমৃদ্ধ। কেশবচন্দ্রকে যাঁহারা কেবলমাত্র emotional বা ভাবুক বলিয়া চিত্রিত করেন, তাঁহারা তাঁহার intellect-এর সন্ধান লন নাই ; যদি লইতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, একমাত্র কেশবচন্দ্রের মধ্যেই ভাবুকতা ও মনীষার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়াছিল। পরবর্তীকালে এই ধারা অনুসরণ করিয়াই সুরেন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র বিপিনচন্দ্র হইতে পারিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতার একটি ফল এই হইয়াছিল যে, রামমোহনের সময় হইতে বাংলা দেশে খ্রীষ্টান পাদরিদিগের সহিত যে বিতর্ক চলিয়া আসিতেছিল এইবার তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল। ব্রাহ্মসমাজের সমগ্র ইতিহাসে খ্রীষ্টান প্রচারকদিগের বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্রই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। তারপর এই দেশ হইতে চলিয়া যাইবার প্রাক্কালে ডফ সাহেব যখন বলিয়া গেলেন—"Brahmo Samaj is a power"—তখন হইতে বাংলাদেশে খ্রীষ্টান পাদরিগণ নিরুত্তর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা আর ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতে সাহস পান নাই। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে কেশব-চন্দ্রের এই ভূমিকাটি বিশেষভাবেই অনুধাবনযোগ্য। পাদরিদের তিনি

তর্কযুদ্ধে নিরস্ত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাংলা তথা ভারতবর্ষে খ্রীষ্টের মহত্ত্ব প্রচারে সেদিন তিনিই ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। পৃথিবীর কোনো বিশ্বাসী খ্রীষ্টানও বুঝি খ্রীষ্টের প্রকৃত মহত্ত্ব এমনভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই যেমন পারিয়াছিলেন ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র সেন।

কেশবচন্দ্রের এই বৎসরের কর্মজীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা' স্থাপন। "ব্রাহ্মধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচার, পুস্তক প্রণয়ন, স্ত্রীশিক্ষা বিধান ইত্যাদি লক্ষ্য লইয়া" অনেকটা বেথুন সোসাইটির অনুসরণে এই সভা সংস্থাপিত হয়। অন্তঃপুরের মেয়েদের ধর্মবিরহিত শিক্ষাদান করা উচিত নয়, দেখিতে পাই, তখন হইতেই কেশবচন্দ্র এই মতের একজন সমর্থক। এই ব্রাহ্মবন্ধু সভাতেই দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" শীর্ষক তাঁহার সেই প্রসিদ্ধ ভাষণ দিয়াছিলেন। এই ভাষণেই তিনি বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মানন্দ তো কোন অভাব রাখেন না।" বলা বাহুল্য, কেশবচন্দ্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধক বিবিধ প্রয়াস লক্ষ্য করিয়াই দেবেন্দ্রনাথ এই কথা বলিয়াছিলেন।

॥ নয় ॥

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবার পর একে একে বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে; এবং কেশবচন্দ্র যোগদান করিবার পর সেই প্রভাব যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। তাঁহাকে পাইয়া ব্রাহ্মসমাজ যেন জমিয়া ভরিয়া উঠিল। সময় অনুকূল বুঝিয়া, ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইবার জন্য কেশবচন্দ্র এইবার প্রচারে বাহির হইবেন স্থির করিলেন। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে তখন বোম্বাই ও মাদ্রাজের শিক্ষিতদের মধ্যে কিছু কৌতূহলেরও সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট সমাজের বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইবার পক্ষে কেশবচন্দ্র অপেক্ষা আর যোগ্য ব্যক্তি সেদিন কে ছিলেন? সেদিন তো তাঁহারই বলিষ্ঠ কণ্ঠকে আশ্রয় করিয়া উদার সার্বভৌমিক ধর্মের বাণী ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাহিরেও সগৌরবে প্রচারিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের ধর্মপ্রচার শঙ্করাচার্য বা শ্রীচৈতন্যের ধর্মপ্রচারের সহিত অনেকটা তুলনীয়। কেশবচন্দ্রের প্রচারযাত্রার সঙ্গী ছিলেন অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

মাদ্রাজ। ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৪।

একটি স্কুল হলে কেশরচন্দ্র বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার বিষয়—*The duties and responsibilities of educated Madrasis* এবং বক্তৃতার সময় ছিল সন্ধ্যা ছয়টা। যথাসময়ে কেশবচন্দ্র গিয়া দেখিলেন, "হলে প্রায় সাত শত লোক উপস্থিত। মাদ্রাজ টাইমস্ এবং অন্যান্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, এবং তিনশত কার্ডমাত্র বিতরণ করা হইয়াছিল, তাহাতেই এত লোকের সমাগম। স্থানীয় শিক্ষিত এবং প্রধান প্রধান লোকেরা প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা হইল, সকলে অতি নিস্তব্ধভাবে তাহা শ্রবণ করিলেন।...কেশবচন্দ্রকে বক্তৃতান্তে প্রায় আধ ঘণ্টাকাল সেখানে থাকিতে হইল, কেন না শত শত

লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল।”

বোম্বাই। ১৭ই মার্চ।

স্থানীয় টাউন হলে কেশবচন্দ্র বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার বিষয়—*The Rise and Progress of the Brahmo Samaj* এবং সেদিন তাঁহার এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য প্রচুর লোকসমাগম হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের লোক লিখিত বক্তৃতা শুনিতেই অভ্যস্ত। কেশবচন্দ্রের মৌখিক বক্তৃতা শুনিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। সমসাময়িক বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এই বক্তৃতায় বোম্বায়ের প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। স্যার জামসেদজি জিজিভয়, বিচারপতি টকর, জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, স্যার আলেকজান্দার গ্রাণ্ট বার্ট, বিচারপতি নিউটন, বিচারপতি পাউচ, খ্রীষ্টীয় মিশনারি উইলসন, ষ্টোবেল, মিঃ বার্ডউড, অধ্যাপক বুহলার প্রভৃতিকে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে পাইয়া কেশবচন্দ্র যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করিলেন। তিনি দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস দিয়া তিনি বক্তৃতা শুরু করেন এবং তারপর সমাজসংস্কারে পৌত্তলিকতা বর্জন করা যে প্রয়োজন, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস ভিন্ন যে উহা সিদ্ধ হইতে পারে না—ইহাই সকলকে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিলেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সকল কাগজেই কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাগুলির বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

মাদ্রাজ, বোম্বাই ও পুণা প্রভৃতি স্থানে কেশবচন্দ্র শুধু ধর্মপ্রচারই করেন নাই, সেইসব অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তিনি গভীরভাবে মেলামেশাও করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিয়াছেন, এবং জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে যেমন আলাপ করিয়াছেন, তেমনি সর্বভারতীয় ঐক্যের কথাও আলোচনা করিয়াছেন। বাঙালি, বেহারী, মাদ্রাজী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী হইলেও, আসলে তাহারা সকলেই যে এক জাতি—ভারতবাসী—এই ঐক্যবোধের বাণী সেদিন সর্বপ্রথম কেশবচন্দ্রের কণ্ঠেই ধ্বনিত হইয়াছিল। কোথাও কেহ কেহ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মান

দিয়াছে। এমন কি, খ্রীষ্টান প্রচারকদিগের সহিতও তিনি সমানভাবেই মেলামেশা করিয়াছেন। বোম্বাইতে রেভারেণ্ড ডাঃ উইলসন তো তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজা দলীপ সিং পর্যন্ত তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সর্বত্র সকলেই তাঁহার জীবনের বিশ্বাস, উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া মুগ্ধ হইল। তাঁহার হৃদয়ের অগ্নি যেন সর্বত্র বিস্তীর্ণ হইল। পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্রের এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়াই সমাজের প্রচারকগণ প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এইভাবে ব্রাহ্মধর্মের বিজয়পতাকা উড়াইয়া এবং সর্বভারতীয় ঐক্যবোধের বাণী প্রচার করিয়া কেশবচন্দ্র এপ্রিলের মাঝামাঝি কলিকাতায় ফিরিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে তখনো জাতিভেদ বিদ্যমান ছিল। কেশবচন্দ্র প্রথম হইতেই ইহা নির্মূল করিতে চাহিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য তিনি অসবর্ণ বিবাহকে উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করিলেন। তাই দেখিতে পাই যে, বোম্বাই হইতে ফিরিয়া তিনি এই বিষয়ে আবার উদ্যোগী হইলেন। দুই বৎসর পূর্বে প্রথম অসবর্ণ বিবাহ দিয়া তিনি বহু অকল্যাণের আকর জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন এবং পরে "ইণ্ডিয়ান মিরারে এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সকলকে অবহিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফল কিন্তু ভালো হইল না। স্বয়ং প্রাধানাচার্য ইহা অনুমোদন করিলেন না। প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মরা কেশবচন্দ্রের প্রতি বিরূপ হইলেন। তাঁহারা তখনই দেবেন্দ্রনাথকে কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিলেন। ব্রহ্মানন্দের প্রতি মহর্ষির অসাধারণ অনুরাগ, তাই মুখে কিছু বলিলেন না, "কিন্তু মহর্ষির মনে যে একটি গূঢ় রেখাপাত হইল, তাহাতে আর কোনো সংশয় নাই।" কেশবচন্দ্র যখন বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, তখন সমাজে আর একটি অসবর্ণ বিবাহ সংঘটিত হয় এবং প্রবীণ ব্রাহ্মরা ইহাতে ঘোরতর আপত্তি তুলিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে সমাজসংস্কারের বিষয়টি আলোচনা করিবার জন্য তাঁহারা দেবেন্দ্রনাথকে এই সময় বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, ব্যাপারটি অনেক দূর পর্যন্ত গড়াইয়াছে এবং নবীন ও প্রবীণ দলের মধ্যে

এই লইয়া বেশ একটি অসন্তোষের ভাবও দেখা দিয়াছে। বিচ্ছেদের ইহাই ছিল পূর্বাভাষ।

উপবীতের প্রশ্নটি আবার উঠিল। তখনো উপবীতধারী উপাচার্যদের দ্বারা বেদীর কার্য সম্পন্ন করা হইত। মহর্ষি কেশবচন্দ্রের যুক্তির চাপে পড়িয়া পৈতা ত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু সমাজে যাঁহারা উপাসনাদির কাজ করিতেন তাঁহাদের সকলেরই পৈতা ছিল। ইঁহারা দুই দিকই বজায় রাখিয়া চলিতেন—"ইহারা উপবীত ধারণ করিয়া হিন্দুসমাজের সহিত ক্রিয়াকলাপে যোগ রাখিয়া, সমাজের উপাসনাদির কার্য করিতেন, অর্থের সহিতও সম্বন্ধ ছিল।" ধর্মজীবনে এইরূপ কপট ব্যবহার কেশবচন্দ্র সহ্য করিতে পারিতেন না। তখন তিনি সোজাসুজি বিষয়টি মহর্ষির নিকট উপস্থাপিত করিলেন। গুরুতর মতভেদ দেখা দিল। এই প্রসঙ্গে উপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে, "কেশবচন্দ্র প্রত্যেক সত্য ও তত্ত্ব জীবনের ক্রিয়ায় পরিণত না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, মহর্ষি সত্যে ও তত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া উহাতেই আবদ্ধ থাকিতেন, বাহিরে কিছু হইল কি না, তৎসম্বন্ধে উদাসীন থাকিতেন।"

দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সহিত কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির একটা মূল পার্থক্য ছিল এই যে, একজনের মানসপ্রকৃতি ছিল সংরক্ষণশীলতার গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ। আর অন্যজনের প্রকৃতিতে ছিল একটা উদার সর্বজনীন ভাব, যাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভৃতি জাতিবিচারের প্রশ্ন লেশমাত্র ছিল না; দেবেন্দ্রনাথ চাহিয়াছিলেন একটি আদর্শ হিন্দুসমাজ গঠন করিতে এবং ব্রাহ্মসমাজের কাঠামোর মধ্যে উপনিষদের ভিত্তিতে প্রাচীন হিন্দুত্বেরই পুনরুত্থান ছিল তাঁহার কাম্য। তাঁহার আধ্যাত্মিকপ্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল, অনেকটা আর্যমনীষার ধাঁচে বেদকে আশ্রয় করিয়া। এইজন্যই তিনি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে অব্রাহ্মণ কোনো উপাচার্যকে স্থান দিবার বিপক্ষে ছিলেন। কেশবচন্দ্রের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। তিনি চাহিয়াছিলেন একটি নূতন সমাজ গঠন করিতে, একটি নূতন ধর্ম স্থাপন করিতে—যে সমাজে, যে ধর্মে জাতিভেদের স্থান নাই। দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা বর্জন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বিবাহাদি অনুষ্ঠানে তিনি
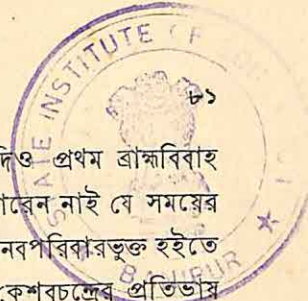
হিন্দুবিধি মানিয়া চলিবার পক্ষপাতীই ছিলেন, যদিও প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ তাঁহারই পরিবারে হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন নাই যে সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে, সমগ্র মানবজাতি এমন এক মানবপরিবারভুক্ত হইতে চলিয়াছে। ব্রাহ্মণ-শূদ্রে বৈষম্য এই যুগে অচল। কেশবচন্দ্রের প্রতিভায় যুগের এই দাবী ধরা পড়িয়াছিল—"The demands of the new generation fell upon him thick and fast waiting for a ready response", এবং তাঁহার বৈপ্লবিক মনীষা কি ভাবে সেই দাবী পূরণ করিয়াছিল, অতঃপর আমরা সেই ইতিহাস আলোচনা করিব।

কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজকে একটি সর্বভারতীয় রূপ দিবার কথা এইবার কেশবচন্দ্র বিশেষভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি তিনি বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করিয়াছেন এবং তাঁহার সমগ্র প্রতিভা ও শ্রম ইহার জন্য নিয়োগ করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলেন। বাংলার বাহিরে এখানে ওখানে যত সমাজ তখন স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সবগুলিকে তিনি ঐক্যের সূত্রে বাঁধিতে চাহিলেন। দেবেন্দ্রনাথও পূর্বে এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'প্রতিনিধিসভা' কেশবচন্দ্রের এই উদ্যমের ফল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের, ৩০শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দোতলা ঘরে এই সভার প্রথম অধিবেশন বসিল। দেবেন্দ্রনাথ সভাপতি। প্রতিনিধি-সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় বর্ণনা করিয়া কেশবচন্দ্র বলিলেন ঃ "ধর্মকে জীবনে পরিণত করিবার প্রণালী লইয়া মতভেদ ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মধর্মে একত্ব এবং বহুত্বের সামঞ্জস্য আছে, ইহাই ইহার মহত্ত্ব। ব্রাহ্মধর্মে মূল মতে ঐক্য, প্রণালী সম্বন্ধে স্বাধীনতা। এইটি দৃষ্টিস্থলে রাখিয়া সকল সমাজের একত্র হওয়া সমুচিত। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য 'প্রতিনিধিসভা' স্থাপন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত। সকল সমাজ একতাবন্ধনে বদ্ধ হইয়া সর্বত্র ব্রাহ্মধর্মের সত্য প্রচার করিবেন, এই ইহার লক্ষ্য হইবে।" যথারীতি সভা স্থাপিত হইল ; দেবেন্দ্রনাথ উহার সভাপতি হইলেন, কেশবচন্দ্র সম্পাদক। এই একই সময়ে কেশবচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্ব' নামে একখানি বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করিলেন।

কেশবচন্দ্রের কর্মপ্রণালী যাঁহারা অনুধাবন করিয়াছেন তাঁহারা একটি

জিনিস লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইবেন। কর্মজীবনের প্রত্যেক অধ্যায়, প্রত্যেক স্তরে তিনি চাহিয়াছেন উন্নতি ও বিস্তার এবং পুরাতনকে তিনি সব সময়ই নূতনের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছেন। কারণ তিনি ছিলেন নূতন যুগের একজন নূতন মানুষ। 'বায়োগ্রাফি অব্ এ নিউ ফেথ' গ্রন্থের লেখক এই প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন যে, "with the progress of ideas and with the expansion of scope of activities, old machinery must give place to new, and old institutions merge into new," এবং তাঁহার পূর্বাপর কার্যপদ্ধতি যদি বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, কলুটোলার সেই সান্ধ্য-স্কুল, গুড্উইল ফ্রেটারনিটি ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে যেমন একদিন সঙ্গত সভার আবির্ভাব হইয়াছিল, আজ সেই সঙ্গত সভারই স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে দেখা দিল প্রতিনিধিসভা। ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া অবধি কেশবচন্দ্র সর্বদাই ইহার consolidation চাহিয়াছেন—সমস্ত সমাজগুলিকে ঐক্যসূত্রে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্মবন্ধুসভা ছিল ইহারই প্রথম প্রয়াস। তখন কলিকাতার চারটি সমাজকে লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা ছিল ৪৫টি। ১৮৬৪তে সেই সংখ্যা দাঁড়াইল পঞ্চাশে এবং সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীর সংখ্যা তখন দুই হাজার ছিল। প্রতিনিধিসভার প্রয়োজন তখন ঐতিহাসিক কারণেই অনিবার্যরূপে দেখা দিয়াছিল এবং সেই সভার মঞ্চ হইতেই কেশবচন্দ্র তাঁহার বৈপ্লবিক কার্যপদ্ধতি আর একবার ঘোষণা করিলেন ; প্রচারকার্য, সমাজসংস্কার ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধান, এবং জাতিভেদ দূর করিয়া বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বিধিনিয়মের আমূল পরিবর্তন সাধন—এই সব বিভিন্ন ও বহুমুখী উদ্যমের ভিতর দিয়া কেশবচন্দ্র ধর্মকে প্রাত্যহিক জীবনে রূপায়িত করিতে চাহিলেন। মোট কথা, "The *Pratinidhi Sabha* was intended to be an effective machinery for consolidating the Samajes and for organising misssion work, extensively and intensively," এবং ইহার ভিতর দিয়াই তিনি ব্রাহ্মসমাজকে একদিকে গণতন্ত্রপ্রণালীতে

সুগঠিত করিতে চাহিলেন এবং অন্য দিকে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত, উন্নতিকামী, সংস্কারপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের সহিত সহযোগিতা করিয়া সমস্ত ভারতের জন্য একটি 'চার্চ' স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ইহাই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্য দিয়া রূপ লইয়াছিল। সকল বিষয়ে আমূল পরিবর্তন প্রয়াসী ও বিপ্লবাত্মক প্রগতির পক্ষপাতী কেশবচন্দ্রের চিন্তা ভাবনার সহিত রক্ষণশীল দেবেন্দ্রনাথের মিল না থাকাই স্বাভাবিক এবং সেই কারণেই দেখিতে পাই, তিনি কেশবচন্দ্রের বিবিধ সংস্কারকার্য সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য ও ইহার সহিত ট্রাষ্টীদিগের প্রকৃত সম্পর্ক কি, এই বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হইল। তৃতীয় অধিবেশন ব্রাহ্মসমাজ গৃহে হয় নাই, হইতে দেওয়া হয় নাই, ইহা চিৎপুর রোডে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে হইয়াছিল। এই অধিবেশনে প্রতিনিধিসভা সিদ্ধান্ত করিলেন যে ট্রাষ্টীগণ সমাজের সম্পত্তিরই ন্যাসরক্ষক, কিন্তু সমাজের প্রচারকার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা ইঁহাদের থাকিতে পারে না, তাহা হইলে রামমোহনের ট্রাষ্টডীডই মিথ্যা হইয়া যায়।

যতই দিন যাইতে লাগিল প্রাচীন ও নবীন দলের মধ্যে বিরোধ ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; একদিকে ব্রহ্মানন্দী দল, অন্যদিকে মহর্ষির দল— পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দেই বিষয়টি চরমে উঠিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষির আত্মচরিতের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় এই বিষয়টির একটি সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"Keshub was a reformer of a more pronounced type. A time came when Maharshi could no longer pull together with his conservatism...he drew back in alarm··· A struggle between two such temperaments and such opposite ideas was bound to end in disruption and matters soon came to a crisis". কিন্তু আমরা জানি বিচ্ছেদের আরো একটি কারণ ছিল। ১৮৬৫-র শরৎকালের ঝড়ে সমাজগৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় গৃহসংস্কার প্রয়োজন

হইল। সেই সময়ে মহর্ষির গৃহেই উপাসনার ব্যবস্থা হয়। নভেম্বর মাসের এক বুধবার সন্ধ্যায় কেশবচন্দ্র কয়েকজন উপবীতত্যাগী উপাচার্যসহ যখন জোড়াসাঁকোয় মহর্ষির ভবনে আসিলেন তখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহারা আসিবার পূর্বেই উপবীতধারী উপাচার্যগণ মহর্ষির নির্দেশে উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

—এমন কেন হইল? বিক্ষুব্ধ চিত্তে প্রশ্ন করিলেন কেশবচন্দ্র।

—ইহা তো আর সমাজগৃহ নহে, ইহা একজনের বাটীতে উপাসনা, উত্তর দিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

—কিন্তু তত্ত্ববোধিনীতে উপাসনার প্রকাশ্য নোটিশ ছাপা হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে কোনোমতেই পারিবারিক উপাসনা বলা চলে না।

দেবেন্দ্রনাথ নিরুত্তর। ইহার পরই তিনি "কোনো সভা আহ্বান না করিয়া, কাহাকেও কোনো কথা না বলিয়া, কেশবচন্দ্র প্রভৃতিকে সমুদয় ভার হইতে অবসৃত করিবার মানসে, ট্রাষ্টী বলিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন।"

কেশবচন্দ্র ও মহর্ষির মধ্যে বিচ্ছেদের বিষয়টি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়; সেই কারণে ইহার বিশদ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সমসাময়িক বিবরণ অপেক্ষা আমরা এই বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পত্রাবলীর উপর নির্ভর করিব। উপবীত ও জাতিভেদের প্রশ্ন লইয়াই উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ এবং বিচ্ছেদ দেখা দিয়াছিল। দেখা যাক এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ পূর্বাপর কী অভিমত প্রকাশ করিতেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে মহর্ষি লিখিতেছেন: "আমার মতে ব্রাহ্মদিগের উপনয়ন স্বধর্মসম্মত নহে। অতএব অবশ্য তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে; যদি ব্রাহ্মদিগের উপনয়নই পরিত্যাগ করিতে হইল, তবে আর ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি জাতিভেদ কোথায় থাকে যে বিবাহের সময়ে জাতিভেদ করা যায়?" ঐ বছরের আর একখানি পত্রে লিখিতেছেন: "এক্ষণে এমত সময় উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে জাতিভেদ ভঙ্গ করা যায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কালে যে জাতিভেদ থাকিবে না তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যেহেতু নানা ঘটনা সেই জাতিভেদ ভঙ্গ বিষয়ে উন্মুখ হইয়াছে।...যে পরিবর্তন হইতে

আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে কাহারও বাধা দিবার সাধ্য নাই।" ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের এক পত্রে লিখিতেছেন: "আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা উপাচার্যের কর্ম সুন্দররূপে কোনোরূপেই সম্পন্ন হয় না।...কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে উপাচার্য রাখিয়া তাঁহাদের এ ধর্ম বিষয়ে ঔদাস্য দেখিয়া এইক্ষণে তাহাদের প্রতি নিরাশ হইয়াছি। ব্রাহ্মণ না হইলে উপাচার্য হইবে না, এ কথারও মুণ্ডে বজ্রাঘাত করা যায়। শ্রদ্ধাবান ব্রাহ্ম অপেক্ষা কি কপট ব্রাহ্মণ ভাল?" ১৮৬২-তে এক পত্রে লিখিতেছেন: "ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জাতিভেদ থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জাতি-ভেদ নাই। ব্রাহ্মণশূদ্রের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান হইতে পারে।"

এইখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জাতিভেদ ও পৈতা ফেলা—এই দুইটি বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ যেন অনেকটা দোলায়মান চিত্ত। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রকে আচার্যের পদে অভিষিক্ত করিবার সময়ে মহর্ষিই বলিয়াছিলেন: "তোমার উপদেশ ও অনুষ্ঠান যেন ব্রাহ্মদিগের অমৃতের সোপান হয়।" দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মসমাজগৃহে প্রতিনিধিসভা বা প্রচার-সম্বন্ধীয় কাজ বন্ধ করিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন, তখন (১৮৬৫, ৫ই মে) এক পত্রে কেশবচন্দ্র তাঁহাকে লিখিলেন—"আপনি পূর্বে বলিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ ট্রাষ্টডীড অনুসারে কেবল উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে, এবং প্রচারের জন্য ভিন্ন স্থান আবশ্যক; কিন্তু ঐ গৃহে আবার (ট্রাষ্টডীডের বিরুদ্ধে) প্রচারের জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, তবে পূর্বের ন্যায় তথায় প্রতিনিধিসভা বা প্রচারসম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য কেন হইবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। এইমাত্র বোধ হয় যে, উক্ত সভা এবং আমাদের সমুদয় কার্য আপনি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ জ্ঞান করেন ও তৎপ্রতি উৎসাহ দান করিতে আপনি ভীত হন। কিন্তু আবার আপনিই প্রতিনিধিসভার সভাপতি এবং প্রচারকার্যের অন্যতর অধ্যক্ষ; তবে এ সকল বিষয়ে আপনি বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? ...যখন বর্তমান গোলমালের সূত্রপাত হয়, তখনই আমি বলিয়াছিলাম যে, এই কলহ ক্রমশঃ বর্ধিত হইবে এবং সতর্ক না হইলে, ইহা হইতে অবশেষে দলাদলি হইবে; কিন্তু তখন আপনি এ কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন।...

আপনি আমাদের কার্যের কিছুমাত্র ব্যাঘাত না করিয়া যদি কেবল সমাজের ট্রাষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন এবং বিরোধী না হইয়া পৃথকভাবে স্বীয় লক্ষ্য সংসাধন করিতেন, তাহা হইলে এত গোলের সম্ভাবনা থাকিত না।" ইহার উত্তরে মহর্ষি লিখিলেন (৬ই মে, ১৮৬৫):—"যথার্থই আমি এই কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলাম। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ আমার কার্যের পরিমিত ক্ষেত্র, আমি তথায় ব্রাহ্মদিগের ও ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিব···ইহা করিলে যদি তোমার বিপক্ষতা করা হয়, তবে ইহার উপায় নাই।···তোমার সহিত যুক্ত থাকিয়া, এই ছয় বৎসরে তোমার নিকট হইতে যে কিছু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার জন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।" ইহার উত্তরে কেশবচন্দ্র লিখিলেন (১৩ই মে, ১৮৬৫): "আমার বাস্তবিক দুঃখ হইতেছে যে, ছয় বৎসরকাল এত গভীর যোগসত্ত্বেও আপনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না।···আপনার লেখার ভাবে বোধ হইতেছে যে, আমার যে সকল সদ্‌গুণ আছে, তাহা আমি গৌরবের জন্য নিয়োগ করিতেছি, এবং আমি যাহা কিছু করিতেছি, সকলই জয়লাভের জন্য—এই কারণেই আমি সম্প্রতি আপনার অপ্রীতিভাজন হইয়াছি।··· আমার অন্তরে ঈশ্বর একটি আদর্শ নিহিত করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে তদনুসারে আমি ধর্মপ্রচার ও সমাজসংস্কার করিতে পারি, ইহাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও কার্য।···আমাকে আপনি বুঝিতে না পারাতেই তত্ত্ব-বোধিনী সভার মত, অক্ষয়কুমার দত্তের মত, আমাকে বিঘ্নজ্ঞান করত, আমাকে বিদায় করিয়া, নিশ্চিন্ত ও নিষ্কণ্টকরূপে ব্রাহ্মসমাজকে স্বীয় ইচ্ছানুসারে শাসন করিবেন, এরূপ কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম বা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আপনি যাহা কিছু করিবেন, তাহা আপনার কার্য কিরূপে বলিব, সাধারণ ব্রাহ্মেরা তাহাতে কিরূপে উপেক্ষা করিবেন, যখন ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সাধারণের। আমার অন্তরে যে আদর্শ আছে, তদনুসারে আমায় কার্য করিতেই হইবে।" ইহার পর কেশবচন্দ্র, প্রতাপ-চন্দ্র প্রমুখ ছয়জনের স্বাক্ষরিত একখানি পত্রের উত্তরে মহর্ষি তাঁহার শেষ কথা জানাইলেন—"তোমাদের ইচ্ছার অনুকূল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না।"

ইহার পর পৃথক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন ভিন্ন অন্য কোনো উপায় ছিল না। আসল কথা, ত্রিশ বৎসর পরে ব্রাহ্মসমাজে যখন পরিবর্তন প্রয়োজন হইল, তখন কেশবচন্দ্র তাঁহার দূরদৃষ্টির বলে বুঝিলেন যে—"কালের উন্নত ভাবের সহিত যোগ রাখিয়া, জনসমাজের নূতন ভাব ও নূতন অভাব অনুসারে ইহার কার্যপ্রণালী পরিবর্তন না করিলে" ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মহর্ষি যতদিন পারিয়াছেন, অপ্রতিহত ও নিঃস্বার্থ যত্নের সহিত ততদিন তিনি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিসাধন করিয়াছেন—একথা স্বীকার করিতে কেশবচন্দ্র কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজ বড়ো—ব্যক্তিবিশেষের শান্তিসুখ বিঘ্নিত হইবে বলিয়া সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে তো তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না। যদি বুঝিতেন, ব্রাহ্মসমাজ নিতান্তই ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক সম্পত্তি, তাহা হইলে কেশবচন্দ্র হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—এই অপ্রীতিকর বিচ্ছেদ ডাকিয়া আনিতেন না। দেবেন্দ্রনাথ যখন ট্রাষ্টক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন যে সেই ক্ষমতার বলে তিনি কেশবচন্দ্রের অগ্রগতিকে নিরস্ত করিবেন, হয়তো কেশবচন্দ্র তাঁহার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিবেন না। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তিনি ভুল করিয়াছিলেন—ব্রাহ্মসমাজ সর্বসাধারণের সম্পত্তি, এবং কেশবচন্দ্রও অন্যান্য ব্রাহ্মের ন্যায় সেই সমাজেরই একটি অঙ্গ, ইহা মহর্ষি বুঝিতে চাহেন নাই। রামমোহনের মহৎ আদর্শকে কেশবচন্দ্র সেদিন এমনি করিয়াই রক্ষা করিয়া, উহাকে যুগপ্রয়োজন অনুযায়ী বিস্তার ও উন্নতির পথে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। সেই জন্যই না তিনি দেবেন্দ্রনাথকে বলিতে পারিয়াছিলেন—"ঈশ্বর যখন সহায়, তখন আর আমার ভয় কি ?"

এই বিচ্ছেদ ইতিহাসের নেপথ্য বিধানেই হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ যেমন স্বীয় ব্যক্তিগত আদর্শে অটল ছিলেন, কেশবচন্দ্রও তেমনি ব্রাহ্মধর্মের মূল আদর্শে ছিলেন অবিচলিত। তাই দেখিতে পাই যে, এই ঘটনার পনর বৎসর পরে তিনি সেবকের নিবেদনে লিখিলেন : "প্রথম যুদ্ধ একেশ্বরবাদের যুদ্ধ, দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ। পুরাতন অভ্যস্ত ভাবের সহিত নূতন নূতন

ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র মনের মধ্যে অধিকাংশ কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন, কিন্তু কয়েকজন সেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ব্যাকুল হইলেন।...এই দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘোরতর যুদ্ধ।"

কেশবচন্দ্রের জীবনেতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব এইখান হইতেই আরম্ভ। অগ্নিমন্ত্রের সাধক কেশবচন্দ্র অতঃপর কিভাবে উদার ও জীবন্ত সত্যের উপরে ব্রাহ্মধর্মকে সংস্থাপিত করিয়া এই ধর্মে নিখিল মানবের অধিকারকে স্বীকৃতি দিলেন, এইবার আমরা তাঁহার জীবনের সেই কাহিনী বলিব।

॥ দশ ॥

কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে যে বিচ্ছেদ আসলে তাহা ছিল আদর্শের সংঘাত, নবীন ও প্রবীণদলের মধ্যে আদর্শের সংঘর্ষ। এইরকম সংঘাত-সংঘর্ষ ইতিহাসের নেপথ্য বিধানেই ঘটিয়া থাকে, ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো একটি ঘটনা ইহার উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। এই বিরোধ বা বিচ্ছেদ যদি ব্যক্তিগত কারণে ঘটিত তাহা হইলে মুসৌরি পাহাড় হইতে শেষ বয়সে মহর্ষি প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে এক পত্রে কখনই লিখিতেন না : "এইক্ষণে ব্রহ্মানন্দের কথা কি বলিব···তাঁহার জীবন ধর্মের জন্য, সূর্যের ন্যায় তাঁহার প্রতাপ—উজ্জ্বল তাঁহার মুখশ্রী। সে মুখশ্রী অদ্যাপি আমার হৃদয়ে জাগ্রৎ রহিয়াছে। যদি আমার এই মনে কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে তাঁহারই প্রতিমা।··· তাঁহার জন্য আমার মন কিন্তু বড়ই ব্যথিত হয়। তাঁহার পক্ষ ও তাঁহার মত যদি আমি সমর্থন করিতে পারিতাম তাহা হইলে কত আনন্দ যে লাভ করিতাম, তাহা বলিতে পারি না।" অন্যদিকে কেশবচন্দ্রও শেষবয়সে তাঁহার জীবনের ধর্মপিতাকে কখনো লিখিতে পারিতেন না—"আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রহ্মানন্দ, সন্তান ও দাস।" সুতরাং অভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ইতিহাস রচনার নামে যাহাই কেন বলুন না, প্রকৃত ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দিতেছে যে, আদর্শের জন্য পৃথক হইলেও এই দুই যুগ-নায়ক—দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র—অন্তরের দিক দিয়া পরস্পরের প্রতি এক অক্ষয় প্রীতির বন্ধনে চিরকাল আবদ্ধ ছিলেন।

কেশবচন্দ্র যে দেবেন্দ্রনাথের সহিত একসঙ্গে থাকিয়া আর কাজ করিতে পারিবেন না, ইহার প্রথম প্রকৃত আভাস আমরা পাই ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারির সাম্বাৎসরিক উপাসনা বক্তৃতায়। সেইদিন কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের বেদী হইতে কেশবচন্দ্র ঘোষণা করিয়াছিলেন : "Our cathedral is the universe, our object of worship is the Supeme Lord, our Scripture is intuitive knowledge, our path to salvation

is worship, our atonement is by self-purification, our guides and leaders are all the good and great men." ইহার পরই প্রগতিশীল দল রক্ষণশীল দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন। ইহা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। দুই দলকে সম্মিলিত রাখিবার জন্য বহু চেষ্টা করা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা ব্যর্থ হইল। অতঃপর বিষয়টি সংবাদপত্রের আন্দোলনের বিষয় হইয়া উঠিল। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইল। 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' কেশবচন্দ্র 'ইংলিসম্যানে'র প্রবন্ধের জবাবে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন। জনসাধারণের মনে বিষয়টি লইয়া যে ঔৎসুক্য দেখা দিয়াছে তাহা যুক্তির দ্বারা নিরসন করিয়া তিনি লিখিলেন: "বিবিধ জনশ্রুতিতে যখন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, তখন আমাদিগের কর্তব্য এই যে, সাধারণের যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অপনয়ন করিবার জন্য স্পষ্ট ভাষায় বিনা বর্ণনাধিক্যে যথার্থ ঘটনা প্রকাশ করি। ...কোন ব্যক্তিগত ভাব বা সামান্য মতগত পার্থক্য জন্য, সমাজের মর্মগত কল্যাণ এবং সাধারণের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া, পূর্ব সম্পাদক ও অধ্যক্ষগণ সমাজের সহিত সমুদয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করিলে তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত অবিচার হয়। পক্ষান্তরে বাধ্য হইয়া দুঃখের সহিত তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। ট্রাষ্টীগণ পদ পরিত্যাগ করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়াছেন।...ট্রাষ্টীগণ বলিতেছেন, 'কলিকাতা সমাজ' বলিতে রামমোহন রায় স্থাপিত উপাসনার্থ ট্রাষ্ট গৃহ বুঝায়, সুতরাং যাঁহারা আইনতঃ উহার ট্রাষ্টী, কেবল তাঁহাদিগেরই উহার কার্য নির্বাহ করিবার অধিকার। ব্রাহ্মসাধারণ বলিতেছেন যে, 'কলিকাতা সমাজ' বলিতে ব্রাহ্মভ্রাতৃমণ্ডলী বা সমাজ বুঝায়, সুতরাং সাধারণ মনোনয়ন দ্বারা যাহা স্থির হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন কর্তৃত্বের তাঁহারা প্রতিবাদ করেন।" সমাজ ট্রাষ্টীদ্বারা শাসিত হইতে পারে না—এই মূল প্রশ্নই সেদিন কেশবচন্দ্র তুলিয়াছিলেন। এবং সেই সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, রামমোহন যে ট্রাষ্টডীড করিয়া গিয়াছেন, সেই দলিল অনুযায়ী ট্রাষ্টী ব্রাহ্ম হইতেও পারেন, না হইতেও পারেন। সুতরাং এই অবস্থায় ব্রাহ্মসাধারণকে কার্যনির্বাহ করিতে না দিয়া, ট্রাষ্টীগণের সমস্ত ভার গ্রহণ করা—একনায়কতন্ত্রেরই সামিল। ধর্মের ক্ষেত্রে

ইহার পরিণাম যে কিছুতেই ভালো হইতে পারে না, সেদিন কেশবচন্দ্র বহু যুক্তি দ্বারা সেই কথাই দেবেন্দ্রনাথকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র শুধু মিরারে লিখিয়া নিরস্ত হইলেন না। রামমোহনের উদার ও সার্বভৌম আদর্শকে সংকীর্ণতার হাত হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য একদিন প্রকাশ্যে বক্তৃতাও দিলেন। বক্তৃতার বিষয়ঃ *The struggle for religious independence and progress in the Brahmo Samaj*; বক্তৃতার তারিখ ছিল ২৩শে জুলাই, ১৮৬৫ অর্থাৎ বিচ্ছেদের ছয় মাস পরে। গোপাল মল্লিকের বাড়িতে এই বক্তৃতা হয় এবং ইহাতে যে জনসমাবেশ হইয়াছিল তাহাকে ডক্টর প্রেমসুন্দর বসু তাঁহার পুস্তকে 'large and distinguished' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের বহু বিখ্যাত বক্তৃতাগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম এবং ব্রাহ্মসমাজের সমগ্র ইতিহাসে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। তিন ঘণ্টাব্যাপী এই বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র বিবাদের মূল ও প্রকৃতি আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করেন এবং সকলেই উহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। কিন্তু ইহাতেও কোন কাজ হইল না। তখন কেশবচন্দ্র *An Appeal to young India* শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। সেই পুস্তিকায় তিনি ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস সমগ্রভাবে আলোচনা করিয়া লিখিলেনঃ "You must admit the necessity of a thorough reformation of Hindu society···Those who desire to fight the battle of reform must be first of all suitably armed with a strong and abiding sense of duty···I appeal to the conscience, not to the intellect of young India···Then truth shall shine throughout the length and breadth of India and harmony reign among its vast population." কেশবচন্দ্রের এই আবেদন, নবীনদলের হৃদয়কে স্পর্শ করিল। তাঁহারা তাঁহার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া কেশবের অনুগামী হইলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ট্রাষ্টীগণ সমাজের সম্পত্তি হস্তগত করিয়া, 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজখানিকে তাহাদের তত্ত্বাবধান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নহে, মিরারে ভবিষ্যতে কেহ যাহাতে তাঁহার

বিনানুমতিতে লেখা না পাঠান, দেবেন্দ্রনাথ এমন নির্দেশও দিলেন। তখন হইতে কেশবচন্দ্র অন্য প্রেসে উহা ছাপাইবার ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর কেশবচন্দ্র স্বাধীনভাবে ইণ্ডিয়ান মিরার পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

সমগ্র বিষয়টি অনুধাবন করিলে পরে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হইয়া পড়ে যে "it was not a mere quarrel but a conflict of ideals and principles" এবং এই সংঘর্ষের মুখেও কেশবচন্দ্রের হৃদয়ের মহত্ত্ব ও উদারতা আরো বেশি করিয়া প্রকাশ পাইল যখন তিনি ইণ্ডিয়ান মিরারের এক সংখ্যায় "The Brahmo Samaj or Theism in India" শীর্ষক প্রবন্ধে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন ও সংগঠনে কি করিয়াছেন তাহা অলোচনা করিলেন। সেই প্রবন্ধে মহর্ষিকে "মহাপরিবর্তনসাধক দেশ-সংস্কারক" ও তাঁহার নেতৃত্বকে "একজন অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির নেতৃত্ব" বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, মহর্ষির অতি ভক্তরাও তাহা লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তথাপি কেশব-বিরোধিগণ তাঁহাকে ভুল বুঝিলেন এবং লোককে তাঁহারা ভুল বুঝাইলেন। নিজের আয়ত্ত্বে আসিবার পর হইতে 'মিরারে' কেশবচন্দ্র 'আত্মপরিচয়' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, তিনি চিরকালই ব্রাহ্মনীতি ও ব্রাহ্মধর্মের মূলসূত্রগুলি সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন এবং সকল অবস্থাতেই তিনি সত্য সমর্থন করিতে কৃতসংকল্প। তিনি যখন বলিলেন—ব্রাহ্মধর্ম কেবল ভারতবর্ষের জন্য বিশেষ নহে, সমুদয় মানবজাতির উহা ধর্ম, তখন যদি মহর্ষি ইহার মর্মানুধাবন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়তো এই বিচ্ছেদ যেভাবে আসিয়াছিল, ঐভাবে বাদ-প্রতিবাদের ভিতর দিয়া নাও আসিতে পারিত।

১৮৬৬, ১১ই নভেম্বর।

উন্নতিশীল দল কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। অতঃপর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ 'আদিসমাজ' নামে পরিচিত হইল। মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন ইহার সম্পাদক। প্রাচীন-পন্থী ও রক্ষণশীল ব্রাহ্মদের লইয়া দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া রহিলেন, নূতন যুগের প্রয়োজনকে স্বীকার করিয়া লইয়া রামমোহনের

ব্রাহ্মসমাজকে উহার নিয়তিনির্দিষ্ট পরিণতির পথে, ব্যাপকতার পথে লইয়া যাইবার মতন প্রতিভা তাঁহার ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের মানসগঠনে একটি বড়ো রকমের ত্রুটি এই ছিল যে, তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার চিত্ত রামমোহন বা কেশবচন্দ্রের ন্যায় একটি বিশ্বব্যাপক ভূমিতে বিচরণ করিত না। উপনিষদ্ এবং হাফেজ—ইহাই ছিল তাঁর ধ্যান-ধারণা ও অনুভূতির সীমানা; বাইবেল তিনি গভীরভাবে পাঠ করেন নাই, খ্রীষ্ট-ধর্মের মর্মমূলে তিনি কখনো প্রবেশ করিবার প্রয়াস পান নাই, কোরাণ তো তিনি স্পর্শই করেন নাই। সেই কারণেই তিনি ব্রাহ্মধর্মকে বিশ্বজনীন ধর্মের স্তরে উন্নীত করিবার কথা কখনো চিন্তা করেন নাই। ইহা করিবার জন্যই সেদিন প্রয়োজন হইয়াছিল কেশবচন্দ্রের মত একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির। ১৮৬৬-র পর হইতে তাই আমরা দেখিতে পাই যে ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের আর বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না, এখন হইতে কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়াই সমাজের ইতিহাস আবর্তিত হইতে থাকিল।

কেশবচন্দ্র এইবার স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে নামিলেন।

প্রায় ছয় বৎসরকাল দেবেন্দ্রনাথের সহিত একযোগে কর্ম করিয়া এইবার তিনি তাঁহার আদর্শকে রূপ দিতে চাহিলেন। সকল ধর্মের মধ্যেই সত্য আছে—এই ভাবধারাকে তিনি রূপান্তরিত করিয়া বলিতে চাহিলেন—সকল ধর্মই সত্য এবং এই বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি সার্বভৌমিক ধর্ম এবং একটি বিশুদ্ধ ধর্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার কার্যে তাঁহার সমস্ত প্রতিভা ও শ্রম নিয়োগ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্রাধিক স্নেহের পাত্র কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন—উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি যদি সেদিন এইভাবে বাহির হইয়া না আসিতেন, তাহা হইলে রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক অনুষ্ঠান হইয়াই থাকিত—সমাজের বৃহত্তর জীবনকে ইহা কোনোদিনই হয়তো স্পর্শ করিতে পারিত না। ছত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভা ইহার পশ্চাতে বিশ বৎসরের অধিককাল নিয়োজিত থাকিয়াও ইহাকে বেশি দূর অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। ইতিহাসচেতনায় উদ্বুদ্ধ কেশবচন্দ্র সেদিন শুধু আন্তরিক

ধর্মবিশ্বাস আর কয়েকজন আদর্শনিষ্ঠ যুবককে সম্বল করিয়া এক অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে প্রবীণদের মধ্যে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা শিবচন্দ্র দেব সেদিন কেশবচন্দ্রের এই উদ্যমের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। তিনি চিরদিনই উন্নত ও উদার মতের পক্ষপাতী ছিলেন। সেদিন কেশবচন্দ্র যদি এইরূপ সাহসের কার্যে ব্রতী না হইতেন, তাহা হইলে যেখানকার সমাজ সেইখানেই পড়িয়া থাকিত। কেশবচন্দ্রের প্রকৃত মহত্ত্ব ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। সেদিন তাঁহার কী ছিল? দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় তিনি ধনবলে বা জনবলে বলীয়ান ছিলেন না; কলিকাতা সমাজ (আদি ব্রাহ্মসমাজ) হইতে যখন তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিলেন, তখন অনেকেই ভাবিয়াছিলেন —কেশবচন্দ্র বুঝি শেষ হইয়া গেলেন। কিন্তু ধর্মরাজ্যে চিরকাল বিশ্বাসেরই জয় দেখা গিয়াছে। কেশব যে সামান্য ব্যক্তি নহেন, তাহা অল্পকাল মধ্যেই সকলে বুঝিতে পারিলেন। দেখিতে পাই, আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে কেশবচন্দ্র যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার হাতে রহিয়াছে দুইখানি কাগজ—'ধর্মতত্ত্ব' ও 'ইণ্ডিয়ান মিরার', আর 'কলিকাতা কলেজের' কর্তৃত্ব। কাগজ আছে প্রেস নাই—প্রথমেই তিনি একটি মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবস্থা করিলেন। এ ছাড়া তাঁহার সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন অনুগত ধর্মবন্ধু। এই লইয়াই তিনি অবশেষে কত বড়ো একটি মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন, এইবার আমরা কেশবচন্দ্রের জীবনের সেই কাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অব্যবহিত পরে কেশবচন্দ্রের বিবিধ কর্মপ্রয়াসের মধ্যে সর্বাগ্রে 'ব্রাহ্মিকাসমাজে'র কথা উল্লেখ করিতে হয়। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে ইহাই প্রথম মহিলা প্রতিষ্ঠান। ইহার আরম্ভ সামান্যভাবেই পটলডাঙায় কিশোরীলাল মৈত্রের একটি ভাড়াটে বাড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এই ব্রাহ্মিকাসমাজ হইতেই দেশে একাধিক মহিলা সমিতির আবির্ভাব হয়। এই সভার প্রথম অধিবেশনে ঈশ্বরকে দেখা সম্পর্কে কেশবচন্দ্র একটি বক্তৃতা করেন; পরে বহু বিশিষ্ট

ব্যক্তি এই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেইসব বক্তৃতার বিবরণ 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৬৫। অক্টোবর মাস।

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হইলেন। সঙ্গে ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত। ঢাকা হইতে তিনি ফরিদপুর ও মৈমনসিংহ গিয়াছিলেন। ঢাকায় তখন তিনটি সমাজ ছিল—ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ, লালবাগ ব্রাহ্মসমাজ ও বাংলাবাজার ব্রাহ্মসমাজ। এই তিন সমাজেই তিনি উপদেশ দান ও ধর্মালোচনা করিলেন। তখনো ঢাকা সহরে রীতিমত ব্রাহ্মমণ্ডলী সংগঠিত হয় নাই, সমাজে লোকসমাগম হইত বটে, কিন্তু দৈনিক উপাসনা করেন, এমন লোক বিরল ছিল। কেশবচন্দ্র ঢাকায় একমাস কাল অবস্থান করিয়া এখানকার স্থানীয় লোকদের জীবনে এক নূতন আধ্যাত্মিক প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। এইখানে তিনি ইংরেজিতে কয়েকটি বক্তৃতাও করেন। "নগরের কৃতবিদ্য য়ুরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোক সকল বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত ও মুগ্ধ হন।...ঢাকা কলেজের তদানীন্তন ধর্মানুরাগী অধ্যক্ষ ব্রেণেণ্ড সাহেব আচার্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন।" এইখানেই তিনি দুইদিন সর্বপ্রথম বাংলায় মৌখিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন; বক্তৃতার বিষয় ছিল—'ব্রাহ্মধর্মের উদারতা' ও 'ব্রাহ্মধর্মের আধ্যাত্মিকতা'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে কেশবচন্দ্রের প্রসিদ্ধ *True Faith* পুস্তিকখানি নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে বিরচিত হয়। আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও এবং প্রধানতঃ প্রচারকদের নির্দেশ দিবার উদ্দেশ্যে বিরচিত হইলেও ইহাতে কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীরতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মিস কলেট এই পুস্তিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "It resembles the mediaeval mystics in its beatific vision of God," কেশবচন্দ্রের *True faith*-এর ভাব এবং ভাষা আমাদিগকে টমাস কেম্পিসের প্রসিদ্ধ 'ইমিটেশন অব ক্রাইষ্ট' বইখানির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ইহার পর কেশবচন্দ্র আরো দুইবার ঢাকায় গিয়াছিলেন—১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ও ডিসেম্বর মাসে। ইহাই পূর্ববঙ্গে তাঁহার শেষ প্রচার-যাত্রা। তাঁহার তৃতীয়বার ঢাকা আগমনের সময়েই এখানে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময়ে কেশবচন্দ্রের যে দুইজন সঙ্গী ছিলেন, প্রসঙ্গতঃ সেই সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্বন্ধে দুই-একটি কথা এইখানে বলিব। অঘোরনাথ ঢাকায় কিছুকাল ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহার চরিত্রের প্রভাব ও সদ্দৃষ্টান্তে অনেকের অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে তিনি বৈরাগ্যের এক উজ্জ্বল এবং জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। আর বিজয়কৃষ্ণ প্রেম ও ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে অপূর্ব ভক্তির উচ্ছ্বাস আনিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে অঘোরনাথ ও বিজয়কৃষ্ণের মতন আত্মসমর্পিত-চিত্ত নিষ্ঠাবান প্রচারক সেদিন আর তৃতীয় কেহ ছিলেন না; ইঁহাদের উভয়ের চরিত্রের দৃঢ়তার কথা ভাবিলে অবাক হইতে হয়; ইঁহাদের ঈশ্বরানুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, এ-জগতের কোনো বাধাই তাঁহাদিগকে কর্তব্যপথ হইতে চ্যুত করিতে পারে নাই। ইঁহাদের বিশ্বাসও ছিল জ্বলন্ত। সাধনাও সেইরূপই গভীর ছিল। সেদিন কেশবচন্দ্রের প্রচারব্রতে অঘোরনাথ ও বিজয়কৃষ্ণই ছিলেন তাঁহার দক্ষিণ ও বাম হস্তস্বরূপ। সে-ইতিহাস কোনো দিনই মুছিবার নহে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত আদর্শগত মতভেদ দেখা দিবার পর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর পর্যন্ত কেশবচন্দ্র এই সমাজের মধ্যে থাকিয়াই কাজ করিয়াছেন; বাধা যে পান নাই, তাহা নহে—তবে বাধা-প্রতিবন্ধকের ভিতর দিয়াই তিনি সমান উৎসাহে চারিদিকে ধর্মপ্রচার ও মণ্ডলীবন্ধন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মতান্তর মনান্তরে পরিণত হয় নাই—এক মন, এক চিন্তা লইয়াই তিনি প্রতিনিধিসভার ভিতর দিয়া সমাজকে অগ্রগতির পথে লইয়া গিয়াছিলেন। তখনো প্রচারকার্যের সকল দায়িত্ব তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। প্রতিনিধিসভা স্থাপিত হইবার পর দেখা গেল যে, "দুই-একটি সমাজ ছাড়া আর সকলেই প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন, সকল সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রস্তুত হইতেছে, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কতকগুলি উৎকৃষ্ট উপায় অবধারিত হইয়াছে এবং কতক পরিমাণে কার্যে পরিণত হইয়াছে; একটি উপযুক্ত প্রচারমণ্ডলী সংসৃষ্ট হইয়াছে, এবং বঙ্গদেশের নানা প্রদেশে তাঁহাদের

প্রচারকার্য বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।" তখন ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক প্রচারক ছিলেন এই সাতজন : কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ, উমানাথ, মহেন্দ্রনাথ, অন্নদাপ্রসাদ ও যদুনাথ।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ব্রাহ্মসমাজের যে ৩৬তম বাৎসরিক উৎসব হইল কেশবচন্দ্র তাহাতে যথারীতি যোগদান করিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজে ইহাই তাঁহার শেষ মাঘোৎসব। এই উৎসবে ব্রাহ্মিকাগণকে লইয়া ব্রাহ্মিকাসমাজের উৎসব একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। "এই সাম্বাৎসরিকে কেশবচন্দ্র বিবেক ও বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ দেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে এই তাঁহার শেষ উপদেশ। দক্ষিণভারতে প্রচারকার্য যাহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলিতে পারে সেইজন্য আটমাস পূর্বে কেশবচন্দ্র একজন যোগ্য ব্যক্তিকে কলিকাতায় আনিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্মের মূলতত্ত্বাদি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নাম শ্রীধরস্বামী নাইডু। ৭ই ফেব্রুয়ারি এক বিশেষ সভায় এই নবীন প্রচারককে প্রচার বিষয়ে উৎসাহ ও উপদেশাদি দিয়া তাহাকে তিনি প্রচারব্রতে দীক্ষা দিলেন এবং মাদ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। দক্ষিণভারতে ব্রাহ্মসমাজের সংগঠন ও বিস্তারের ইতিহাসে এই শ্রীধরস্বামীর দান অসামান্য। কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য দুর্গ মাদ্রাজে ইনি ব্রাহ্মধর্মের উদার ও সার্বভৌম আদর্শ অক্লান্তভাবে প্রচার করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। এমনি করিয়াই কেশবচন্দ্র প্রচারকদের হৃদয়ে প্রচারের স্পৃহা উদ্দীপ্ত করিতেন। পরবর্তী কালে শ্রীধরস্বামীর দৃষ্টান্তে বোম্বাই, পাঞ্জাব এবং অন্যান্য দেশ হইতে অনেক উৎসাহী ধর্মানুরাগী ব্যক্তি প্রচারব্রতে জীবন সমর্পণ করিয়া দিকে দিকে ব্রাহ্মসমাজের পতাকাকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বিশ বৎসর যাবৎ বেতনভোগী প্রচারক রাখিয়া দেবেন্দ্রনাথ যাহা করিতে পারেন নাই, ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিবার পর মাত্র চার বৎসরের মধ্যে কেশবচন্দ্র তাহাই করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি তো ইচ্ছা করিলে মহর্ষির স্নেহচ্ছায়াতলে বসিয়া আচার্যের গৌরব লইয়া নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে জীবন যাপন করিতে পারিতেন ; কিন্তু তাঁহার জীবনের 'মিশন' যে ছিল স্বতন্ত্র—পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ প্রভৃতি দূর করিয়া চারিদিকে বিশ্বাস, প্রেম ও আনন্দ ছড়াইতে হইবে, ধর্মকে উপাসনার গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ না রাখিয়া উহাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিকশিত করিয়া তুলিয়া

সর্বভারতীয় ঐক্যচেতনায় সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার দায় ও দায়িত্ব সেদিন কেশবচন্দ্রেরই ছিল।

ইতিপূর্বে যে ব্রাহ্মিকাসমাজের কথা বলিয়াছি, উহা কেশবচন্দ্রের কর্ম-জীবনের ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি প্রধান ঘটনা। রামমোহনের যুগ হইতে এদেশে সমাজে নারী উপেক্ষিতা হইয়া আসিতেছে। কেশবচন্দ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মানুষ ; সুতরাং যুগচেতনা তাঁহার চিন্তায় ও কর্মে যে প্রতিফলিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। যে সময়ে এই ব্রাহ্মিকাসমাজ স্থাপিত হয় তখন নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাংলাসাহিত্যে এবং বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যে সবেমাত্র দেখা দিয়াছে। নারীত্বের উন্নতিবিধায়ক উনিশ শতকের যাবতীয় উদ্যমকে সমশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। সতীদাহ নিবারণ হইতে বিধবাবিবাহ আইন—সবই এক সুরের পুনর্বিন্যাস। উনিশ শতকের জাগ্রত বাংলার পারিবারিক জীবনের প্রতি আমরা যদি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে নারীর পূর্ব মহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে যুগসচেতন কবি মাইকেল নারীত্বের প্রতি নবজাগ্রত শ্রদ্ধাবোধকে বাঙালির সম্মুখে নূতন করিয়া তুলিয়া ধরিলেন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে। ঠিক সেই সময়েই কেশবচন্দ্র হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, "ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা এতদিন পর্যন্ত দেশোন্নতির যাহা কিছু চেষ্টা হইয়াছে, তন্মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি প্রায় লক্ষিত হয় না। উপাসনামন্দির স্থাপন, কি ব্রহ্মবিদ্যালয়, কি সঙ্গত, স্ত্রীলোকদিগের জন্য এতন্মধ্যে কিছুই সংস্থাপিত হয় নাই। যে দেশে স্ত্রীলোকদিগের অনুন্নতি, সে দেশের কখনো মঙ্গল নাই।" সেইজন্যই তিনি ব্রাহ্মিকাসভায় মেয়েদের শুধু উপদেশই দিতেন না, য়ুরোপীয় মহিলা দ্বারা তাহাদিগকে ভূগোল, গণিত ও শিল্প বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা পর্যন্ত করিয়াছিলেন। সেই একই সঙ্গে দেখিতে পাই যে কেশবচন্দ্র "সাধারণ বিদ্যালয়ে উপদেশ ও জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বালক-দিগের হৃদয়ে ধর্মভাব" জাগ্রত করিয়া তুলিবার কথাও চিন্তা করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, আজ যাহারা বালক আছে, যাহারা এখন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতেছে, ভবিষ্যতে তাহারাই পরিবার ও দেশোন্নতির ভার গ্রহণ করিবে। তাঁহার কর্মজীবনের অন্যতম কীর্তি 'কলিকাতা কলেজ' এই

উদ্দেশ্য লইয়াই স্থাপিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের ধর্মপ্রচারের মধ্যে কত বড়ো সংগঠনমূলক আদর্শ কার্য করিত, তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়।

১৮৬৬। মে মাস।

আর. স্কট মন্‌ক্রীথ নামে এক স্কটল্যাণ্ডীয় বণিক ভারতীয়দের চরিত্রের নিন্দা করিয়া একটি বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতায় ভারতের স্ত্রীজাতির প্রতিও কটাক্ষ ছিল। সেকালের যুগ হইতে বিদেশী কর্তৃক ভারতবাসীর চরিত্রের উপর যে কুৎসালেপন চলিয়া আসিতেছে, উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকেও তাহার জের চলিয়াছে—বিংশ শতকেও চলিয়াছে। মন্‌ক্রীথ সাহেবের বক্তৃতায় দেশীয়গণ স্বভাবতঃ উত্তেজিত হইলেন। কিন্তু ইহার জবাব দিবে কে? জাতির সম্মান রক্ষা করিবার জন্য তখন অগ্রসর হইলেন কেশবচন্দ্র। কলিকাতার মেডিকেল কলেজে তিনি *Jesus Christ: Europe and Asia* শীর্ষক একটি বক্তৃতা দিলেন ৫ই মে তারিখে। এই প্রসঙ্গে 'আচার্য কেশবচন্দ্র' পুস্তকে লিখিত হইয়াছে: "মন্‌ক্রীথ যে প্রকার কুরুচি প্রদর্শন করিয়া দেশীয়গণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়াও, এমনই ভাবে উভয় জাতির চরিত্র বর্ণন করিয়াছিলেন যে, তাহা পাঠ করিয়া উভয় জাতির মনে সাম্যভাব উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারেন না।" এই বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র য়ুরোপ ও এশিয়া দুই দেশের দুই জাতির চরিত্রের দোষ একত্র উপস্থিত করিয়া বিশ্লেষণ করেন। গভর্ণর-জেনারেল লর্ড লরেন্স এই বক্তৃতার বিবরণ পাঠ করিয়াই কেশবচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতাটি প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মদিগের মনঃপূত হয় নাই, কারণ ইহাতে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল। বিরোধিদল ইহা কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহর্ষির কানে দিলেন—কেশববাবু তো খ্রীষ্টান হইবেন মনে হইতেছে, অতএব উঁহাকে আর ব্রাহ্মসমাজে রাখিয়া লাভ কি? কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত ছিল, প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মগণের পক্ষে উহা বরদাস্ত করা কঠিন ছিল

এবং ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে—"আজ পর্যন্ত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যে সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াও ছিন্ন হয় নাই, এখন সম্যক প্রকারে সেই সম্বন্ধ ছিন্ন হইবার সময় উপস্থিত হইল।" আবার সেই কথাই বলিতে হয়—"এই সম্বন্ধচ্ছেদনের মধ্যে বিধাতার হস্ত বিদ্যমান। আর অধিকদিন একত্রে থাকিলে ধর্মের নবীন স্ফূর্তিলাভ পদে পদে অবরুদ্ধ হইত।" প্রাচীনেরা বুঝিলেন না যে, ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায় খ্রীষ্টের প্রতি একান্ত ভক্তিমান ছিলেন, কলিকাতায় ও ইংলণ্ডে তিনি একেশ্বরবাদী একাধিক গীর্জায় উপাসনা পর্যন্ত করিয়াছেন; আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই রাম-মোহনেরই প্রচারিত ধর্মের অনুসরণ করিয়াও মহর্ষির নেতৃত্বে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ এ-বিষয়ে রাজার বিপরীত মত পোষণ করিয়া অনেকটা খ্রীষ্ট-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই জন্যই কি কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতার পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মন্তব্য করা হইল: "আক্ষেপের বিষয় এই যে, সম্প্রতি এখানকার কেহ ক্রাইষ্টের প্রতি নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। ক্রাইষ্টের যেরূপ চরিত্র প্রসিদ্ধ আছে, বোধহয় সেইরূপ চরিত্র ইঁহারা ভালবাসেন বলিয়া ক্রাইষ্টের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছেন।"

আসল কথা, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সকল মহচ্চরিত্র লইয়াই কেশবচন্দ্র আলোচনা করিয়াছেন, কেবলমাত্র খ্রীষ্টকে লইয়া নহে। এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে কেশবচন্দ্র আর একটি বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার বিষয়: "Great men" এবং তাঁহার টাউনহলের এই বক্তৃতাটির মধ্যেই আমরা পরবর্তী কালের 'সাধুসমাগম' পুস্তকের পূর্বাভাস পাই। কেশবচন্দ্র অবতার-বাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু তিনি ইতিহাসের মহৎ মানুষদের (অর্থাৎ মানবসভ্যতার ইতিহাসে যাঁহাদিগকে 'Representative man' বলা হইয়া থাকে) মহত্ত্বে আস্থাবান ছিলেন। তাইতো তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন: "It is the aristocracy of great men that governs the world." কেশবচন্দ্রের মতে মহৎ মানুষই ইতিহাসের প্রতিনিধিস্থানীয় মানুষ। ইঁহাদের চরিত্রের মধ্যে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন স্বার্থশূন্যতা, জ্ঞানের মৌলিকতা এবং অপরাজেয় ক্ষমতা। ইতিহাসের প্রকৃত 'হিরো' তো ইঁহারাই। মহৎ মানুষ তৈরি হয় না—ইঁহারা বিধাতার সৃষ্টি, যুগের প্রয়োজনেই ইঁহাদের

আবির্ভাব এবং পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির মধ্যেই ইতিহাসের মহৎ মানবের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে; চৈতন্য, যীশু, মহম্মদ—সকলকেই কেশবচন্দ্র ইতিহাসের প্রতিনিধিস্থানীয় মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছেন, অবতার বলিয়া পূজা করেন নাই। তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত তাৎপর্য সেদিন অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই; তাই তাঁহার এই 'গ্রেট মেন' বক্তৃতাটিতে অভিসন্ধি আরোপ করিয়া বলা হইয়াছিল যে, কেশবচন্দ্র বুঝি স্বয়ং এইবার নিজেকে একজন 'প্রফেট' বা অবতারকল্প পুরুষ বলিয়া জাহির করিতেছেন। কিন্তু তিনি কখনো তাহা করেন নাই। এইখানেই তাঁহার মহত্ত্ব।

॥ এগারো ॥

"সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।"

"Truth is not the slave of wealth, it is not the slave of even the emperors, Truth is Brahmoism."

এই মূলমন্ত্র দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়া কেশবচন্দ্র স্বাধীনভাবে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কেশবচন্দ্রের সমগ্র জীবনেতিহাস, তাঁহার প্রত্যেকটি কার্য ও চিন্তা ইহাই প্রমাণ করে যে, তিনি "কখন কোন কার্য ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন করিতেন না।" আমরা দেখিয়াছি, মহর্ষি তথা কলিকাতা সমাজের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদের ব্যাপার এক মাস নহে, দুই মাস নহে, দীর্ঘ দুই বৎসরকাল যাবৎ চলিয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে "সকল ব্রাহ্মের মন যেমন এসময়ে উত্তেজিত অবস্থা ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে তিনি অতি প্রথমেই নূতন সমাজ গঠন করিতে পারিতেন।" কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই; তিনি অব্যগ্রচিত্তে ঈশ্বরনির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছেন, প্রবীণ এবং প্রাচীনপন্থী সমাজীদের শুভবুদ্ধির নিকট বারবার আবেদন জানাইয়াছেন, মহর্ষির সহিত একত্রে থাকিবার যত্ন পর্যন্ত বারবার করিয়াছেন। বিচ্ছেদের সূচনা হইতে একটি নূতন সমাজগঠনের প্রস্তুতিপর্ব চলিয়াছে দুই বৎসর। তারপর যখন বুঝিলেন সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি "ব্রাহ্মসাধারণকে নূতন সমাজের পত্তন দেওয়ার জন্য আহ্বান করিলেন। সে আহ্বান সকলের প্রাণে সাড়া তুলিল" এবং তারপর ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলার মাটিতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (*The Brahmo Samaj of India*) স্থাপিত হইল।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই ঘটনাটির তারিখ ছিল ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর অর্থাৎ রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সাঁইত্রিশ বৎসর পরে। বাংলার উর্বর মাটিতে সেই যুগমানব একদা বিশ্বজনীন এক নূতন ধর্মের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, চৌদ্দ বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীয় প্রতিভাবারি সিঞ্চনে সেই বীজকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেন, কালে সেই বীজ অঙ্কুরিত

হইল। তারপর তাহাকেই ইহার ইতিহাস-নির্দিষ্ট পরিণতির পথে লইয়া যাইবার জন্য কেশবচন্দ্র আজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেদিন, ১১ই নভেম্বরের সন্ধ্যায়, নবসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র যখন বলিলেন: "We have met here to discharge a most important duty, which we owe to ourselves, to our Church, and to India ···May God enable us to achieve it." কেশবচন্দ্রের এই উক্তির মধ্যে দুইটি কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়—*to India* আর *God*; স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে, রামমোহন-স্থাপিত ও দেবেন্দ্রনাথ-পরিচালিত ব্রাহ্ম-সমাজের এই যে পরিবর্তন, এই যে নূতন ও পৃথক সমাজ স্থাপনের প্রয়াস—ইহার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন প্রশ্ন ছিল না (কোন কোন লেখক যাহার ইঙ্গিত করিয়া থাকেন), ভারতবর্ষের কল্যাণসাধনই ছিল ইহার লক্ষ্য আর একমাত্র ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখিয়াই কেশবচন্দ্র এই মহৎ কার্য সাধনে সেদিন অগ্রসর হইয়াছিলেন। স্বীয় অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টিবলে কেশবচন্দ্র সমগ্র ভারতের ঐক্য সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইয়াছিলেন। তখন রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ভারতের শুধু ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চল-সমূহের ঐক্যের কথা চিন্তা করিয়াছিল, কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র সমগ্র ভারতের ঐক্য চিন্তাকে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' এই কথাটির মধ্যে রূপ দিতে চাহিলেন।

এই প্রসঙ্গে ম্যাক্সমুলারের একটি মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ নির্ণয় করিয়া পরবর্তীকালে (১৮৮৪খ্রীঃ) তিনি লিখিয়াছিলেন: "So far I can judge, Debendranath and his friends were averse to unnecessary innovations and afraid of anything likely to wound the national feelings of thc great man of the people. They wanted before all to retain the national character of their religion." ম্যাক্সমুলার উল্লিখিত ব্রাহ্মধর্মের এই 'national character' বলিতে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুবর্তীগণ হিন্দুধর্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকাকেই বুঝিতেন। দেবেন্দ্রনাথের পর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি হইয়াছিলেন

রাজনারায়ণ বসু এবং তিনিও ঐ একই আদর্শদ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া ইঁহারা ব্রাহ্মধর্মের সর্বজনীনভাব সম্পর্কে যে ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে আর যাহাই থাকুক রামমোহনের আদর্শ যে ছিল না, ইহা বলাই বাহুল্য। দৃষ্টিভঙ্গির এই মূলগত প্রভেদ হইতেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ মুখে *universal* বলিলেও, কার্যতঃ হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্র স্পর্শ করেন নাই; ইঁহারা কখনো অন্যান্য ধর্মের শাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহে তৎপর হন নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার পূর্বে কেশবচন্দ্রই সর্বপ্রথম এমন একখানি গ্রন্থসংকলনের জন্য প্রয়াস পাইলেন "যে গ্রন্থে সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের সকল শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত সত্য একত্র নিবদ্ধ থাকিবে।" এই সময়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন আর একটি প্রতিভা। ইনি উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়। আর্যশাস্ত্রে পারদর্শী, মহাজ্ঞানী ও যোগী উপাধ্যায় মহাশয়ই কেশবচন্দ্র-পরিকল্পিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ (motto) রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। সেই আদর্শ এই শ্লোকটিতে ব্যক্ত হইয়াছে:

> সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
> চেতঃ সুনির্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
> বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
> স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যাং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

রামমোহন বাঁচিয়া থাকিলে আজ দেখিতে পাইতেন যে, বিশ্বজনীন একটি ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার যে বিরাট পরিকল্পনা ছিল, তাহা এই শ্লোকটিতে কী যথার্থভাবেই না অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই 'মটো'ই 'শ্লোক সংগ্রহ' পুস্তকের সর্বপ্রথমে স্থান পাইয়াছে; 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার শিরোনামায়ও ইহা মুদ্রিত হইত। সর্বশাস্ত্রের সার সত্য সংকলন করিবার উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র তাঁহার অনুগামী চারজন বন্ধুকে নিয়োগ করেন। মহেন্দ্রনাথ বসু খ্রীষ্টশাস্ত্রের, অঘোরনাথ ও গৌরগোবিন্দ হিন্দুশাস্ত্রের এবং অমৃতলাল বসু কোরাণের প্রবচন সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন, আর তিনি স্বয়ং পারসিক ধর্মশাস্ত্রের প্রবচনগুলি সংকলন করেন। ইহাই ছিল তাঁহার কার্যপদ্ধতি।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সুপরিচিত; সুতরাং এখানে আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিব না। কুতূহলী পাঠক ইহার সবিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থখানি পড়িতে পারেন। এইখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাথমিক উদ্বোধন করিয়া কেশবচন্দ্র যখন প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলিলেন—"যাঁহারা ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিজ মঙ্গল-সাধন এবং ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রচারোদ্দেশ্যে তাঁহারা 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে সমাজবদ্ধ হউন", তখন সকলেই একবাক্যে ইহা সমর্থন করেন। দশদিন পূর্বে 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' এই সভার একটি বিজ্ঞাপন বাহির হয় এবং ১১ই নভেম্বর সভার দিন দুইশতাধিক উৎসাহী ব্রাহ্মগণ হাঁটু পর্যন্ত জল ভাঙিয়া গিয়া সভায় উপস্থিত হন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন, উমানাথ গুপ্ত (ইনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন), প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, হরনাথ রায়, নবগোপাল মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু ও কান্তিচন্দ্র মিত্র। এই সভাতেই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছিলেন: "আমরা যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-বদ্ধ হইতেছি তখন কোন ধর্মকে, কোন শাস্ত্রকে বা কোন ব্যক্তিকে আমাদের সমাজের বাহিরে রাখিতে পারি না।" সর্বশেষে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারের জন্য তাঁহার জীবনব্যাপী যত্ন, একাগ্রতা ও ধর্মানুরাগের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কৃতজ্ঞতাসূচক একখানি অভিনন্দন পত্র দিবার প্রস্তাব করা হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাহার ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হইল।

কেশবচন্দ্রের ধর্মমত এক বিবর্তনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। রাম-মোহনের ব্রাহ্মধর্মকে তিনি হিন্দুত্বের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে আনিয়া সকল দেশের সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের উপযোগী প্রগতিশীল এক বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণত করিতে চাহিলেন। সেই যে জীবনের আরম্ভে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মানবসভ্যতার নিয়তি হইতেছে এক ঈশ্বর, এক সত্য ও এক সমাজের পথে অগ্রসর হওয়া, সেই কল্পনাকে আজ তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে রূপায়িত করিতে চাহিলেন। তিনি এই নূতন

সমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন, কোনো ব্যক্তিবিশেষ এই নূতন সমাজের সভাপতি ছিলেন না। কথিত আছে, কেশবচন্দ্র বলিতেন—স্বয়ং ঈশ্বর ইহার সভাপতি। তিনি ছিলেন ইহার সম্পাদক আর প্রতাপচন্দ্র ও উমানাথ গুপ্ত ছিলেন সহকারী সম্পাদক। "সকল জাতির ধর্মগ্রন্থ হইতে সত্য ও বাণী সংকলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের ধর্মোপদেশের অন্তর্ভূত হইল। এই প্রথমবার বিধিমত বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবেস্ত এবং হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংকলিত ও উদ্ধৃত বাণী সমভাবে ব্রাহ্মধর্মের শাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইল।" কেশবচন্দ্রের নেতৃত্ব ও প্রেরণা ব্রাহ্মসমাজকে আজ যেন তাহার নিয়তিনির্দিষ্ট পরিণতি দান করিল।

অনেকেরই ধারণা যে, কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি মহর্ষি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ ধারণা নিতান্তই ভুল। কেশবচন্দ্রের জীবনেতিহাস যাঁহারা গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার সমগ্র রচনা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ব্রাহ্মসমাজ বা দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিবার বহু পূর্বেই কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবন শুরু হইয়া গিয়াছে। অন্য যুক্তি দূরে থাকুক, কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ' গ্রন্থই ইহার অভ্রান্ত সাক্ষ্য বহন করে। ধর্মজীবনের উষাকালে, যখন তিনি কোনো ধর্মসমাজে সভ্যরূপে যোগদান করেন নাই, আমরা দেখিতে পাই তখনই কেশবচন্দ্র প্রার্থনার ভিতর দিয়া ধর্মকে পাইয়াছেন। প্রার্থনাই কেশবচন্দ্রের গুরু—ইহা তিনি নিজে বলিয়াছেন, অন্তরে অনুভব করিয়াছেন; তাইতো তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বারবার বলিয়াছেন—বেদবেদান্ত, কোরাণ পুরাণ অপেক্ষা প্রার্থনা শ্রেষ্ঠ। তিনি শুধু প্রার্থনা করিতেন না, প্রার্থনা করিয়া তিনি ঈশ্বরাদেশের জন্য অপেক্ষা করিতেন। প্রার্থনা এবং ঈশ্বরাদেশ—ইহাই ছিল কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবনের নিয়ামক, তাঁহার জীবনানুশীলনের সময় এই কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এইজন্যই তিনি নিজেকে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমতের ভিতর দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখিতে পারিলেন না। মহর্ষিদেবের সহিত যখন ধর্ম ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দেখা দিল এবং তিনি যখন বিবেকের সুস্পষ্ট বাণী কানে শুনিতে পাইলেন, ইতিহাসের ইঙ্গিত যখন তিনি ধরিতে পারিলেন, তখন কেশবচন্দ্র আর সুস্থির থাকিতে

পারিলেন না। ব্রাহ্মসমাজকে পারিবারিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যগ্র হইয়া এবং জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা ও সর্ববিধ সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিলেন।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধর্মানুরাগী তরুণদের লইয়া কেশবচন্দ্র স্বাধীন কর্মক্ষেত্র অবতীর্ণ হইলেন। সকলেই ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের অন্তরে সেদিন কেশবচন্দ্র যে উৎসাহের আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিলেন, ইঁহাদের প্রত্যেকের মনে বৈরাগ্য ও ধর্মপ্রচারের উৎসাহ তিনি যেভাবে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, আজ এই সুদূরকালের ব্যবধানে, আমাদের পক্ষে তাহা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। অল্পদিনের মধ্যেই সকলে দেখিতে পাইল যে কেশবচন্দ্র অসম্ভব সম্ভব করিয়াছেন। একে একে প্রচারকগণ প্রচারক্ষেত্রে নামিয়া গেলেন। গৌরগোবিন্দ, প্রতাপচন্দ্র, অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, অমৃতলাল, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রভৃতি কেশবচন্দ্রের ভবনে সমবেত হইতেন এবং "সকলেই প্রায় তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিয়া সদালাপ, সৎপ্রসঙ্গ ও উপাসনায় সময়ক্ষেপ করিতেন।" ইহাদের প্রত্যেকের "তখনকার বৈরাগ্য সাধনসাপেক্ষ ছিল না, আপনা-আপনি বিকশিত হইয়াছিল।...তখন এমনই প্রকৃত বৈরাগ্যের বায়ু বহিত যে, মহিলারাও কোন কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিতেন না; কষ্টতে ও দীনতাতে, অন্নহীনতা ও বস্ত্রহীনতাতে আনন্দ করিতেন, সর্বদাই প্রফুল্লচিত্তে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতেন।" ঈশ্বর-বিশ্বাস কতখানি গভীর হইলে, ধর্মবোধ কতখানি আন্তরিক হইলে, ইহা সম্ভব তাহা বস্তুতান্ত্রিকতায় পূর্ণ ভোগসর্বস্ব আজিকার এই পৃথিবীতে আমরা সহজে কল্পনা করিতে পারি না।

যে বৎসর কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় সেই বৎসরের শেষভাগে কলিকাতার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল মেরি কার্পেণ্টারের আগমন। জনহিতৈষিণী এই ইংরেজ মহিলা এ-দেশের স্ত্রীজাতির উন্নতির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। তখন মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বেথুন-বিদ্যাসাগরের মিলিত প্রয়াসের ফলে কলিকাতা তথা বাংলা দেশে এক নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে

কেশবচন্দ্রের উত্তম। কলিকাতায় আসিয়া কুমারী কার্পেণ্টার কেশবচন্দ্রকে তাঁহার একমাত্র বন্ধু ও সহায় পাইলেন। বেলভেডিয়ারে বড়লাটের প্রাসাদে তিনি অতিথি হইয়াছিলেন, "এবং সেই রাজভবন হইতে পদব্রজে সর্বদা তিনি কেশবচন্দ্রের কলুটোলার ভবনে যাতায়াত করিতেন। মিস কার্পেণ্টার কর্তৃক আন্দোলনের ফলস্বরূপ, পরসময়ে কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। এই বিদ্যালয় এদেশীয় স্ত্রীলোকগণের উচ্চতর শিক্ষার সূত্রপাত করে।" একদিন ব্রাহ্মিকাসমাজের পক্ষ হইতে মিস কার্পেণ্টারকে অভিনন্দিত করা হইল। আর একদিন ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তীর বাড়িতে কার্পেণ্টারের সম্মানে একটি সান্ধ্য সম্মেলন হইল। কেশবচন্দ্র কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু ও ব্রাহ্মিকাভগ্নীদের লইয়া এই সম্মেলনে যোগদান করেন।" এ দেশীয় অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের ইংরাজি 'ইভনিং পার্টিতে' গমন করার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। বাঙালির মেয়ে বন্ধন-মুক্তির পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হইল।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিবার আছে। পাশ্চাত্য প্রথার অনুসরণে অন্তঃপুরের মেয়েদের বাহিরে অবাধ মেলামেশার ভিতর দিয়া তাহাদিগকে রাতারাতি 'স্বাধীন জেনানায়' পরিণত করিবার পক্ষপাতী কেশবচন্দ্র আদৌ ছিলেন না। এই বিষয়ে তাঁহার অভিমত খুবই সুস্পষ্ট। স্ত্রীলোকদিগকে জোর করিয়া বা অনুরোধ করিয়া স্বাধীন করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। সেই সময়ে কলিকাতায় বহু ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে এই ফ্যাসান দাঁড়াইয়াছিল যে, বাড়ির মেয়েদের মেম সাজাইয়া, লাট-সাহেবের বাড়িতে সভাসমিতিতে লইয়া যাওয়া ও সেকহাণ্ড করানই বুঝি স্ত্রী-স্বাধীনতার নিদর্শন। এইরূপ অর্থহীন অনুকরণ কেশবচন্দ্র কোনোদিনই পছন্দ করিতেন না। তাই তিনি বলিতেন: "আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি যে, এরূপ করিলে স্ত্রী স্বাধীন হন না।...ভিতরে পরিবর্তন হইল না, অথচ অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিলে, এদেশীয় রমণীদিগকে স্বাধীনতা শিক্ষা দেওয়া হইবে না।...আমি আত্মার স্বাধীনতা, মনের স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতা জ্ঞান করি।" কেশবচন্দ্রের এই অভিমত আজিও তাহার মূল্য হারায় নাই।

"তোমরা যাও, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারিদিক হইতে প্রচার কর, দিকে দিকে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের আধিপত্য স্থাপন কর।"—এই প্রকার জ্বলন্ত উৎসাহের বাণী প্রচারকদের প্রত্যেকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া, সেদিন কেশবচন্দ্র কি ভাবে এই নূতন সমাজের প্রসারে ও বিস্তারে যত্নবান হইয়াছিলেন, সে কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিজয়কৃষ্ণ, যদুনাথ, অঘোরনাথ প্রমুখ "প্রচারকগণ এখন হইতে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা জ্বলন্ত-ভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব ত্যাগ কর, একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা কর, জাতিভেদ পরিহারপূর্বক মনুষ্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন কর, নিয়ত প্রার্থনা কর, সৎকার্য কর—ইহাই সকল উপদেশের সার ছিল।" বলা বাহুল্য, এই প্রচারকার্য নির্বিবাদে সম্ভবপর হয় নাই, বহুস্থানেই প্রচারকদিগকে নির্যাতনের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রচারকদের একটি দল গিয়াছিলেন পূর্ববঙ্গে আর স্বয়ং কেশবচন্দ্র, উমানাথ, অমৃতলাল, মহেন্দ্রনাথ ও প্রতাপচন্দ্রকে লইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাব গমন করেন। চারিদিকে উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সর্বত্রই ব্রাহ্ম আন্দোলন যেন একটি বাস্তব রূপ লইয়া নবজাগরণের ইতিহাসে নূতন তরঙ্গ তুলিল। এই সময়কার প্রচারযাত্রায় কেশবচন্দ্র ভাগলপুর, মুঙ্গের, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, কাণপুর, দিল্লী, লাহোর, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র যে সর্বত্র ধর্মের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন তাহা নহে, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কথাও বিশেষভাবে আলোচনা করিতেন। কেশবচন্দ্র সর্বত্রই ইংরেজিতে বক্তৃতা করিতেন এবং তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিবার জন্য লেফটেনাণ্ট-গভর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ রাজপুরুষরাও আসিতেন। কেশবচন্দ্রের জীবনেতিহাসে দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন অক্লান্ত বক্তা। ১৮৬৬-র শেষ ভাগ হইতে ১৮৬৭-র এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ—এই সময়ের মধ্যে তিনি চব্বিশটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে কী অক্লান্তকর্মা পুরুষ ছিলেন কেশবচন্দ্র।

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাই ছিল তখনকার দিনে শুনিবার জিনিস। রাম-

গোপাল ঘোষের পর বাঙালির মুখে ইংরেজি বক্তৃতা এমন আর কেহ কখনো শোনে নাই। এ দেশে মৌখিক বক্তৃতার (extempore speech) প্রবর্তক তিনিই। "It was Keshub Chandra Sen who first made use of the platform for public addresses and revealed the power of oratory over the Indian mind,—এই উক্তি আদৌ অত্যুক্তি নয়। তাঁহার আকৃতি যেমন ছিল রাজশ্রীমণ্ডিত, "কণ্ঠস্বর ছিল তেমনি গভীর, শক্তিসম্পন্ন অথচ সঙ্গীতের মতন মধুর।" ভারতের নব-জাগরণের সেই প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নকালে কেশবচন্দ্রের বাগ্মীতার স্ফুলিঙ্গ সত্যই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া, এক বিচিত্র উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। যে শুনিত সেই-ই মন্ত্রমুগ্ধের মতন হইয়া যাইত। ভাষা ও ভাবের সম্পদে, শব্দবিন্যাসে, বলিবার ভঙ্গিতে, প্রাঞ্জলতা ও লালিত্যে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ কেশবচন্দ্রের ইংরেজি বক্তৃতামালা আজো পৃথিবীর বিস্ময় হইয়া আছে এবং আজো ঐগুলি ইংরেজি সাহিত্যের পরম সম্পদ বলিয়া স্বীকৃত। সমকালীন বাংলার তরুণদের মনে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা কী গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা তাঁহার রাজনৈতিক মানসপুত্র স্যর সুরেন্দ্রনাথ স্বীয় আত্মজীবনী *A Nation in Making* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, আমেরিকার ড্যানিয়েল ওয়েবেষ্টার আর ইংলণ্ডের জন ব্রাইটের সমতুল্য বাগ্মী ছিলেন ভারতের কেশবচন্দ্র।

॥ বারো ॥

"জাগ্রত জীবন 'পরে জাগিল প্রভাত।"—সেদিন ইতিহাসের গতিপথেই ঠিক এমনই একটি নূতন প্রভাতের সূচনা করিয়া দিয়া, নবজাগ্রত বাংলার বুকে আবির্ভূত হইয়াছিল কেশবচন্দ্র সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। সেই প্রভাতের নূতন আলো গিয়া পড়িল আধুনিক ভারতবর্ষের মানসলোকে—নূতন সমাজবোধ, নূতন ধর্মচিন্তায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল নবীন ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল দিক দিয়াই সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষে এক নূতন যুগের সূচনা করিয়া দিয়াছিল—বাংলার সহিত বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের দূরবর্তী অঞ্চলের আত্মিক ঘনিষ্ঠতা উনিশ শতকের ইতিহাসে এই পর্ব হইতেই আরম্ভ। সেদিন সর্বভারতীয় নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন একটি মাত্র মানুষ। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। বাংলাকে কেন্দ্র করিয়া, তিনি সেদিন ভারতবর্ষের সকল দিকেই তাঁহার আহ্বান পাঠাইয়াছিলেন। একটি নিবিড় ঐক্যবোধের ভিতর দিয়া সমগ্র জাতিকে তিনি এইবার গড়িয়া তুলিতে অগ্রসর হইলেন। ইতিহাসে ইহাই ছিল সেদিন তাঁহার অন্যতম ভূমিকা। শূন্যগর্ভ উৎসাহ দ্বারা তিনি জাতিকে সঞ্জীবিত করেন নাই, বাক্যচ্ছটায় তাহার চিত্তকে তিনি বিমুগ্ধ করেন নাই, শৌখিন দেশহিতৈষী তিনি ছিলেন না, বা খ্যাতিপ্রয়াসী ধর্মসংস্কারকও তিনি ছিলেন না, অথবা বাহিরের কতকগুলি হিতকর অনুষ্ঠানে মত্ত হইয়া তিনি কখনো সাময়িক জৌলুষ সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পান নাই। তাঁহার পূর্ববর্তী মনীষিদের সহিত এইখানেই ছিল কেশবচন্দ্রের লক্ষণীয় পার্থক্য। তিনি বুঝিতেন মানুষ কাজে নয়, বিশ্বাসেই বাঁচিয়া থাকে। বিশ্বাসের বলেই সে অনন্ত উন্নতি ও বিস্তারের পথে অগ্রসর হয়। সমাজ-জীবনের চারিদিকে তীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কেশবচন্দ্র দেখিতে পাইলেন, জাতীয় চরিত্রের কোথায় ত্রুটি, কোথায় ইহার দুর্বলতা। রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজকে যদি তাহার নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিণতির পথে লইয়া যাইতে হয়, যদি ইহাকে জাতীয় জীবনের সহিত একীভূত করিতে হয়,

তাহা হইলে সর্বাগ্রে ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধন করিতে হয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল এইখানেই। শুষ্ক উপাসনা নয়, সপ্তাহে একবার মাত্র ব্রহ্মের স্মরণ করা নয়, জীবন্ত ভক্তি আর জ্বলন্ত বিশ্বাসেরই সেদিন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হইয়াছিল—জীবন্ত ঈশ্বরের ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই সমাজে এবং জীবনে—জীবনের প্রত্যেকটি চিন্তায় ও কার্যে, সেই বিশ্বাস ও ভক্তিকে মূর্ত করিয়া তুলিবারই প্রয়োজন সেদিন হইয়াছিল। কেবলমাত্র মতের কিম্বা অনুষ্ঠানের ধর্ম লইয়া তো জীবনের সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব নয়—প্রয়োজন জীবন্ত ভক্তির ধর্মের, জ্বলন্ত বিশ্বাসের ধর্মের। এই বিশ্বাস, এই ভক্তি দ্বারা পুরাতন ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক সংস্কার সাধন করিবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই সেদিন কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উনিশ শতকের নবজাগরণের ইতিহাসে ইহা একটি বড় রকমের পথচিহ্ন (landmark)—ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

১৮৬৮।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের তখনো পর্যন্ত নিজস্ব কোনো গৃহ ছিল না, মিলিত উপাসনার জন্যও কোনো স্থান ছিল না। সমাজ স্থাপিত হইয়া অবধি এখানে-ওখানে উপাসনা চলিয়া আসিতেছে, কখনো স্কুল বাড়িতে, কখনো ভাড়া-করা বাড়িতে, আবার কখনো বা কেশবচন্দ্রের কলুটোলার ভবনে। এইবার তিনি সমাজের একটি নিজস্ব গৃহের কথা চিন্তা করিলেন। পুরাতন সমাজগৃহে তাঁহারা উপাসনা করিবার অনুমতি প্রথমাবধিই পান নাই। সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, ইহার জন্য এখন গৃহ দরকার। কেশবচন্দ্রের প্রকৃতি এমনই ছিল যে কোনো কাজই তিনি অসমাপ্ত বা অর্ধসমাপ্ত রাখিতেন না। কিন্তু টাকা কোথায়? টাকা ছিল তাঁহার বিশ্বাসের তোষাখানায়। এই প্রসঙ্গে প্রতাপচন্দ্র সত্যই লিখিয়াছেন: "In every good or great work that had to be done, he drew from the treasury of his faith, and that was inexhaustible"—এই বিশ্বাসই ছিল কেশবচন্দ্রের জীবনের সঞ্চালক। 'জীবনবেদ' গ্রন্থে তিনি তাঁহার এই বিশ্বাসপরায়ণতার

স্বরূপ অতি সুন্দর ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাই হোক, নিরাশ্রয় ও গৃহ-হীন ভাবে বেশি দিন থাকা চলে না; তাই এই সময়েই আমরা দেখিতে পাই যে, কেশবচন্দ্র নিজের দায়িত্বে টাকা ধার করিয়া মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের উপর (বর্তমান নাম কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট) একখণ্ড জমি ক্রয় করিলেন। তারপর ব্রাহ্মসমাজের ৩৮তম সাম্বাৎসরিক দিবসে তিনি নূতন সমাজগৃহের ভিত্তিস্থাপন করেন। ইহার নাম দিলেন 'ব্রহ্মমন্দির'। এই ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে কলিকাতা শহরে একটি বিরাট নগর-সংকীর্তন বাহির হইয়াছিল। সেদিন ইহা একটি অকল্পিত ব্যাপার ছিল। ব্রাহ্মসমাজের নেতা, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন খোল করতাল মৃদঙ্গ বাজাইয়া, একদল উৎসাহী ব্রাহ্মদের লইয়া কীর্তনে মাতিবেন—উনবিংশ শতকের কলিকাতা শহরে কে-ই বা ইহা ধারণা করিতে পারিয়াছিল। তাই বুঝি এই নগরসংকীর্তন ব্যাপারটি সেদিন 'নেড়ানেড়ির কাণ্ড' বলিয়া উপহসিত হইয়াছিল।

কেশবচন্দ্রের জীবনের বহু স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে ইহা একটি। এই নগর-সংকীর্তন প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার 'আত্মচরিত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "আমি শাক্তবংশের ছেলে, বৈষ্ণবদের কীর্তনের প্রতি পূর্বাবধি অতিশয় অশ্রদ্ধা ছিল।...আমি ভাবিলাম উন্নতিশীল দল রাস্তাতে ঢলাঢলি করিতে যাইতেছে। এই ভাবিয়া বিরক্ত চিত্তে উন্নতিশীল দলের দিকে না গিয়া ১৮৬৮ সালের ১১ই মাঘের উপাসনাতে আদিসমাজের উপাসনাতে গেলাম। উপসনান্তে আদি সমাজের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছি, এমন সময়ে কয়েকজন বাবু আসিয়া বলিলেন—মহাশয়! দেখলেন না তো, কেশব সহর মাতিয়ে তুলেছেন। নগর-কীর্তনে হাস্যাস্পদ না হইয়া কৃতকার্য হইয়াছেন, এই কথাটা বড় নূতন লাগিল।" শুধু নূতন লাগা নয়। সেই নগরকীর্তনের গানটি যখন তরুণ শিবনাথ পাঠ করিলেন:

তোরা আয় রে ভাই, এতদিনে দুঃখের নিশি হইল অবসান—
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাতবিচার।

তখন, তিনি লিখিয়াছেন, "এই আহ্বানধ্বনি আমার প্রাণে বাজিল। আমার যেন মনে হইল আমাকে ডাকিতেছে। ইহাতে ব্রাহ্মধর্মের যে আদর্শ আমার নিকট ধরিল, তাহাতে আমার প্রাণ মুগ্ধ করিয়া ফেলিল।" তারপর তিনি চলিলেন সিন্দুরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বাড়িতে। সেখান হইতে কলুটোলায়। সেইখানে গিয়া তিনি দেখিলেন, "কেশববাবুরা সদলে সবে ফিরিয়া আসিয়া ভিক্ষার ঝুলিতে যে টাকা পাইয়াছেন তাহা গুণিতেছেন। আমার পুরাতন সহাধ্যায়ী বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সেই সঙ্গে আছেন। গোঁসাইজী আমাকে দেখিয়াই 'কি ভাই!' বলিয়া আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। সেই আমাকে উন্নতিশীল দলের সঙ্গে যেন বাঁধিয়া ফেলিলেন।"

ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্তন প্রবর্তনের গৌরব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রাপ্য। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন: "১৮৬৭ সালে গোঁসাইজী উদ্যোগী হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠকে ডাকিয়া আনিয়া উন্নতিশীল দলকে বৈষ্ণবসংকীর্তন শুনান। তদবধি সংকীর্তন প্রথা ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রবেশ করে।" সকালে নগর-সংকীর্তন হইল। তারপর সারাদিন গোপাল মল্লিকের সুসজ্জিত বাড়িতে উৎসব চলিল। বাড়ি সাজাইয়াছিলেন কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর নবীনচন্দ্র সেন। আহারের কথা কাহারো মনে নাই। কী এক আশ্চর্য ঐশী উদ্দীপনায় যেন সকলে মাতিয়াছেন—নূতন ব্রহ্মমন্দিরের পত্তন হইল, ইহাতেই সকলের আনন্দ। সন্ধ্যাবেলায় প্রার্থনার পর কেশবচন্দ্র বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার বিষয়—*Regenerating Faith*; কেশবচন্দ্রের জীবনব্যাপী বহু বক্তৃতার মধ্যে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা। সন্ধ্যাবেলা হইতেই সহস্র লোকের সমাগমে গৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাড়ির চারিদিকের বারান্দায় গায়ে গা দিয়া লোক দাঁড়াইয়া আছে। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে সেদিন ছিলেন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড লরেন্স, তাঁহার পত্নী ও দুই মেয়ে। এই লর্ড লরেন্সই ইতিপূর্বে কেশবচন্দ্রের খ্রীষ্ট বিষয়ে বক্তৃতার বিবরণ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সিমলা হইতে তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। গভর্ণর-জেনারেল ভিন্ন আরো বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্কটল্যাণ্ডের চ্যাপলেন

সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ নরম্যান ম্যাকলিয়ডও অন্যতম শ্রোতা হিসাবে সেদিন উপস্থিত ছিলেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে যখন বলিলেনঃ "Nothing short of a regenerating faith can satisfy the normal necessities of man...we want a *new life*—a life of divine holiness. This the world's religion cannot give"—তখন সকলেই বুঝিতে পারিল যে, সমগ্র মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতির পক্ষে এই নবজীবন কত প্রয়োজনীয়, এবং একমাত্র বিধি-নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসরণ করিয়াই এই নবজীবন লাভ সম্ভব। কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেনঃ "এরূপ উপদেশ আমি অল্পই শুনিয়াছি। ধর্মবিশ্বাস যদি নবজীবন না আনিয়া দেয় তবে তাহা ধর্মবিশ্বাস নয়, এই সত্য আমার সমক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য একটা নূতন দ্বার যেন খুলিয়া দিল।" দুঃখের এবং লজ্জার বিষয়, এই শিবনাথ শাস্ত্রীই পরবর্তীকালে কেশব-বিরোধী দলের নেতা হইয়াছিলেন।

আদি সমাজ হইতে কেশবচন্দ্র যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন, তখনকার অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ দেব ছিলেন একজন। তিনি তাঁহার 'অতীতের ব্রাহ্মসমাজ' গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ "যেমন দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হইতে লাগিল, ব্রহ্মানন্দের উপাসনার গভীরতা, মধুরতা ও আধ্যাত্মিকতার ভিতর প্রচারকগণ ও উপাসকমণ্ডলী এমনই মগ্ন হইতে লাগিলেন যে, তাঁহারা ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ রসপানের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মানন্দের মধ্যে অসাধারণ ব্রহ্মশক্তি যেমন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, তেমনি দলে দলে লোক সকল আসিয়া উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মানন্দের ঘরে ও বাহিরে স্থান নাই, সকলে ভিখারীর ন্যায় তাঁহার মুখের দুইটা কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে পথে ও তাঁহার কলুটোলার ত্রিতল গৃহের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। ব্রহ্মের জন্য মানবাত্মার ব্যাকুলতার কি দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না।"

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্য নিজস্ব একটি উপাসনামন্দির প্রয়োজন যখন সকলেই অনুভব করিলেন তখন এই নূতন সমাজের সংশ্লিষ্ট সকলেই

ভাবিলেন—টাকা কোথা হইতে আসিবে ? তাঁহাদের নেতা কেশবচন্দ্র তো দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত বিত্তবান্ নহেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়, এই মূল মন্ত্রই সেদিন ইঁহারা সকলেই দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন। তারপর "মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের উপর একখণ্ড জমি দেখা হইল। ঐ জমিটি সকলের পছন্দ হইল। সেই সময়ে উপাসকমণ্ডলীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছিল। সকলে প্রতিমাসে আংশিক রূপে এক এক মাসের উপার্জিত আয় দিতে স্বীকৃত হইলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে কিছু টাকা সংগৃহীত হইল। প্রথমে জমিটি ক্রয় করা হইল। উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা ধনী ছিলেন, তাঁহারা অধিক পরিমাণে অর্থ দিয়া দিয়া মন্দির নির্মাণের সাহায্য করিলেন। প্রথমে জমির উপর চন্দ্রাতপ খাটাইয়া ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং ভিত্তি স্থাপন করিলেন। পরে কর্মবীর প্রচারক অমৃতলাল বসু মহাশয় মন্দির নির্মাণের ভার গ্রহণ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা দ্বারা নির্মাণ কার্য সমাধা করিলেন।" এক বৎসরের মধ্যেই মন্দির নির্মাণের কার্য সমাধা হয়।

১৮৬৯। ২৩শে জানুয়ারি।

৩৯তম মাঘোৎসবের দিন। আজ নূতন সমাজের নিজস্ব মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হইবে। কেশবচন্দ্র স্বয়ং দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। প্রকৃতপক্ষে "১৮৬৯ সালের মাঘোৎসব ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের অসম্পূর্ণ বাড়িতে চাঁদোয়া খাটাইয়া সমাধা করা হয়। যুবক শিবনাথ সেদিন এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষে 'মন্দির' শীর্ষক একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণে সে সময়ে সত্যই এক আশ্চর্য ব্রহ্মশক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাই তাঁহার দৃষ্টিতে চূণ, কাঠ ও ইষ্টকের তৈরি সেই নবনির্মিত ভবন যথার্থই ব্রহ্মের মন্দির বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। সেই কবিতার প্রত্যেকটি লাইন সকলের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। কবিতার একটি স্তবক এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

তোমার আশ্রিত যারা,
কেন, হে মন্দির, তারা
প্রীতির আস্বাদ এত ! তাহাদিগে দেখিয়া
আনন্দ-রসেতে প্রাণ যায় কেন গলিয়া !

বাজাও বিজয়-তূরী
স্বর্গ মর্ত্য যায় পুরি,
মধুর দয়াল নাম বয়ে যাক পবনে ;
হেন শুভ সমাচার থাক্ প্রতি ভবনে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন যে একুশ জন যুবক কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণবিহারী সেন, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, রজনীনাথ রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বহু ভাষাবিদ্ এই কৃষ্ণবিহারী ছিলেন কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠের কর্মজীবনে তাঁহার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মহামতি অশোকের জীবনী মূল পালি ভাষা হইতে অনুবাদ করেন। মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের পরবর্তী বিবরণ গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: "দিবাকরের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্যূন তিনশত ব্রাহ্ম আচার্য কেশবচন্দ্রের বাসভবনের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে সমবেত হইলেন। সমবেতকণ্ঠে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'—উচ্চারিত হইয়া প্রার্থনা হইল। তারপর সঙ্গীতাচার্য নবরচিত সংকীর্তন ধরিলেন। সংকীর্তনের পর সংকীর্তনের দল বাহির হইল। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশস্থ মুসলমান ভ্রাতা এবং হিন্দু ভ্রাতৃদ্বয় 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'ব্রহ্মকৃপহি কেবলং' 'সত্যমেব জয়তে' অঙ্কিত পতাকাত্রয় ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। পথ জনতায় পূর্ণ, অথচ নিস্তব্ধ গম্ভীর। ...সংকীর্তনের দল নূতন গৃহের দ্বারে উপস্থিত। ব্রাহ্মগণ নবগৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহের মধ্য, দ্বার, পার্শ্বভাগ বহুলোকে পূর্ণ হইল। সকল দিক নিস্তব্ধ হইল, গম্ভীরভাবে ব্রাহ্মগণ উপবেশন করিলে, আচার্য কেশবচন্দ্র গৃহের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করিলেন।" সেদিন কেশবচন্দ্রের কণ্ঠে আমরা শুনিলাম— "এই ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য, ভারতবর্ষের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।... যত সত্য পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, পূর্বে ছিল, এখন আছে এবং অনন্তকাল থাকিবে, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিবার, সাধু উপদেশে ভক্তি রাখিবার সহজ উপায় স্বরূপ এই মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মোপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।"

ঠিক চল্লিশ বৎসর পূর্বে এই কলিকাতা শহরে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে অসাম্প্রদায়িক উপাসনার

জন্য রামমোহনের চেষ্টায় একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। সেদিন রাজার এই মহৎ প্রয়াসে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রধানতঃ ছিলেন ধনী, জমিদার অথবা ধনকুবের; ধর্ম তাঁহাদের কাছে নিতান্ত গৌণ বিষয় ছিল। তাঁহারা রামমোহনের অনুগামী মাত্র ছিলেন, ইহার অধিক কিছু নহে। যদি সত্যই তাঁহারা ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের ঐ অবস্থা হইত না—যে অবস্থা মহর্ষি প্রত্যক্ষ করেন। আর আজ, চল্লিশ বৎসর পরের এই ঘটনা, কেশবচন্দ্রের এই উদ্যম—ইহার প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। ঈশ্বরের গৃহের নাম ব্রহ্মমন্দির, সেই মন্দিরের উপাসনা জাগ্রৎ উপাসনা, সেখানে ভারতবর্ষের সকল জাতি, সকল সম্প্রদায় মিলিত হইয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় রত হইবে—এমন উদার চিন্তা নিশ্চয়ই রামমোহনের অনুগামীদের চিত্তকে সেদিন—সেই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের স্মরণীয় ঘটনার দিন—নিশ্চয়ই উদ্বেলিত করে নাই। সবচেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে কেশবচন্দ্র রামমোহনের নাম উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই, মহর্ষির কথাও তিনি শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"এই দুই মহাত্মার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা যেন কখন বিলীন না হয়।"

সেইদিনই সন্ধ্যায় টাউনহলে কেশবচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয়: 'ভাবী ধর্মসমাজ' (Future Church) এবং ইহাও তাঁহার অন্যতম মূল্যবান এবং অতি সুচিন্তিত বক্তৃতা। সেদিনও কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য যথারীতি বাংলার ছোটলাট হইতে আরম্ভ করিয়া বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত এই ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ইত্যাদি কি ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে তাহার উল্লেখ করিয়া কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন: "It is of great importance to theology to harmonize conflicting opinions and hopes, and determine, *honestly and dispassionately* where all religious movements will most likely meet and unite in future." এই বক্তৃতায় তিনি মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের পটভূমিকায় ভাবী ধর্মসমাজের যে রূপটি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন তাহা আজো অনুধাবন করিবার বিষয়। ঐতিহাসিক কোনো ধর্মই সম্পূর্ণ মিথ্যা

নয়, সকল ধর্মের মৌলিক তত্ত্বের ভিতর একটি সৌসাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে, ভবিষ্যতের ধর্ম সকল ধর্ম হইতেই সত্য গ্রহণ করিবে, এবং সেই নবধর্মের মত হইবে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও সর্ব মানবের ভ্রাতৃত্ব, এবং সেই ধর্মের বাণী হইবে ভগবৎ করুণা—এই বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র এইসব অভিমতই প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বরের প্রতি ও মানুষের প্রতি প্রীতির ভিতর দিয়া ভবিষ্যতের মানুষকে এমনভাবে ধর্মসাধন করিতে হইবে যাহাতে "মানবের চরিত্রে ঈশ্বরের চরিত্র প্রতিফলিত হয়।" হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—ভাবী ধর্মসমাজের বেদীমূলে সকল জাতিই আসিয়া একদিন মিলিত হইবে—ইহাই মানবসভ্যতার নিয়তি-নির্দিষ্ট পরিণতি—এই উদার বাণী সেদিন কেশবচন্দ্রের কণ্ঠকে আশ্রয় করিয়া উচ্চারিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতার উপসংহারে কেশবচন্দ্র আর একটি নূতন কথা বলিয়াছিলেন: "But the future church of India must be thoroughly *national*, it must be essentially an Indian church. All mankind will unite in a universal church, at the same time, it will be adapted to the peculiar circumstances of each nation, and assume a national form" এবং ইহাই ছিল সেদিন পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি আধুনিক ভারতের মহত্তম বাণী। কেশবচন্দ্রের নিজস্ব ধর্মমত ও বিশ্বাস কি ভাবে ক্রমশঃ অভিব্যক্তি লাভ করিতেছিল, এই বক্তৃতায় আমরা তাহার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইতেছি।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওয়ার পর হইতে এই ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন পর্যন্ত এই একবৎসর কালের মধ্যে কেশবচন্দ্রের কর্মজীবনের ধারা অনুসরণ করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগে কেশবচন্দ্র ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের সমভিব্যাহারে প্রচারযাত্রায় বাহির হইলেন। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মধর্মে প্রবল ভক্তির ভাব আমদানী করেন। বাংলার বৈষ্ণবধর্মের সিদ্ধ পীঠস্থান শান্তিপুরেই তিনি প্রথম গিয়াছিলেন। সেখানে কেশবচন্দ্রের 'ভক্তি ও শ্রীচৈতন্য' সম্পর্কে বক্তৃতাটি সকলের মর্ম স্পর্শ করে। শান্তিপুর হইতে তিনি বোম্বাই যান। পথিমধ্যে ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা, এলাহাবাদ এবং জব্বলপুরে তিনি বিভিন্ন

ব্রাহ্মমণ্ডলীতে উপাসনা করেন ও যথারীতি ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন। বোম্বাইতে আসিয়া তিনি প্রার্থনা সমাজের প্রথম বাৎসরিক উৎসবে একটি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয়ঃ 'বিশ্বাস' (*Faith*)। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে প্রার্থনা সমাজ স্থাপিত হয়; ইহার উদ্দেশ্য ব্রাহ্মসমাজেরই অনুরূপ। কেশবচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেনঃ "ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না করিলে, জ্ঞান কিছুই নয়। প্রার্থনা সমাজ ঈশ্বরে বিশ্বাস বিনা সহস্র প্রার্থনা করিয়াও কোনো ফললাভ করিবেন না।" একদা প্রার্থনার ভিতর দিয়া তিনি কি ভাবে ধর্মজীবন লাভ করিয়াছিলেন, জীবনের সেই গূঢ় অভিজ্ঞতার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া কেশবচন্দ্র যখন তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে বলিলেনঃ "আমি আমার বিষয়ক যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছি, সকল মানুষের সম্বন্ধে আমি তাহা সত্য বলি। আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, প্রার্থনাকেই ধর্মজীবনের আরম্ভ বলিয়া মনে করা উচিত।...যে কোন ব্যক্তি আমার নিকটে সত্যান্বেষী হইয়া আসিয়াছে, আমি তাহার প্রশ্নের এই উত্তর দিয়াছি—'অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর'; ভবিষ্যতে যে কেহ আমার নিকটে পরামর্শ লইতে আসিবে, পূর্ববৎ আমি একই উত্তর দিব" — তখন সকলেই বুঝিল অধ্যাত্মজীবনে প্রার্থনার গুরুত্ব কত।

বোম্বায়ের টাউনহলে তিনি এই সময়ে 'ধর্ম ও সমাজসংস্কার' বিষয়ে আর একটি বক্তৃতা করেন। কেশবচন্দ্রের বোম্বাই বক্তৃতার প্রতিধ্বনি ইংলণ্ডের সমাজে উঠিয়াছিল। লণ্ডনের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' এই সকল বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত প্রভাবের বিষয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিন যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহার সর্বব্যাপী প্রভাব ভারতবর্ষ তথা ভারতের বাহিরে শিক্ষিতসমাজে গিয়া পড়িল তখন যখন ইহার নেতৃত্ব আসিল কেশবচন্দ্রের হস্তে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ সত্যই এতদিনে যেন একটি জীবন্ত সত্তায় পরিণত হইল। এইবারের দেড়মাসব্যাপী প্রচার-যাত্রায় কেশবচন্দ্র মোট চৌদ্দটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মুঙ্গেরে তিনি দুইবার গিয়াছিলেন; দ্বিতীয়বার এখানে "প্রত্যাবর্তনের পর অলৌকিক ব্যাপার উপস্থিত হইল। প্রতিদিনের উপাসনা, প্রার্থনা, উপদেশে কত

অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস বিদূরিত হইল, কত কঠোর হৃদয় বিগলিত হইল; কত পাপীর পাপস্পৃহা তিরোহিত হইল। এইসকল দেখিয়া শুনিয়া সাধারণ লোকের এইপ্রকার বিশ্বাস জন্মিল, কেশবচন্দ্রের নিকট একবার যে গমন করিয়াছে, তাহার আর সংসারে ফিরিবার সামর্থ্য থাকে না।"

মুঙ্গেরে ভক্তি-আন্দোলনে কিছু আতিশয্য প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহা কেশবচন্দ্রও পরবর্তীকালে স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রতাপচন্দ্রও ইহাকে 'uncommon devotional excitement' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কথিত আছে, ভক্তির আতিশয্যে বহু ব্রাহ্মিকা, কেশবচন্দ্রের পা ধুইয়া দিয়া, পরে তাঁহাদের সুদীর্ঘ কেশপাশ দ্বারা সেই সিক্তপদ মুছিয়া দিয়াছেন। এ ছাড়া, ভক্তগণের চরণধারণ, ভোজনাবশিষ্ট চাহিয়া খাওয়া, ব্যক্তিবিশেষের অলৌকিকভাবে কেশবচন্দ্রকে দর্শন—ইত্যাদির ভিতর দিয়া মুঙ্গেরে একটি নূতন ভাবের ভক্তি ও বিশ্বাস মিশ্রিত ভাবের প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল। যে ব্রাহ্মধর্ম বা ব্রাহ্মসমাজকে এতদিন লোকে মনে করিত নীরস তত্ত্বজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্র, সেই ব্রাহ্মসমাজ হইতে সেদিন এই যে ভক্তির তুমুল তরঙ্গ উঠিয়াছিল, আমরা বলিব, সেদিন ইহার প্রয়োজন ছিল। ভক্তির স্নিগ্ধধারায় ব্রাহ্মসমাজকে তিনি যে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, বিশ্বাসের আলোকে ইহাকে যেভাবে তিনি আলোকিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই নিকট 'অতিশয্য' বলিয়া মনে হইয়াছিল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কথায় আমরা মুঙ্গেরের সমগ্র বিষয়টিকে একটি বিরাট জাগরণ—a great awakening বলিতে পারি। মুঙ্গেরে 'নরপূজা' হইয়াছে বলিয়া সেদিন যাঁহারা মন্তব্য করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রবল যুক্তি এই ছিল যে, ইহা দ্বারা কেশবচন্দ্র পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীই সংবাদপত্রে ঘোরতর প্রতিবাদ তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র বিষয়টি যাঁহারা কেশব-মানসের নিরিখে বিচার করিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, সত্যই কেশবচন্দ্র "was free from the sin of arrogating divine honours—আর তাহা যদি না হইত, তবে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বহু পূর্বেই কেশবচন্দ্র 'অবতার' সাজিতে পারিতেন। এখানেও কেশবচন্দ্রকে আমরা ভুল বুঝিয়াছি।

॥ তেরো ॥

অতঃপর ধর্মের বিশ্বজনীন বাণীকে পাশ্চাত্যজগতে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবেই তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইয়া নয়। যাইবার পূর্বে তিনি একটি প্রয়োজনীয় সমাজসংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন এবং ফিরিয়া আসিয়া উহাকে সম্পূর্ণতা দান করেন। উহা বিবাহবিধি সম্পর্কিত সংস্কার। পরে আমরা ইহার আলোচনা করিব। রামমোহনের পর কেশবচন্দ্রই ভারতবর্ষের দ্বিতীয় প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি যিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য মিলনের সেতু রচনায় সবচেয়ে বেশি উদ্যম করিয়াছিলেন এবং সবচেয়ে বেশি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড যাত্রার পূর্বে টাউনহলের এক বক্তৃতায় রামমোহনের মতন কেশবচন্দ্রকেও আমরা বলিতে শুনিলাম—"ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ক ইতিহাসের দুর্ঘটনা নয়, ইহা বিধাতারই অভিপ্রেত।" কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে চলিয়াছেন, দেখিতে পাই, রামমোহনের মতন তাঁহারও খ্যাতি আগে আগে চলিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের খ্যাতি তখন কম নয়। রামমোহন একা যান নাই, কেশবচন্দ্রও একা ইংলণ্ডে যাইলেন না, তাঁহার সঙ্গে আরো পাঁচজন গিয়াছিলেন—প্রসন্নকুমার সেন, আনন্দমোহন বসু, গোপালচন্দ্র রায়, রাখালদাস রায় ও কৃষ্ণধন ঘোষ। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠ জামাতা এবং উত্তরকালে ইনিই শ্রীঅরবিন্দের পিতা। প্রসন্নকুমার গিয়াছিলেন কেশবচন্দ্রের শরীররক্ষী হিসাবে। রামমোহন ইংলণ্ড হইতে ফেরেন নাই; কেশবচন্দ্রেরও মনে আশঙ্কা ছিল হয়ত তিনিও আর ফিরিয়া আসিবেন না। তাই য়ুরোপযাত্রার পূর্বে তিনি আচার্যের প্রতীকগুলি প্রতাপচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কি ভাবে চলিবে, প্রচারকগণ কি ভাবে চলিবেন, এইসব বিষয়ে তাঁহাকে যথাযথ নির্দেশও দিয়া গিয়াছিলেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারি রওনা হইয়া ২১শে মার্চ অপরাহ্নে কেশবচন্দ্র লণ্ডনে

আসিয়া পৌছাইলেন। তাঁহাকে সেদিন অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ, বি. এল. গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত। লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমে কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের বাসায় উঠিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ,রমেশচন্দ্র, বিহারীলাল ও কৃষ্ণগোবিন্দ—ইঁহারা চারজনেই সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য সে সময়ে লণ্ডনে ছিলেন। ইঁহারাই বাংলার দ্বিতীয় দলের সিবিলিয়ান। শুধু ধর্মপ্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে যান নাই। "এদেশের যথার্থ অবস্থা কি, এই অবস্থা পরিবর্তন জন্য গভর্ণমেণ্ট কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কোন্ কোন্ উপায় এখনও অবলম্বিত হয় নাই, কি হইলে এ-দেশের অবস্থা উন্নত হইতে পারে"—এইসব উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। রামমোহনও তাহাই করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে তিনি ছয়মাস ছিলেন এবং এই ছয় মাসে তিনি সেখানে কি কি কার্য করিয়াছিলেন তাহার সবিস্তার উল্লেখ আমাদের কাহিনীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। আমরা শুধু এখানে তাঁহার কর্মজীবনের এই পর্যায়ের প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করিব। প্রথম মাসটি বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত আলাপ-পরিচয়েই কাটিয়া গেল। ভারতবর্ষে থাকিতে পত্রযোগে যাঁহাদের সহিত তিনি ইতিপূর্বেই পরিচিত হইয়াছিলেন, সেই মিস কলেট, মিস ফ্রান্সেস কব, এবং ফ্রান্সিস নিউম্যান প্রভৃতি একেশ্বরবাদী পুরাতন বন্ধুদিগের সহিতই কেশবচন্দ্র সর্বাগ্রে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরাগী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু লর্ড জন লরেন্স (ভূতপূর্ব গভর্ণর-জেনারেল) স্বয়ং আসিয়া কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন ও লণ্ডনের বিদ্বৎসমাজে তিনিই ব্রহ্মানন্দ-পাদকে সেদিন বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। রামমোহন ও মাইকেলের পর ইংলণ্ডের মনীষী সমাজে কেশবচন্দ্রই সেদিন বিপুলভাবে গৃহীত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে থাকিতেই কেশবচন্দ্রের মনীষা, পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার কথা সমগ্র পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে—য়ুরোপ ও আমেরিকায়—প্রচারিত হইয়াছিল। তাই তিনি ইংলণ্ড যাইবেন শুনিয়াই ইংলণ্ডের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে সাদর আমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন। যে ছয় মাসকাল কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে ছিলেন সেখানে তিনি কি ভাবে সম্বর্ধিত হইয়াছিলেন, তাহার আনুপূর্বিক

বিবরণ তাঁহার কোনো কোনো জীবনচরিতকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের মাটিতে দাঁড়াইয়াও সেদিন কেশবচন্দ্র বলিতে পারিয়াছিলেন—"প্রাচীন সভ্যতা, ধর্ম এবং জ্ঞানে ভারত জগতের শ্রেষ্ঠ দেশ।" ইহার পঁচিশ বৎসর পরে লণ্ডনে আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কেশবচন্দ্রের এই কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের এক জীবনীকার (গিরিশচন্দ্র নাগ) লিখিয়াছেন: "বিলাতে বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা, উপাসনার সঙ্গে উপদেশ ও কার্যাবলী হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে কেশবচন্দ্র শুধু শিক্ষা লাভ করিতে বিলাত যান নাই, শিখাইতেও গিয়াছিলেন। মনে হয়, খ্রীষ্ট-জগতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, জড়বাদী খ্রীষ্টানুচরদের সম্মুখে প্রাচ্য কৃষ্টি, নীতি ও আধ্যাত্মিকতার মহিমা বর্ণন ও সেই সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের ও খ্রীষ্টীয় জীবনের মহৎ-গুণ ও কার্যাবলী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং শিক্ষিত ইংরেজদিগের নিকট ভারতের অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন—এইসব ছিল তাঁহার বিলাত যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উপায়ে তিনি ভারত ও ইংলণ্ডের ভিতর ভ্রাতৃত্বের ও আধ্যাত্মিকার একটি সংযোগ স্থাপনেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা বিফল হয় নাই।" ইংলণ্ডে সেদিন কেশবচন্দ্র যে কার্যের সূচনা করিয়া আসিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহাকেই বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি পরম সার্থকতার পথে লইয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনেতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের চৌদ্দটি প্রধান শহরে গিয়াছিলেন। যে ছয় মাসকাল তিনি সেদেশে ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে সত্তরটি জনসভায় প্রায় চল্লিশ হাজার লোকের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রায় শতাবধি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। শুধু বক্তৃতা? রামমোহনের মতন তিনিও সেখানকার কোনো কোনো ভজনালয়ে বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। ইংলণ্ডে পৌছিবার অল্পদিনের মধ্যেই পোর্টল্যাণ্ড ষ্ট্রীটের গির্জায় ডাক্তার মার্টিনোর স্থলে কেশবচন্দ্র ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন। আধুনিক ভারতবর্ষের আর কোনো ব্যক্তি আজ পর্যন্ত এই সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডে তিনি সেখানকার যেসব বিখ্যাত ব্যক্তি ও মহিলাদের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাদের বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের

মধ্যে জন ষ্টুয়ার্ট মিল, প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিত্থার্ণব গোল্ডস্টাকার, গ্লাডষ্টোন, লর্ড লরেন্স, ডিউক অব আরগাইল (ইনি তখন ভারতসচিব ছিলেন), মিস মেরি কার্পেণ্টার, লর্ড স্যাফটস বেরি, অধ্যাপক নিউম্যান, ডক্টর জেমস মার্টিনো, মিস সোফিয়া ডবসন কলেট, অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার, ওয়েষ্টমিনিষ্টার গির্জার ধর্মযাজক ডিন ষ্ট্যানলি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানবৃদ্ধ ম্যাক্সমুলারের সহিত স্বামী বিবেকানন্দেরও সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ধর্মপিতামহ রামমোহনের সমাধিক্ষেত্র দেখিবার জন্য কেশবচন্দ্র ব্রিষ্টলেও একবার আসিয়াছিলেন। সেখানে তিনি মেরি কার্পেণ্টারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহিয়সী নারীর নিকট ভারতবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। রামমোহনের মৃত্যুর সময়ে ইনিই তাঁহার পরিচর্যা করিয়াছিলেন এবং *The Last Days in England of Raja Rammohun Roy* নামক গ্রন্থ লিখিয়া, তিনি তাঁহার ভারতপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া কেশবচন্দ্রের সহিত সর্বপ্রথম পরিচিত হইয়াছিলেন। স্যর সৈয়দ আহম্মদ তখন লণ্ডনে। কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার ইতিপূর্বে কাশীতে আলাপ হইয়াছিল। তিনি লণ্ডনে আসিয়াছেন শুনিয়া স্যার সৈয়দ একদিন কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

বাল্যাবধি কেশবচন্দ্রের অসাধারণ শেক্সপিয়ার-প্রীতি ছিল। ছাত্রজীবনে তিনি অত্যন্ত যত্নের সহিত শেক্সপিয়ার পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। তাই ইংলণ্ডে আসিয়া তিনি ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-য়্যাভন' দেখিতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার অনেক বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র শেক্সপিয়ার হইতে উদ্ধৃতি দিতেন এবং প্রায়ই এই প্রবচনটি আওড়াইতেন: "যাহার হাতে বাইবেল ও শেক্সপিয়ার আছে, সে পৃথিবীর অনেক ঊর্ধ্বে।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কেশবচন্দ্রকে তাঁহার ওসবর্ণ প্রাসাদে সাদরে অভ্যর্থনা করেন ও তাঁহার সহিত ভারতবর্ষ ও স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরও একদা মহারাণী কর্তৃক এমনি সাদরে সম্বর্ধিত হইয়াছিলেন। মোট কথা, 'ইংলণ্ডে থাকাকালে কেশবচন্দ্র যেখানে যে সমাজে গিয়াছেন সেখানেই ইংলণ্ডবাসীদের অপরিমেয় শ্রদ্ধা ও প্রীতি লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা বলা যাইতে

পারে যে, রাজা রামমোহনের মত কেশবচন্দ্রও রাজদরবারে, অভিজাতদলের সংসর্গে, দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের সমাজে, ধর্মযাজকমণ্ডলীতে, উপাসনা গৃহে, বিদ্যামন্দিরে ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে", ভারতের একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধিরূপে দাঁড়াইয়া সর্বক্ষেত্রেই সম্বর্ধিত ও অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। প্রকাশ্য জনসভা ভিন্ন, বহু সভাসমিতেও তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রবাসকালের একটি দিনও কেশবচন্দ্র বৃথা যাইতে দেন নাই। ২৮শে এপ্রিল তারিখের সন্ধ্যায় ষ্ট্যানফোর্ড ষ্ট্রীটের চ্যাপেলে তিনি একটি বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয়—*The Book of Life* এবং সেই বক্তৃতায় তিনি যখন বলিলেন—"Asia has something to do for Europe, and Europe for Asia, unless the two continents unite, through their best representatives, England and India, their true welfare cannot be accomplished. Each has a mission to fulfil towards the other," তখন সকলেই কেশবচন্দ্রের চিন্তার উদারতা ও দৃষ্টির প্রসারতা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইল। এখানেও সেই Absolute Religion—The Fatherhood of God and the Brotherhood of Man-এর উদারবাণী তিনি ঘোষণা করিলেন।

ইংলণ্ডে কেশবচন্দ্র যতগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন সেগুলির মধ্যে মেট্রোপলিটান টেবার্ণকলে প্রদত্ত ২৪শে মে তারিখের বক্তৃতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই বক্তৃতার বিষয় ছিল : *England's duties to India* এবং তাঁহার বহু প্রসিদ্ধ বক্তৃতাবলীর মধ্যে এটি অন্যতম। এই বক্তৃতাটি কেশবচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি, রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতা ও স্বাধীনচিত্ততার একটি আশ্চর্য নিদর্শন। সেই সভায় তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপেই দাঁড়াইয়া ভারতের দাবী যে ভাবে এবং যে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্বসূরী রামমোহনের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। রামমোহনের জীবনাদর্শের এই দিকটি দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা কেশবচন্দ্রের কর্মে ও চিন্তায় সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। সেদিন সভাপতি ছিলেন লর্ড লরেন্স। "বহুসংখ্যক শ্রোতৃবর্গে গৃহ পূর্ণ হয়।" উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্যর সৈয়দ আহম্মদ ছিলেন একজন। এই বক্তৃতাটি সুচিন্তিত এবং সুদীর্ঘ ছিল। সেদিন তাঁহার এই বক্তৃতাটি

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে তুমুল চাঞ্চল্যের স্বষ্টি করিয়াছিল। প্রতাপচন্দ্র এই বক্তৃতাটিকে 'critical and national' বলিয়া তাঁহার কেশব-জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতশাসন ব্যাপারে ইংলণ্ডের প্রকৃত ভূমিকাটি তিনি ইতিহাসের পটভূমিকায় এমন স্থন্দরভাবে সকলের সম্মুখে সেদিন তুলিয়া ধরিয়াছিলেন যে তাহার তুলনা নাই। শিক্ষার কথাটিই তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেনঃ "ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের প্রথম কর্তব্য শিক্ষাকার্যের আরো উৎকর্ষসাধন করা, আরো বিস্তৃত করা।" কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে; আর মাত্র তাহার ষোল বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে প্রকৃতভাবে শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থদীর্ঘকালের মধ্যে, কেশবচন্দ্র বলিলেন, বাংলাদেশে ৩২৮ জনের মধ্যে মাত্র একজন শিক্ষালাভ করে। মধ্যবিত্তশ্রেণী শিক্ষালাভের স্থযোগ হইতে আজো বঞ্চিত রহিয়াছে, এই বলিয়া তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে ভারতে তাঁহাদের শিক্ষানীতির ব্যর্থতা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়টিও আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"গভর্ণমেণ্ট ভারতের নারীগণকে যদি শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে শিক্ষাকার্য অপূর্ণ থাকিবে। ভারতকে শিক্ষিতা মাতা না দিলে, ভাবী বংশধরদের কুসংস্কারাদির হস্ত হইতে মুক্ত করা যাইতে পারিবে না।" প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ্য যে, কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতাটির প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের ইংরেজ মহলে এমনই হইয়াছিল যে তাঁহারা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হন; বোম্বাই গেজেটে এই সম্পর্কে একখানি পত্র পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রে এমন কথা বলা হইয়াছিল যে, "যদি কোনো একজন দেশীয় লোক কেশবচন্দ্র সেনের ঐ বক্তৃতাটি আবৃত্তি করেন, তাঁহাকে চাবুক মারা হইবে।"

কেশবচন্দ্রের *England's duties to India* বক্তৃতাটি আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রকাশ্য জনসভায়—যে সভার সভাপতি একজন ভূতপূর্ব প্রধান রাজপুরুষ—দাঁড়াইয়া—"you hold India on trust and you have no right to say that you will use its property, its riches or its

resources, or any of the privileges which God has given you, simply for the purpose of your own selfish aggrandisement and enjoyment.” সোজাসুজি এই কথা বলা, এক রামমোহন ভিন্ন অন্য কোনো ভারতীয়ের সাহসে সেদিন কুলাইত কি না সন্দেহ। কেশবচন্দ্রের এই নির্ভীকতা তাঁহার চরিত্রকে বিশেষ ভাবেই গৌরবমণ্ডিত করিয়াছে। এই বক্তৃতায় তিনি এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন, যথা :—(১) ভারতবর্ষে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, জলসেচন প্রভৃতির উন্নতি ছাড়াও দেশের সমস্ত লোককে জ্ঞানে, ধর্মে ও নীতিতে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে ; (২) স্ত্রীলোকদিগের ভিতর ধর্ম, নীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে আচার-আচরণ বা পোষাক-পরিচ্ছদে কিছুতেই denationalise করা চলিবে না ; (৩) দেশীয় ভাষার মাধ্যমে সেই শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে ; (৪) ভারতে জনমতের বিকাশ ও গঠনের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র প্রকাশের সকল রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে ; (৫) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্তানুযায়ী জমিদার ও প্রজাদিগকে অতিরিক্ত করভার হইতে মুক্ত করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুবিধা দিতে হইবে ; (৬) শিক্ষিত দেশীয় লোকদিগকে উচ্চ সরকারী কার্যে নিয়োগ করিতে হইবে, (৭) বিদেশে গিয়া ভারতীয়গণ যাহাতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহার জন্য বৃত্তিদান প্রভৃতির দ্বারা ছাত্রদের সহায়তা করিতে হইবে ; (৮) মদ্য ও অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের ব্যবসা দেশ হইতে উঠাইয়া দিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে হইবে, এবং (৯) উদ্ধতস্বভাব ও চরিত্রহীন ইংরেজরা ভারতে আসিয়া দেশীয় লোকের প্রতি যেসব ঘৃণ্য ও নৃশংস অত্যাচার করে তাহা বন্ধ করিতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে চরিত্রবান ও সৎকর্মচারীদিগকে ভারতে প্রেরণ করিতে হইবে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ভারতশাসন ব্যাপারে ইংরেজের প্রবর্তিত বিভিন্ন নীতিগুলি যদি আমরা একবার পর্যালোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে সেইসব নীতি বহুলাংশেই কেশবচন্দ্রের এই একটি বক্তৃতার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

ইহার পরও কি আমরা বলিব কেশবচন্দ্র শুধু একজন উচ্ছ্বাসপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন? এমন বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ উনিশ শতকের ভারতবর্ষে রাম-মোহনের পর তৃতীয় আর কেহ ছিলেন না।

ইংলণ্ডে কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার প্রভাব সম্পর্কে পরবর্তীকালে অক্সফোর্ড, ম্যানচেষ্টার কলেজের অধ্যক্ষ জে. ইষ্টলিন কার্পেণ্টার বলিয়াছিলেন—"Never again has England heard from the East a voice like that of Keshub Chandra Sen" এবং ইহা যে অত্যুক্তি নয় তাহা, তাঁহার পরে যাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন তাঁহারাই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ছয় মাসে তিনি যেন ছয় বৎসরের কাজ করিয়া আসিয়াছিলেন; মিস কার্পেণ্টার ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের পরবর্তীকালের ইতিহাসও সেই সাক্ষ্য অভ্রান্তভাবে বহন করে। ইংলণ্ডের মাটিতে দাঁড়াইয়া ভারতের দাবীকে এমন বলিষ্ঠ কণ্ঠে ইতিপূর্বে আর কেহ তুলিয়া ধরিতে পারে নাই, তাঁহার পরেও কেহ পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। ইংলণ্ড হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে রেভারেণ্ড ডাব্লিউ. এইচ্. চ্যানিংকে কেশবচন্দ্র যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। সেই পত্রে কেশবচন্দ্র যেন তাঁহার মনের কথাটি খুলিয়া বলিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে আসিয়া সকল শ্রেণীর লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া মিশিয়া কেশবচন্দ্রের ইহাই দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল যে—"The East and West will unite—such is God's will." ইংলণ্ডের এমন কোনো কাগজ ছিল না, যাহাতে কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডবাসের কার্যাবলীর বিশদ বিবরণ, তাঁহার বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশিত না হইত। ইংলণ্ডে সেদিন কেশবচন্দ্রের বক্তৃতাই সেখানকার জনচিত্তকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। আবার বলি, সে-বক্তৃতা শূন্যগর্ভ কথার তুবড়ি নয়, ভাবগর্ভ চিন্তার দুর্লভ সম্পদ। 'কেশব-চরিত' গ্রন্থের লেখক সত্যই লিখিয়াছেন: "কেশবকণ্ঠে বেদমাতা বাগ্দেবী নিত্য বিরাজ করিতেন। যেমন মধুর গম্ভীর সুশ্রাব্য স্পষ্ট স্বর, তেমনি প্রত্যাদিষ্ট মহান্ অর্থযুক্ত ভাবময়ী কথা।...যখন যেখানে যাহা কিছু তিনি বলিতেন, তাহার ভিতর কিছু না কিছু নূতন ভাব থাকিত।" গ্লাডষ্টোন ও ডিজরেলির দেশের লোকেরা পর্যন্ত এমন অলৌকিক বাগ্মিতা কখনো প্রত্যক্ষ করে নাই।

তাই বুঝি সেদিন লণ্ডনের *Punch* কাগজ লিখিয়াছিল:

"Who among all living men
Is this Keshub Chunder Sen?"

বস্তুতঃ কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ড প্রবাসের গৌরব ও সার্থকতা সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে তাঁহার *Lectures in England* বইখানি প্রত্যেকের অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা উচিত। একজন বাঙালি সন্তান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থানে গিয়া কী অনিন্দ্য ও বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিলেন, যাহা শুনিয়া অনেক ইংরেজই বিস্মিত হইয়াছিল, সে পরিচয় জানিতে হইলে এই বইখানি একবার পাঠ করিতে হয়। কিন্তু কেশবচন্দ্র শুধু কি তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার দ্বারাই ইংলণ্ডের চিত্তলোক জয় করিয়াছিলেন? যখন আমরা তাঁহার সেই সেণ্ট জেমস্ হলে প্রদত্ত খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ বক্তৃতাটি (২৮ মে, ১৮৭০) স্মরণ করি, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, পাণ্ডিত্যের সহিত আধ্যাত্মিকতার সমাবেশ না ঘটিলে শিক্ষিত ও ধর্মতত্ত্বজ্ঞ সহস্র সহস্র খ্রীষ্টানদের মধ্যে দাঁড়াইয়া খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্মের উপর একজন ভারতবাসীর পক্ষে এমন নূতন আলোকসম্পাত করা আদৌ সম্ভব ছিল না। কেশবচন্দ্রের পূর্বে কোনো ইংরেজ খ্রীষ্টান ধর্মযাজকও খ্রীষ্টধর্ম এবং খ্রীষ্টের জীবনাদর্শের এমন মর্মজ্ঞ ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই—এ কথা ডাঃ মার্টিনো প্রমুখ বিশিষ্ট ইংরেজ পাদরিগণই স্বীকার করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতাটি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বিখ্যাত *Spectator* পত্রিকা লিখিয়াছিল: "সেণ্ট জেমস হলে গত শনিবার কেশবচন্দ্র সেন এক অনন্যসাধারণ রকমের বক্তৃতা করিয়াছেন।"

কেশবচন্দ্রের প্রতিভার স্বকীয়তা ও মহত্ত্ব এইখানেই।

॥ চৌদ্দ ॥

এইবার সমাজ-সংস্কারক কেশবচন্দ্রের কথা বলিব।

তাঁহার প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ পরিচয় আছে তাঁহার বিভিন্ন সংস্কার-প্রয়াসের মধ্যে। ইহার সম্যক আলোচনা প্রয়োজন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের পর কেশবচন্দ্রই আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যতম সমাজ-সংস্কারক। ইংলণ্ডে থাকিবার সময় তিনি সেই দেশের জনহিতকর বিবিধ প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠান স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেই অভিজ্ঞতা এইবার তিনি বাস্তবে রূপায়িত করিতে সচেষ্ট হইলেন এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিতই অগ্রসর হইলেন। ইহাই ছিল তাঁহার কার্যপদ্ধতি। "Keshab was not the man to let the grass grow under his feet"—এবং তাঁহার কর্মজীবনের ধারা যাঁহারা গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন যে, তিনি ভাবসর্বস্ব বা বাকসর্বস্ব মানুষ ছিলেন না; একটা যুগের চিন্তা ও চেতনা পূর্বসূরিদের চিন্তা ও চেতনার ভিতর দিয়া তাঁহার মধ্যে আশ্চর্যভাবেই সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই দেখিতে পাই, কর্মজীবনের আরম্ভকাল হইতে তিনি তাঁহার চারিদিকে একটি প্রচণ্ড কর্মের প্রবাহ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন এবং অনুগামী ও সহচরদের মধ্যেই তিনি জাগাইয়া তুলিতেন প্রবল কর্মস্পৃহা। ইংলণ্ড হইতে তিনি পাঁচ দফা কর্মসূচী লইয়া ফিরিয়াছিলেন এবং নবপ্রতিষ্ঠিত 'ভারতসংস্কার সভা'র (*Indian Reforms Association*) ভিতর দিয়া তিনি সেই কার্যসূচীকে রূপ দিতে চাহিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, কেশবচন্দ্রের সকল কার্য, সকল চিন্তার কেন্দ্র ভারতবর্ষ; কাগজ বাহির করিলেন, নাম দিলেন—'ইণ্ডিয়ান মিরার'; নূতন সমাজ স্থাপন করিলেন, নাম দিলেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'; নূতন সমিতি গঠন করিলেন, নাম দিলেন 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মস এ্যাসোসিয়েসন'। তাঁহার সমসাময়িক মনীষিদের মধ্যে এই সর্বভারতীয়বোধ বিরল ছিল বলিলেই

হয়; ইহার সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত কেশবের সমসাময়িক ও সমবয়সী বঙ্কিমচন্দ্র।

কেশবচন্দ্রের সংস্কার-প্রয়াসের কথা বলিবার আগে, ইংলণ্ড হইতে ফিরিবার পর তিনি কি ভাবে সম্বর্ধিত হইয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব। সেই যে লণ্ডনে তিনি 'ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্তব্য' বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা ভারতের ইংরেজ-রাজপুরুষদের মনঃপূত হয় নাই, সে-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ইংলণ্ডে তিনি রাজনৈতিক কোনো ভাষণ দেন নাই, "কিন্তু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গভীর দেশপ্রেম তাঁহাকে ভারতের দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ ব্যথার কথা এবং সেই সঙ্গে ভারতে ইংরেজের কুশাসনের কথা ইংলণ্ডের শিক্ষিত জনসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।" বলা বাহুল্য, তাঁহার সেই সব উক্তি এখানকার শাসকবৃন্দ ও ব্যবসায়ী ইংরেজদের প্রবল বিক্ষোভের কারণ হইয়াছিল। ইঁহারা কিছু-কালের জন্য 'ইণ্ডিয়ান মিরার' বর্জন করিয়াছিলেন। তারপর কেশবচন্দ্র যখন ইংলণ্ড হইতে বোম্বাইয়ে পৌঁছাইলেন, তখন সেখানে তাঁহাকে এক জনসভায় বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন করা হইয়াছিল; সেই সভায় যাহাতে কোনো ইংরেজ যোগদান না করে, তাহার জন্য ইংরেজ-পরিচালিত একটি পত্রিকায় জোর বিরুদ্ধপ্রচার পর্যন্ত চলিয়াছিল। কেশব ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের অভ্যর্থনা সভায় দাঁড়াইয়া দৃপ্তকণ্ঠে তিনি তাই বলিলেন: "If England decides to rule India in the interest of Manchester and mercantile people of England only and not to the interest of Indian people, then I say — perish British rule this very moment." ঊনবিংশ শতকের ভারতে এমন কথা বলিবার দুঃসাহস সেদিন আর কাহারো ছিল না—বিংশ শতকেই বা এই কথা বলিবার সাহস একমাত্র সুভাষচন্দ্র ভিন্ন আর কে দেখাইতে পারিয়াছেন?

ইংলণ্ডের হৃদয় জয় করিয়া কেশবচন্দ্র ভারতে ফিরিলেন। ২০শে অক্টোবর তিনি কলিকাতায় পৌঁছিলেন। পরদিন সঙ্গতে তিনি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহার ইংলণ্ড ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সার কথা হিসাবে বলিলেন—"কার্য এবং আধ্যাত্মিকতা (spirituality and

practical work)—এই উভয়ের যোগে জগতের পরিত্রাণ।…পশ্চিমের সহিত যোগবন্ধন করিতে না পারিলে, আমাদিগের পূর্ণ উন্নতি লাভ হইবে না। আমাদের যে সকল গুণ আছে, তাহা রক্ষা না করিয়া, পশ্চিমের গুণ ধারণ করিলে, জনকয়েকের সাহেব সাজা আর চৌরিঙ্গতে থাকা—ইংলণ্ড গমনের এই ফল হইবে। আবার ভ্রান্ত স্বদেশপ্রিয়তা দেখাইয়া কেবল আপনাদিগের সীমায় বদ্ধ থাকিলে, অনেক সদ্গুণে বঞ্চিত হইতে হইবে। আমাদের জীবনে পূর্ব পশ্চিম উভয় দেশীয় ভাবের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইবে।…we must have the heart of the Rishi and the hand of the Englishman." ইহার বহুকাল পরে বিবেকানন্দ ঠিক এই কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া ভারতবাসীর চিত্ত জয় করেন। ইহার তিন দিন পরে বেলঘরিয়াতে জয়গোপাল সেনের বাগানে কেশবচন্দ্রকে প্রকাশ্যে সম্বর্ধনা করা হয়। কয়েকদিন পরে ব্রাহ্মিকাগণও তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তাঁহার সম্বর্ধনা শুধু ব্রাহ্মদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দ্বারকানাথ মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, কৃষ্ণদাস পাল, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি তৎকালীন কলিকাতার প্রসিদ্ধ সকল ব্যক্তিই কেশবচন্দ্রকে তাঁহাদের আন্তরিক প্রীতি জানাইয়াছিলেন।

১৮৭০। ২রা নভেম্বর।

ভারত সংস্কার সভা—*Indian Reform Association*—স্থাপিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাসে ইহা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এমন বৃহৎ কর্ম-সংস্থা এই শতাব্দীতে এই প্রথম। সিপাহীযুদ্ধের পরবর্তী একটি যুগ সমাজ-সংস্কারের দিক দিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের পর সমাজ-সংস্কারের কথা এই সময়ের মধ্যে আর কোনো বাঙালি তেমনভাবে চিন্তা করেন নাই। কেশবচন্দ্রকেই তাই এই বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। ছয় মাস ইংলণ্ডে অক্লান্তভাবে ঘুরিয়া বক্তৃতা দিয়া কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিবার পর মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই এত বড়ো একটি কাজে হস্তক্ষেপ করিলেন কি প্রকারে? নিঃসন্দেহে ইহা তাঁহার কর্মশক্তির নিদর্শন। প্রতাপচন্দ্র সত্যই লিখিয়াছেন: "An

endless, almost a super-human force formed the principal characteristic of Keshub's genius. It always found vent in new plans, new reforms, new creations." কেশব-প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারত সংস্কার সভার বহুমুখী কার্যের মধ্যে। কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যই এই ছিল যে তিনি এক সঙ্গে অনেকগুলি কর্মের সূচনা করিতেন, তাঁহার কর্ম-প্রতিভা এমনই প্রচণ্ড ছিল, চিন্তা করিবার ক্ষমতা এত পর্যাপ্ত ছিল যে যুগপৎ তিনি বিভিন্ন প্রকার কাজের মধ্যে অনায়াসে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের পর এমন কর্মিষ্ঠ মানুষ বাংলা তথা ভারতবর্ষে আর কেহ সেদিন ছিলেন না।

ভারতবাসীর সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিসাধন—ইহাই ছিল ভারত সংস্কার সভার মূল উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়। এই সভার পাঁচটি বিভাগ ছিল ; যথা :—(১) সুলভ সাহিত্য ; (২) দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে দান ; (৩) নারীজাতির উন্নতি ; (৪) সাধারণ শিক্ষা : শিল্পবিদ্যালয় ও শ্রমজীবিদিগের জন্য বিদ্যালয় এবং (৫) সুরাপান নিবারণ। মূল সভার সভাপতি ছিলেন কেশবচন্দ্র স্বয়ং, সম্পাদক ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র ধর, আর প্রত্যেকটি বিভাগের একজন করিয়া সভাপতি ও একজন করিয়া সম্পাদক ছিলেন। কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে নবীনচন্দ্র সেন, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উমেশচন্দ্র দত্ত, মাধবচন্দ্র রায়, অক্ষয়চন্দ্র রায়, ঠাকুরদাস সেন, উমানাথ গুপ্ত, জয়গোপাল সেন ও কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ভারত সংস্কার সভার বিভিন্ন বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আর বাহিরের মধ্যে যাঁহারা কেশবচন্দ্রের এই সংস্কার উদ্যমে সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্যারীচরণ সরকার (মদ্যপানের বিরুদ্ধে এদেশে ইঁহারই প্রয়াস ছিল সর্বপ্রথম), আবদুল লতিফ খাঁ, দিগম্বর মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দলাল শীল, মহেন্দ্রলাল সরকার, রেভারেণ্ড মিচেল, রেভারেণ্ড ডল্, মিস পিগট এবং ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, সমসাময়িক কালে বাংলা দেশে কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রভাব তখন কতখানি

ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল। সভার এই পাঁচটি বিভাগের মধ্যে আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভারত সংস্কার সভার বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। আমরা শুধু সংক্ষেপে ইহার বিষয়ে কিছু বলিব। প্রথমে সুলভ সাহিত্য বিভাগের কথা বলি। এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক 'সুলভ সমাচার' প্রকাশ দ্বারা এই বিভাগের কার্য আরম্ভ হয়। ইতিপূর্বে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ও 'ধর্মতত্ত্ব' প্রকাশ করিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহার সাংবাদিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন; সেই প্রতিভারই পরিণত প্রকাশ এই 'সুলভ সমাচার'। সর্বসাধারণের জন্য এক পয়সার কাগজ প্রবর্তন করিয়া সেদিন তিনি সত্যই যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 'সুলভ সমাচার' বাংলা সাহিত্যেরও এক গুরুতর অভাব দূর করিয়াছিল। ইহার ভাষা ছিল একেবারে সহজ ভাষা। বাংলা ভাষাকে বিদ্যাসাগরী ভাষা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া কেশবচন্দ্রই ইহাকে সহজগম্য করেন। এই পত্রিকায় তিনি নির্ভীকভাবে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন। 'সুলভ'-এর প্রচারও ছিল সমকালীন অন্যান্য পত্র-পত্রিকার প্রচারের তুলনায় সমধিক; তখনকার দিনে তিন-চার হাজার কপি প্রতি সপ্তাহে বিক্রয় হওয়া কম কথা নয়। ইংরেজ লেখিকা মার্গারিটা বার্ণস্ তাঁহার *The Indian Press* গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "In 1870 the great Brahmo Samajist preacher, Keshab Chandra Sen, launched the *Sulava Samachar* as the organ of the Indian Reform Association. The paper was published weekly at one pice (farthing) per issue and was, therefore, *the first attempt to reach those who were poor but literate.* It achieved great success and its circulation was between three and four thousand weekly, the first of the newspaper records." বাংলা দেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে 'সুলভ সমাচার'-এর ভাব ও ভাষার পুনরাবৃত্তি আমরা বহুকাল পরে কতকটা লক্ষ্য করি উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' কাগজে। পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্রের 'সুলভ সমাচার'-এর অনুকরণ করিয়া যোগীন্দ্রনাথ বসু ও কৃষ্ণকুমার মিত্র যথাক্রমে 'বঙ্গবাসী'

ও 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; এই দুইখানিও প্রথমে এক পয়সা দামের সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। কিন্তু 'সুলভ'-এর গৌরব ছিল স্বতন্ত্র। এই প্রসঙ্গে স্যর যদুনাথ সরকারের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ্য।

কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষে (১৯৩৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কলুটোলায় স্মৃতিপূজার যে অনুষ্ঠানটি হইয়াছিল তাহাতে স্যর যদুনাথ বলিয়াছিলেন : "আমরা ছেলেবেলায় 'সুলভ সমাচার' কাগজ পড়েছি। পূজার সময়ে আবার লাল রঙ, নীল রঙের বাহির হতো। এর ভাষা একেবারে সহজ ভাষা। শিশু পর্যন্ত বুঝতে পারে। সে সময়ে গাড়োয়ানদেরও তা পড়তে দেখেছি। সাধারণ লোকের মনে ঐ 'সুলভ সমাচারে'র ভিতর দিয়ে কেশবচন্দ্র এদেশে রাজনৈতিক বিপ্লবের সূত্রপাত করলেন।" একখানি এক পয়সা দামের কাগজের পক্ষে এ বড়ো কম গৌরবের কথা নয়। এই কাগজে সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, ইত্যাদি নানা বিষয়ের প্রবন্ধ ও সংবাদ সহজ সরল ভাষায় প্রকাশিত হইত। সমাজ সংস্কারের জন্য যে বিরাট কার্যসূচী লইয়া কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে ফিরিলেন, তিনি দেখিলেন, কেবল বক্তৃতা দ্বারা এই কার্য সিদ্ধ করা যাইবে না, সাহিত্যের মাধ্যমে উহা প্রচার করিতে পারিলেই কার্যসিদ্ধি সুনিশ্চিত।

'কেশব-চরিত' গ্রন্থের লেখক এই প্রসঙ্গে বলেন : "সুলভ সমাচার দ্বারা বঙ্গসমাজে সাহিত্য-বিষয়ে যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয় জানিবার কাহারো বাকী নাই। ইতর ভদ্র নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহা প্রচলিত হইল। অনেকে কাগজ পড়িতে শিখিল। প্রতি সপ্তাহে সহস্র সহস্র খণ্ড 'সুলভ সমাচার' দেশে বিদেশে বিস্তারিত হইয়া বঙ্গবাসীদিগকে জাগাইয়া তুলিল। 'সুলভ' রাজপ্রাসাদে এবং মুদির পর্ণকুটীরে, কৃতবিদ্য সভ্যসমাজে এবং অন্তঃপুরে হিন্দুমহিলাগণের হস্তে শোভা পাইতে লাগিল। ইহার দ্বারা সহজ ভাষার রচনা প্রচলিত হইয়াছে। কেবল তাহা নহে, নীতি বিষয়েও লোকের রুচি ফিরিয়াছে।" ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, সেদিন বংলার সর্বত্র 'সুলভ সমাচারে'র কি আদর ছিল। বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে ও শিক্ষিত বাঙালির মনে যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তার উন্মেষ সাধনে

দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার যে গৌরব, জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার জন্য হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর যে মর্যাদা, কেশবচন্দ্রের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকার ঠিক সেই গৌরব, সেই মর্যাদা—ইহা যেন আমরা কখনো বিস্মৃত না হই। 'সুলভ সমাচারে'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন উমানাথ গুপ্ত আর মূল সভার পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্র ছিলেন ইহার পরিচালক। এবং তিনিই ছিলেন ইহার প্রধান লেখক।

সমাজের নীচের তলার মানুষের কথা এদেশে সর্বপ্রথম চিন্তা করিলেন কেশবচন্দ্র; শুধু চিন্তা করা নয়, তাহার বাস্তব রূপটি পর্যন্ত সকলের সম্মুখে তিনি তুলিয়া ধরিলেন। ভারত সংস্কার সভার চতুর্থ বিভাগটির কথাই আমরা এখানে বলিতেছি। কেশবচন্দ্র ইতিপূর্বে উচ্চশ্রেণীর যুবকদের সাধারণ শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। এইবার তিনি আরো এক ধাপ অগ্রসর হইলেন—সমাজের অতি সাধারণ লোক যাহারা—অথচ যাহারা প্রকৃতপক্ষে সমাজের মেরুদণ্ড, তাহাদের শিক্ষার কথা তিনি চিন্তা করিলেন। ইহাদিগকে অর্থকরী শিল্পশিক্ষা দিবার জন্য এই বৎসরই তিনি একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তারপর কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি গিয়া পড়িল শ্রমিকদের উপর। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় শ্রমিকদের কথাও প্রথম চিন্তা করিলেন কেশবচন্দ্র। শ্রমজীবিদের জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। সেখানে শ্রমিকদিগকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হইত এবং অল্প অল্প ইংরেজিও শিক্ষা দেওয়া হইত। ভদ্রশ্রেণীর লোকদিগকে ছুতারমিস্ত্রীর কাজ, দর্জির কাজ, ধাতুপাত্র তৈরির কাজ প্রভৃতি বিবিধ কুটীরশিল্প শিক্ষা দেওয়া হইত। Workingmen's Institute উনিশ শতকের ভারতবর্ষেই একটি নূতন জিনিস। সুখের বিষয় কেশবচন্দ্রের এই একটিমাত্র কীর্তিই আজো কোনোমতে তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছে। শ্রমজীবি বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র শ্রমিকরা নয়, অবসর সময়ে অফিসের কেরাণী, কলেজের ছাত্র, ব্রাহ্মপ্রচারক এবং স্বয়ং কেশবচন্দ্র—সকলেই এইসব কাজ আগ্রহের সহিত শিক্ষা করিতেন। তাঁহার সকল জীবনচরিতকারই উল্লেখ করিয়াছেন যে, কেশবচন্দ্র নিজে একজন বড়ো craftsman ছিলেন এবং

জীবনের শেষভাগে অসুস্থতার সময় অনেক নিপুণ আসবাবপত্র তিনি নিজের হাতে তৈরি করিয়াছিলেন।

সেবার ভিতর দিয়া সাধারণ লোক ও ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ভাব জাগাইয়া তুলিবার জন্যই দাতব্য বিভাগটি খোলা হইয়াছিল। দশ বৎসর পূর্বে উত্তর ভারতের দুর্ভিক্ষ ও নিম্নবঙ্গের ম্যালেরিয়া পীড়িত জনগণের সাহায্য করিতে আমরা কেশবচন্দ্রকে দেখিয়াছি। দৈব বিপদের সময় সমবেত প্রয়াসে সঙ্কটত্রাণ বা Relief-এর ব্যবস্থা করা—এই দেশে কেশবচন্দ্রের পূর্বে আর কাহাকেও আমরা চিন্তা করিতে দেখি নাই। তাঁহার সমাজ সেবার এই আদর্শই পরবর্তীকালে সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে সে যুগে মদ্যপানের প্রচলন ছিল। কেশবচন্দ্র বহু ইয়ং বেঙ্গলের জীবনে ইহার শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে ছিল প্যারীচরণের আদর্শ। ভারত সংস্কার সভার মঞ্চ হইতে তিনি এই সামাজিক ব্যাধি দূর করিবার জন্য বক্তৃতা দিয়া, সংবাদপত্রে আলোচনা দ্বারা জনমত গঠন করিয়া, ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করিয়া এবং তরুণদের লইয়া একটি 'আশাবাহিনী' গঠন করিয়া যেসব প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সে ইতিহাস সুপরিচিত।

ভারত সংস্কার সভার দ্বারা ভারত সত্যই জাগিয়া উঠিল।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হইতে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' দৈনিকে পরিণত হইল। তখন হইতে নরেন্দ্রনাথ সেন ইহার সম্পাদক হইলেন। ভারতবর্ষে এই রকম দৈনিক কাগজ এ পর্যন্ত আর কেহ চালাইতে পারেন নাই। যুগ আগাইয়া গিয়াছে, শিক্ষিতের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে, এখন দৈনিক পত্রিকা ভিন্ন যুগচেতনাকে জাতির মানসমুকুরে প্রতিফলিত করা সম্ভব নয়—এই মনে করিয়াই কেশবচন্দ্র কাগজখানিকে দৈনিকে পরিণত করিলেন। জাতীয় জীবন গঠনে সেই যুগে কেশবচন্দ্রের 'মিরার' সত্যই এক মহৎ কার্য সাধন করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' ইহার এক বৎসর পরের ঘটনা। 'ইণ্ডিয়ান মিরার'ই বাঙালি পরিচালিত ও সম্পাদিত প্রথম ইংরেজি দৈনিক

পত্রিকা। এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার *A Nation in Making* পুস্তকে লিখিয়াছেন : "with the exception of *Indian Mirror* all our newspapers in Bengal, including the most influential, were weekly." কেশবচন্দ্রের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' সত্যই সেদিন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাঙালিকে এক নূতন আদর্শের সন্ধান দিয়াছিল ; সুরেন্দ্রনাথ যখন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'বেঙ্গলি' পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হন, তখন তিনি কেশবচন্দ্রের দৃষ্টান্তকে সম্মুখে রাখিয়াই তাঁহার সাংবাদিক জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহা তিনি নিজে বলিয়াছেন।

শিক্ষা, কৃষ্টি ও প্রগতি বিষয়ে ইংলণ্ডের মেয়েরা কত উন্নত, তাহা কেশবচন্দ্র প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছিলেন। স্বদেশীয় নারীদের উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে একটি স্কুল স্থাপন করেন। বেথুন স্কুলের শিক্ষিকা মিস পিগটকে তিনি এই স্কুলের কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; পর বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করিলেন এবং এই স্কুলের মেয়েদের লইয়া তিনি 'বামা হিতৈষিণী সভা' নামে একটি উন্নয়নমূলক সমিতিও স্থাপন করেন ; মেয়েরা এই সভায় নারীকল্যাণ মূলক নানাবিধ প্রবন্ধ পাঠ করিত ও উহা লইয়া আলোচনা করিত এবং এইসব প্রবন্ধের অধিকাংশই 'বামা-বোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। অন্তঃপুরিকাদিগের জন্য এই পত্রিকাখানি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে উমেশচন্দ্র দত্ত প্রকাশ করেন এবং তিনিই ইহার সম্পাদক ছিলেন। বাংলা ভাষায় মেয়েদের জন্য ইহাই প্রথম কাগজ। কেশবচন্দ্রের নর্মাল স্কুলের উন্নতি ও সাফল্য দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট ইহার জন্য বার্ষিক দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। যতদূর জানা যায়, 'বামা হিতৈষিণী সভা'-ই উনিশ শতকের বাংলার প্রথম মহিলা সমিতি। ব্রিষ্টলের একটি মহিলা সমিতিও কেশবচন্দ্রের বিবিধ নারীকল্যাণ প্রচেষ্টায় প্রভূত অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, "নারী শিক্ষা সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের কতকগুলি নিজস্ব ধারণা ছিল। নারীদিগকে হিন্দুকৃষ্টির উপযোগী শিক্ষা দেওয়াই তিনি সঙ্গত মনে করিতেন। নারীগণ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার জ্ঞান ও আলোক

পাইবে, অথচ পাশ্চাত্ত্য কৃত্রিম সভ্যতার আদর্শে তাহাদের জীবন ও চরিত্র গঠিত না হয়, এই ছিল তাঁহার অভিমত। নারীগণের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা তিনি উপযোগী মনে করিতেন না। নারী স্বভাবের অনুকূল গৃহশিল্প, ললিতকলা, কাব্যরচনা, প্রাথমিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, গৃহকর্ম প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানই তিনি একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করিতেন।”

১৮৭২।

কেশবচন্দ্রের কর্মজীবনে ইহা একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর।

আমরা দেখিয়াছি, কেশবচন্দ্র ইতিপূর্বে কলুটোলা সান্ধ্য স্কুল, ব্রাহ্ম স্কুল, কলিকাতা কলেজ প্রভৃতি কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। নানা কারণে তাঁহার সে সব প্রয়াস স্থায়ী হইতে পারে নাই। এই বৎসর তিনি ভারত সংস্কার সভার উদ্যোগে যুবকদের উচ্চশিক্ষার জন্য ‘আলবার্ট কলেজ’ স্থাপন করিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার চারি বৎসর পরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মেলামেশার জন্য এবং পারস্পরিক আলোচনার জন্য কেশবচন্দ্র ‘আলবার্ট হল’ ও ‘আলবার্ট ইনষ্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই হলে একটি সাধারণ লাইব্রেরি ও পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন কলিকাতায় একমাত্র টাউন হল ছিল, কিন্তু বাঙালিদের নিজস্ব এমন একটি জায়গা ছিল না যেখানে প্রীতি সম্মেলন, বক্তৃতা ও আলোচনা, সর্বসাধারণের সভা প্রভৃতি হইতে পারে। আলবার্ট হল স্থাপন করিয়া কেশবচন্দ্র বাঙালির এই অভাবটি দূর করিয়াছিলেন।

দেখিতে পাইতেছি, সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথাই কেশবচন্দ্র চিন্তা করিতেন এবং ভারত সংস্কার সভার মাধ্যমে সাধ্যমত তাহাকে রূপ দিবার প্রয়াস পাইতেন। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে কেশবচন্দ্র সেনই সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক। শশীপদ, বিবেকানন্দ প্রভৃতিদের কার্যক্ষেত্র তিনিই তো প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃত সমাজসংস্কার বলিতে কি বুঝায়, সে বিষয়ে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দেই কেশবচন্দ্রের মনে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছিল। সেই সময়ে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে *Social Reformation in India* নামে তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সংস্কার বলিতে moral,

social, educational ও domestic—এই চার প্রকার সংস্কারের কথাই বলিয়াছিলেন। সমাজ সংস্কার কথার কথা নয়—ইহা অতি কঠিন জিনিস। তাই তো কেশবচন্দ্র সমাজ সংস্কারের মূলনীতি নির্ধারণ করিয়া সেদিন বলিয়াছিলেন :—"Reformation signifies forming anew. Every reformer should therefore not only destroy absurd and corrupt institution, but build up positive institutions of undoubted usefulness and purity···The thorough reformation of native society is the object of the Brahmo Samaj. It proposes to give it a re-organisation upon the basis of pure faith, and adore it with useful institutions." দশ বৎসর পূর্বে তিনি যাহা বলিয়াছেন, দেখিতে পাইয়াছি, কেশবচন্দ্র তাহাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ভূমিকাটি সেদিন এই ভাবেই সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। Thoroughness—কেশব-প্রতিভার ইহাই ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোনো চিন্তা, কোনো কাজই তিনি কখনো half-done বা অসম্পূর্ণভাবে করিতেন না। নূতন যুগ আসিয়াছে, পুরাতন লইয়া থাকিলে আর চলিবে না, সমাজকে ভাঙিতে হইবে, ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হইবে—এমনভাবেই কেশবচন্দ্র বাংলার সমাজ জীবনকে সেদিন সকল দিক দিয়া এক নূতন গরিমা, এক নূতন ব্যঞ্জনা দিয়া গিয়াছেন। বাঙালি যদি কেশবমনীষার এই দিকটি গভীরভাবে অনুশীলন করিত, তাহা হইলে সমাজসংস্কারক হিসাবে কেশবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, তাহা সে বুঝিতে পারিত।

॥ পনর ॥

শিক্ষা বিস্তারে, বিশেষ করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে কেশবচন্দ্রের প্রয়াস বিশেষভাবেই স্মরণীয়। শিক্ষার ব্যাপারে তাঁহার মতন positive blue print আর কেহই দিতে পারেন নাই। এ-বিষয়ে তাঁহার চিন্তা-ভাবনার সম্যক পরিমাপ আজো হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কেশবচন্দ্র ভারতে ও ইংলণ্ডে তাঁহার বিবিধ বক্তৃতা, নানা রচনা ও রাজপুরুষদের নিকট লিখিত একাধিক পত্রে বার বার জোর দিয়া বলিয়াছেন—দেশের প্রতিটি মানুষ যাহাতে সুশিক্ষা লাভ করে এবং তাহার সুযোগ পায়, সে-বিষয়ে সরকারের অববহিত হওয়া কর্তব্য। এই 'সুযোগ' কথাটির উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। অভিজাত বংশের সন্তান হইলেও কেশবচন্দ্র যেদিন হইতে তাঁহার দেশ এবং জাতির উন্নতিকল্পে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তিনি সমাজে শ্রেণী-বৈষম্য উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি বিশ্বাস করিতেন যে শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক অর্থবান ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না ; প্রগতিশীল ও উন্নত জাতি গড়িয়া তুলিতে হইলে ধনীদরিদ্র, উচ্চনীচ নির্বিশেষে দেশের আপামর জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। তিনি মনে করিতেন যে কতিপয় বিত্তশালী বা তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকিলে তাহা জতিভেদের মতো আরেকটি বর্ণ-বিভাগ সৃষ্টি করিবে। এই প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের *England's duty to India* বক্তৃতাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই বক্তৃতার একস্থানে তিনি বলিয়াছেন : "সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই কি বিদ্যাশিক্ষা প্রসারিত হইয়াছে, না তাহার মঙ্গল-জ্যোতি কেবল উচ্চশ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে ? ···বাংলা দেশে প্রতি ৩২৮ জন ব্যক্তির মধ্যে মাত্র একজন শিক্ষা পাইতেছে। সারা ভারতে কোটি কোটি লোকের বিন্দুমাত্র অক্ষর পরিচয় নাই। এই অগণিত শিক্ষাবঞ্চিত জনসাধারণের কী ভবিষ্যৎ ?"

বলিয়াছি, মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারেই কেশবচন্দ্র সমধিক যত্নবান ছিলেন। দেশে যাহাতে সত্বর স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ঘটে তাহার জন্য তাঁহার উদ্যমের অন্ত ছিল না। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন যে দেশে সুস্থ সবল ও উচ্চমানসম্পন্ন জাতি গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিতা নারী একান্ত অপরিহার্য। উপরি উক্ত বক্তৃতায় এই বিষয়ে কেশবচন্দ্রের উক্তি খুবই স্পষ্ট। শাসক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেছেন: "ইংলণ্ড যদি ভারতকে সুশিক্ষিত মাতা প্রদান না করে, যদি এ-দেশে স্ত্রীশিক্ষার সুব্যবস্থা ইংলণ্ড না করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংলণ্ডের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি থাকিয়া যাইবে।" এই ত্রুটির পরিণাম যে ভয়াবহ, সে-কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি যাহা চিন্তা করিতেন, তাহা কার্যে পরিণত করিতে বিলম্ব করিতেন না। ভাবুকতা ও কর্মোদ্যমের এমন সম্মেলন আমরা একমাত্র তাঁহার মধ্যেই দেখিয়াছি। কর্মজীবনে অবতীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রচেষ্টায় নানা ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই শহরে স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারত সংস্কার সভা স্থাপনের পর হইতেই এই বিষয়ে তাঁহার প্রয়াস যেন একটি concrete রূপ লইতে থাকে। এই সভার স্ত্রীজাতির উন্নতি বিধানের জন্য বিভাগটির চার দফা কার্যসূচী নির্দিষ্ট হইয়াছিল, যথা: (১) বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন; (২) অন্তঃপুরিকাদের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা; (৩) মেয়েদের পাঠের উপযোগী পুস্তক ও পত্রিকা প্রচার এবং (৪) মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণ ও পারিতোষিক বিতরণ। কেশবচন্দ্র প্রতাপচন্দ্র ও উমেশচন্দ্রকে যথাক্রমে এই বিভাগের সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রমজীবি ব্যক্তিদের ইংরেজি ও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি ১৩নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল পটলডাঙায় এবং মিস্ পিগট এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেশে শিক্ষা-বিস্তারের বিষয়ে কেশবচন্দ্র যে কত আগ্রহশীল ছিলেন তাহার পরিচয় মিলিবে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুককে লেখা পত্রগুলির মধ্যে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে তারিখের পত্রে দেখিতে পাই যে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারের

প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া তিনি সমগ্র বিষয়টিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেন ; যথা ঃ (১) সাধারণ লোকের শিক্ষা ; (২) উচ্চশ্রেণীর উন্নততর শিক্ষা ; (৩) নীতি শিক্ষা ; (৪) শিল্প ও পারিভাষিক শিক্ষা ; ও (৪) স্ত্রী-শিক্ষা। এই বছরই ১২ই জুলাই বড়লাটকে লেখা অপর একটি চিঠিতে কেশবচন্দ্র দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য বৃটিশ সরকার যে সব স্কুল, কলেজ, বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করেন (তাঁহার এই আনন্দপ্রকাশকে অনেকে 'রাজভক্তি' বলিয়া ভুল করিয়াছেন), কিন্তু ইহাও বলেন যে ব্যবস্থা আরো ব্যাপক হওয়া দরকার। তিনি আরো লিখিলেন ঃ "অজ্ঞানতা, অকাল মৃত্যু ইত্যাদি হইতে ভারতবাসীকে বাঁচাইতে হইলে শিক্ষার প্রসার ব্যতীত আর কোনো উপায় নাই।" ১৮ই জুলাই বড়লাটকে আবার লিখিলেন ঃ "অনেকের ধারণা অভিজাত শ্রেণীর মানুষদের শিক্ষা দিলেই সে শিক্ষা স্বাভাবিকভাবেই নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে গিয়া পৌঁছাইবে, কিন্তু এই ধারণা যে কত ভুল ও অসার তাহা বলিবার নয়। শ্রেণী-ধর্ম নির্বিশেষে দেশের প্রত্যেকটি লোকের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা সরকারের করা কর্তব্য।" "করা কর্তব্য"—এমন কথা কোনো রাজভক্তের কলম হইতে বাহির হইতে পারে না। ২৬শে জুলাই তারিখে লেখা একটি পত্রে কেশবচন্দ্র অভিযোগ করিলেন ঃ "কেবল একদল ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় অথচ দরিদ্র জনসাধারণের উপর শিক্ষা-সম্পর্কে কর (tax) বসান হয়।" ১লা আগষ্ট কেশবচন্দ্র আর একখানি চিঠিতে সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিলে কি কি বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিলেন। দেখা যায়, চিন্তাশক্তির উদ্রেকের জন্য এই চিঠিতে তিনি বিজ্ঞান শিক্ষাদানের কথাও বলিলেন। ১৬ই আগষ্ট তারিখের লেখা তাঁহার সর্বশেষ চিঠিতে কেশবচন্দ্র ভারতবাসীর ধর্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়াও ধর্মমূলক নীতি-শিক্ষাদানের (moral education) প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিলেন। এই ভাবেই কেশবচন্দ্র তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশে শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে ভাবিয়াছেন ও কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। শুধু মুষ্টিমেয় ধনাঢ্য ব্যক্তি নয়, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে জনসাধারণ শিক্ষিত হইয়া উঠুক—বিশেষ করিয়া

শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করুক—ইহাই ছিল কেশবচন্দ্রের অন্তরের ইচ্ছা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কেশবচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে দেশের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহও করিতেন। পরবর্তীকালে তাঁহার এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রকে যাঁহারা কেবলমাত্র ভাবসর্বস্ব বা ইমোশনাল মানুষ বলিয়া থাকেন, শুধু শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁহার বাস্তবতাবোধের পরিচয় লইতে তাঁহাদিগকে একবার অনুরোধ করিব। তাঁহার সমগ্র জীবনের বহুমুখী সংস্কার প্রয়াসের মধ্যে, বিশেষভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে, কেশবচন্দ্রের দূরদৃষ্টি এবং উদ্যমের কথা স্মরণ করিয়া আমরা যেন কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

মহর্ষির নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর একে একে ছয় বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথ দূর হইতেই তাঁহার পুত্রাধিক ব্রহ্মানন্দের অদ্ভুত কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কেশবচন্দ্র নূতন সমাজ স্থাপন করিয়াছেন, নূতন মন্দির গড়িয়াছেন, সারা ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজকে সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছেন, বিরাট একটি প্রচারকমণ্ডলী গঠন করিয়া প্রচারব্রতকে জীবন্ত ও ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছেন, ব্রাহ্মিকাসভা স্থাপন করিয়া নারীদের নব জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, ইংলণ্ডে গিয়াছেন, সেখানে গিয়া ব্রাহ্মসমাজের ও ভারতের দাবীকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তারপর ভারতে ফিরিয়া আসিয়া যুগপৎ বহুমুখী সমাজসংস্কার প্রবর্তন করিয়া বাংলা তথা ভারতের সমাজজীবনে নূতন এক তরঙ্গ তুলিয়াছেন, 'ইণ্ডিয়ান মিরার'কে দৈনিকে পরিণত করিয়াছেন, এক পয়সা মূল্যের 'সুলভ সমাচার' প্রকাশ করিয়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নূতন দিক্ নির্দেশ করিয়াছেন—ছয় বৎসরের মধ্যে একা কেশবচন্দ্র এতগুলি কাজ করিয়াছেন। এইসব দেখিয়া শুনিয়া মহর্ষি যে গৌরব বোধ করিতেন, ইহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

দুইজনেই বহুকাল কলিকাতায় ছিলেন না। তারপর মহর্ষি কলিকাতায়

ফিরিলেন। কেশবচন্দ্র একদিন কয়েকটি দ্রব্য উপহার লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বহুদিন পরে পিতা-পুত্রে এই সাক্ষাৎ—আজ দুইজনের মধ্যে কোনো উত্তেজনা নাই, এক স্নিগ্ধ শান্তির পরিবেশে উভয়ে উভয়ের সঙ্গে মিলিত হইলেন। এই সাক্ষাৎকারের পর মহর্ষি দুইবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আসিলেন এবং উপাসকমণ্ডলীর সহিত নিমীলিতনেত্রে উপাসনা করিলেন। আচার্য কেশবচন্দ্র উপরে বসিয়া বক্তৃতা ও প্রার্থনা করিতেছেন, আর প্রধান আচার্য দেবেন্দ্রনাথ পাশে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতেছেন। সে অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হইল। এই সময়ে আদি সমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ—এই দুই সমাজের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের প্রয়াস হইয়াছিল। এই উপলক্ষে দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে কেশবচন্দ্র একটি সন্ধিপত্র রচনা করেন। এই পত্রের শেষভাগে কেশবচন্দ্র লিখিলেনঃ "আদি ব্রাহ্মসমাজ যথাসাধ্য হিন্দুজাতির সহিত যোগ রাখিয়া পুরাতন প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার এবং যাবতীয় সামাজিক কার্যে ব্রাহ্মধর্মের মতানুসারে অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন; প্রত্যেকে আপন স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত যোগ দিবেন।" সন্ধিপত্রই রচনা হইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহাতে কোনো কাজ হইল না। ব্রাহ্মসমাজে সেই দলাদলিই রহিয়া গেল। মিলনের চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া কেশবচন্দ্র স্বভাবতঃই ক্ষুব্ধ হইলেন। কেশবচন্দ্রের সহিত মহর্ষি মিলিতে পারিলেন না এবং ইহা না পারিবার মূলে ছিল দেবেন্দ্রনাথের খ্রীষ্ট-বিভীষিকা। কেশবচন্দ্রের মতন দেবেন্দ্রনাথ খ্রীষ্ট বা খ্রীষ্টধর্মের মর্মজ্ঞ ছিলেন না—রামমোহনের উত্তর-সাধক হিসাবে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজীবনের ইহাই ছিল একটি বড়ো রকমের ত্রুটি। কেশবচন্দ্রের মনীষা বিশ্বের সকল ধর্মকেই সত্য বলিয়া মানিতে পারিত—দেবেন্দ্রনাথ এতখানি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে মহর্ষি-পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতৃদেবের আত্মজীবনীর ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় যথার্থই লিখিয়াছেন, "My father drew back in alarm. There were other differenes between the two. My father was intensely national in his religious ideal, whereas Keshub's

outlook was *more cosmopolitan.*" কেশবচন্দ্রের ধর্ম মিলন এবং সামঞ্জস্যের ধর্ম—রামমোহনের উদার বিশ্বজনীন আদর্শের ইহাই ছিল স্বাভাবিক পরিণতি। মিলিতে না পারিলেও, কেশবের প্রশংসা কীর্তনে মহর্ষি কোনোদিনই কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাই দেখিতে পাই, ৪১তম মাঘোৎসবে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং আসিয়া বলিয়া গেলেন, "ধন্য কেশবচন্দ্রকে যে তিনি এই ব্রহ্মমন্দির সংস্থাপন করিয়া ব্রহ্মের আরাধনার জন্য আমাদের সকলকে এখানে অবকাশ দিয়াছেন।…পৃথিবীময় ব্রাহ্মধর্ম ঘোষণা করিবার জন্য তাঁহার ব্রত। যেমন উৎসাহ, তেমনি উদ্যম, যাহা তিনি কল্যাণ মনে করেন, তাহাই অনুষ্ঠানে পরিণত করেন।"

ভারত সংস্কার সভার আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে "বেহালা এবং পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহ জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। গভর্ণমেণ্ট জ্বররোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সহায়তাবিষয়ে নিতান্ত ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। ভারত সংস্কার সভা এ সময়ে উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। এই সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুকড়ি ঘোষ সপ্তাহে দুইদিন বেহালায় গমন করিতেন। তিন দিনের উপযুক্ত ঔষধ পথ্যাদি সঙ্গে লইয়া তাঁহারা যাইতেন। এই দুইদিন তাঁহাদিগকে প্রায় সমুদয় দিন উপবাসী থাকিয়া রোগীদিগকে ঔষধপথ্য বিতরণ করিতে হইত।" এমনিভাবেই সেদিন সেবার প্রেরণা কেশবচন্দ্র জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র এই সময়ে শুধু যে বাহিরের বিবিধ কাজ লইয়া থাকিতেন, তাহা নহে; সমাজের আধ্যাত্মিক বিষয়েও তাঁহার সমান সজাগ দৃষ্টি ছিল দেখিতে পাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখা—ব্রাহ্মবন্ধু সভা, ব্রাহ্মিকা সভা, ব্রহ্মবিদ্যালয়—প্রত্যেকটিতে নূতন উদ্যম দেখা দিল, প্রত্যেকটি বিভাগের কার্যে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইল। একা কেশবচন্দ্র এই সময়ে যেন শতহস্তে কার্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু এত কার্যের ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁহার জীবনে দিন দিন গভীর যোগের অভ্যুদয় হইল। সে কথা পরে বলিতেছি।

কেশবচন্দ্রের আর একটি কর্মকীর্তির কথা এইখানে উল্লেখ করিব। ইহা তাঁহার 'ভারতাশ্রম'। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্ব ও আদর্শ দেশময় প্রচারের জন্যই এই আশ্রমটি স্থাপন করেন, কারণ তিনি জানিতেন যে "বিশুদ্ধ ধর্মমত সকল মানবপরিবারে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, কেহ তাহা বুঝিতে পারে না।" ইহাকেই তিনি বলিয়াছেন 'Spiritual Commonwealth' বা 'পরিবার সাধন' অথবা মণ্ডলীবদ্ধ সাধন। আইডিয়ার দিক দিয়া ইহা সত্যই অভিনব। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন: "কেশববাবু ইংলণ্ডে ইংরাজের গৃহকর্ম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। সর্বদা বলিতেন, middle class English Home-এর ন্যায় Institution পৃথিবীতে নাই। তাঁহার মনে হইল কতকগুলি ব্রাহ্মপরিবারকে একত্র রাখিয়া কিছু দিন সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে কাজ, সময়ে উপাসনা, এইরূপ নিয়মাধীন রাখিয়া শৃঙ্খলামত কাজ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা সেই ভাব লইয়া গিয়া চারিদিকের ব্রাহ্মপরিবারে ব্যাপ্ত করিতে পারে। এই ভাব লইয়া তিনি ভারতাশ্রম স্থাপন করিলেন। তাঁহার অনুগত প্রচারকগণ সর্বাগ্রে গেলেন। তৎপরে আমরাও অনেকগুলি পরিবার বাহির হইতে গেলাম। আমরা কেশববাবুর মনের ভাবটা কাজে করিয়া দেখিতে কৃতসংকল্প হইলাম।" কেশবচন্দ্র সমাজের সভ্য ও উপাসকমণ্ডলীদের মধ্যে একতা ও প্রেমের ভাব বর্ধিত করিতে ব্যগ্র ছিলেন; ইঁহাদের সকলকেই তিনি এক আধ্যাত্মিক ও ধর্ম পরিবারের লোক বলিয়া মনে করিতেন। এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু লিখয়াছেন: "কেশববাবুর আহ্বানে আমরা অনেকে সপরিবারে ভারত আশ্রমে গিয়া বাস করিয়াছিলাম। সেখানে একত্র উপাসনা, একত্র আহার, সময়ে পাঠ, সময়ে কার্য প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছিল।" শুধু তাহাই নয়। বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ, নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাঁহারা তখন এখানে বাস করিতেন তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যে কেশবচন্দ্র ধর্মোৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা প্রমত্ত উদ্যমে ভারতময় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে সাত মাইল দূরে বেলঘরিয়ার এক প্রশস্ত বাগান বাড়িতে এই আশ্রমটি স্থাপিত হইয়াছিল। এইখানে পঁচিশটি ব্রাহ্মপরিবার একত্রে বাস করিতেন ; কেশবচন্দ্রও তাঁহাদের পৈতৃকভবন পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে এখানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। সকলেই কেশবচন্দ্রের বিমল সহবাসে থাকিবার সুযোগ পাইলেন ; সকলেই নিজ নিজ ব্যয়ের অংশ দিয়া একান্নভুক্ত পরিবারের ন্যায় থাকিতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক সঙ্গে উপাসনা চলিত। সকলেই কেশবচন্দ্রের পরামর্শ ও সদুপদেশ পাইতেন। কেশবচন্দ্রের পত্নী জগন্মোহিনীকে ইংরেজি শিখাইবার ভার ছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর উপর। আচার্য্য-পত্নীকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার 'আত্মচরিত' গ্রন্থে যে তিনটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার দুইটিতে জগন্মোহিনী দেবীর প্রকৃতির সরলতা অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর অপরটি কেশবচন্দ্রের আত্মসংযম শক্তির অদ্ভুত নিদর্শন। ভারতাশ্রম চার-পাঁচবৎসর সগৌরবে চলিয়াছিল এবং পরে উহাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিতর্ক ও গৃহবিবাদের সূচনা হইয়াছিল, তাহা একদিকে যেমন কেশবচন্দ্রের সুনামকে স্পর্শ করিয়াছিল, তেমনি উহা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও বিচ্ছেদ আনিয়া দিয়াছিল ; এই বিচ্ছেদের পথেই আসিয়াছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। মোট কথা, ভারতাশ্রম কেশবচন্দ্রের একটি ব্যর্থ প্রয়াস বলিয়াই স্বীকৃত হইবে। বাংলার মাটিতে বিলাতি আদর্শের Home টিকিল না। প্রেমসুন্দর বসু এই প্রসঙ্গে তাই লিখিয়াছেন : "Keshav's idea of the happy family was hardly realised" এবং ইহা না হইবার মূলে ছিল ব্রাহ্মদের মধ্যে বিবাদ আর প্রচারকগণের মধ্যে মতানৈক্য। এই বিবাদ ও মতানৈক্য বহুদূর পর্যন্ত গড়াইয়াছিল এবং কেশবচন্দ্রকে ইহার জন্য যথেষ্ট মূল্যও সেদিন দিতে হইয়াছিল। সে অপ্রীতিকর কাহিনীর সবিস্তার উল্লেখে আমরা বিরত রহিলাম। কেশববিরোধী দল এই সময় হইতেই কেশবচন্দ্রের মত ও কার্যের সমালোচনা করিতে থাকেন এবং নিয়মতন্ত্রের প্রশ্ন তুলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেশবচন্দ্রকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করেন। এই তুলনা কেশবচন্দ্র সম্পর্কে একেবারেই চলিতে পারে না। যিনি ব্রাহ্মপ্রতিনিধিসভা স্থাপন করিয়া আদি সমাজ হইতে পৃথক হইলেন,

সেই কেশবচন্দ্রকে নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করা অন্যায় এবং অসঙ্গত।

এইবার ব্রাহ্মবিবাহবিধি আন্দোলনের কথা।

নবজাগরণের তরঙ্গশীর্ষে ভারতবর্ষে তখন শুধু একটি মানুষ, একটি প্রতিভা, আর একটি ব্যক্তিত্ব। সমগ্র ভারতবাসীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি তখন তাঁহারই দিকে নিবদ্ধ বলিলেই হয়। তিনি কেশবচন্দ্র সেন। সমাজসংস্কারক কেশবচন্দ্রের প্রতিভা ও উদ্যমের পরিপূর্ণ পরিচয় এই ব্রাহ্মবিবাহবিধি আন্দোলনের মধ্যেই আমরা পাই। আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম সমাজসংস্কারক রামমোহন, দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর। ইঁহাদের পরই কেশবচন্দ্র। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের মেয়েদের কথা কেহ চিন্তা করে নাই। অন্ধকারের পাতাল গহ্বরে কয়েক শতাব্দী ধরিয়াই যেন জাতির নারীত্বের মহিমা ও অস্তিত্ব বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তাহার সত্তা ছিল পুরুষের পদদলিত। কেহ তাহার উদ্ধারের কথা চিন্তা করিল না। তারপর কালচক্রের আবর্তনে, ইতিহাসের অমোঘ বিধানে মুঘলযুগের একদিন অবসান হইল। ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব এবং শতাব্দীকালের মধ্যেই সেই রাজত্বের অবসানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিরঙ্কুশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। অষ্টাদশ শতকেও ভারতের তথা বাংলার নারীর দুর্ভাগ্যের কথা কেহ চিন্তা করিল না। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ আর সামাজিক অনুশাসনের পাষাণভারের তলায় তাহার স্বাতন্ত্র্য শতভাবে লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আসিলেন রামমোহন—ভারতের স্ত্রীজাতির প্রথম বন্ধু রামমোহন। বর্বর সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া তিনি ভারতে নারীজাতির মুক্তির পথ প্রথম প্রশস্ত করিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হইল।* ইহার সাতাশ বৎসর পরে সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে আসিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁহার বিধবাবিবাহ আন্দোলন উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতের সমাজ-জীবনের মূল ধরিয়া নাড়া দিয়াছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ

* লেখকের 'রামমোহন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

আইন পাশ হইল।* বাংলা তথা ভারতের সমাজজীবনের উপর এই দুইটি সংস্কারের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। বিধবাবিবাহ আইন যখন পাশ হয় তখন কেশবচন্দ্রের বয়স মাত্র আঠার বৎসর; কিন্তু ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, সেই বয়সেই তিনি বিদ্যাসাগরের এই সমাজসংস্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার তিন বছর পরে তিনি তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া 'বিধবাবিবাহ' নাটক অভিনয় করেন। কেশবচন্দ্র তখন ব্রাহ্মসমাজের তরুণ নেতা। এই নাটকখানির অভিনয়ে ব্রাহ্মসমাজে খুব কাজ হইয়াছিল এবং হিন্দুসমাজে যাহাতে বিধবাবিবাহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়, সে বিষয়ে সাহায্য ও চেষ্টা করা ব্রাহ্মসাজের একটি বিশেষ কার্য বলিয়া তখন গৃহীত হইয়াছিল। সতীদাহ নিবারণ আইনের অপরিহার্য উপসংহার হিসাবেই কালক্রমে বিধবা-বিবাহ আইন আসিয়াছিল। কিন্তু আর একটি সামাজিক আইন যে এই একই সূত্রে আসিতে পারে, ইহা প্রথম উপলব্ধি করিলেন কেশবচন্দ্র সেন। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের ষোল বৎসর পরে আসিল ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি আন্দোলন এবং এই স্মরণীয় আন্দোলনের নেতা ছিলেন সেদিন কেশবচন্দ্র। ব্রাহ্মসমাজ তথা কেশবচন্দ্রের জীবনেতিহাসে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়; তাই বিষয়টি আমরা একটু সবিস্তারেই আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার বৎসরেই ইহার প্রথম অধিবেশনে ব্রাহ্মবিবাহের প্রশ্নটি আবার নূতন করিয়া উঠিল। তখনো ব্রাহ্মসমাজে সামাজিক ক্রিয়াকর্মে হিন্দু ব্যবস্থাই অনেকটা মানিয়া চলা হইত। পরে শ্রাদ্ধ, জাতকর্ম, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ একটি অনুষ্ঠান পদ্ধতি রচনা করেন। ব্রাহ্মসমাজে যখন জাতিভেদ নাই, তখন প্রশ্ন উঠিল—হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে যে সকল রাজনিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা ব্রাহ্মবিবাহে বর্তিতে পারে কি না? ইহা আলোচনা করিবার জন্য সাতজনকে লইয়া প্রথমে একটি কমিটি গঠিত হয়। (অক্টোবর, ১৮৬৭) দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, ব্রজসুন্দর মিত্র, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি এই কমিটিতে ছিলেন। ব্রাহ্ম বিবাহ কি?—এই প্রশ্নটি

* লেখকের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

প্রথমে আনন্দমোহন বসু তুলিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন এ্যাডভোকেট জেনারেলের নিকটে ব্রাহ্মবিবাহ রাজবিধি সঙ্গত কি না, এই সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেনঃ "ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় যে কোন ধর্মসমাজের বিবাহ প্রচলিত হিন্দু ব্যবস্থা অনুসারে সম্পন্ন হয় নাই, অথচ তৎ-সম্বন্ধে কোনো বিশেষ আইন তৈরি হয় নাই, সে বিবাহ আমার মতে অসিদ্ধ। সুতরাং ইহাই স্থির হইতেছে যে, আইনের বর্তমান অবস্থায়, এরূপ বিবাহে বরকন্যা বদ্ধ নহেন। স্বামী যদি পত্নীকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে পত্নী আইনের আশ্রয় লইতে পারেন না ; এ বিবাহে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা আইনের চক্ষে সিদ্ধ নহে এবং দায় প্রাপ্ত হইতে পারে না।" (ইণ্ডিয়ান মিরার, ১৫ই আগষ্ট, ১৮৬৬)

সুতরাং অবস্থাটা এই দাঁড়াইল যে, রাজবিধি না থাকাতে আইনের চক্ষে ব্রাহ্মবিবাহ অসিদ্ধ। তখন ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা বিধেয় কি না, ইহা বিবেচনা করিবার জন্য ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একটি অধি-বেশন বসিল। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন কেশবচন্দ্র। উপরে যে কমিটির উল্লেখ করা হইল তাহার সাতজন সভ্যের মধ্যে চারজন সদস্য এই বিষয়ে তাঁহাদের মত জানাইয়াছিলেন ; চারজনের মধ্যে দুইজন বলিলেন, ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমত বিধিসিদ্ধ নয় ; একজন বলিলেন, ব্রাহ্মবিবাহকে আইনতঃ সিদ্ধ করা প্রয়োজন আর তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, ব্রাহ্মবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু এ বিষয়ে আইন খুব স্পষ্ট নয়। তখন কেশবচন্দ্র সেই সভায় সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করিয়া তিনটি প্রশ্ন তুলিলেনঃ (১) ব্রাহ্মবিবাহ কি? (২) প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্র মতে ব্রাহ্মবিবাহ সিদ্ধ কি না? (৩) যদি সিদ্ধ না হয়, ব্রাহ্মবিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন—"ব্রাহ্মধর্মে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এক সত্য ঈশ্বরের অর্চনাপূর্বক অপৌত্তলিক পদ্ধতিতে যে বিবাহ করেন—তাহাই ব্রাহ্মবিবাহ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "যখন হিন্দুশাস্ত্রসিদ্ধ

কোনপ্রকার বিবাহের অনুষ্ঠিত অঙ্গ ব্রাহ্মবিবাহে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, তখন ব্রাহ্মবিবাহ কি প্রকারে হিন্দুবিবাহরূপে সিদ্ধ হইবে?" তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্মবিবাহ বিধিসিদ্ধ করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা উচিত।"

আনন্দমোহন বসু কেশবচন্দ্রের উক্তি সমর্থন করিলেন এবং এই বিষয়ে "গভর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করা যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিলেন।" সেদিনকার এই সভায় উপস্থিত ব্যক্তি বর্গের মধ্যে ছিলেন, কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, নবগোপাল মিত্র, আনন্দমোহন, কালীমোহন দাস, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি। সভায় স্থির হইল যে, "ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করা আবশ্যক।"

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে এই আবেদন লইয়া কেশবচন্দ্রই নিজে সিমলায় গিয়াছিলেন (১৮৬৮, সেপ্টেম্বর)। তখন ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন সচিব স্যার হেনরি মেইনের সহিত তাঁহার ব্রাহ্মবিবাহ বিধি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল। তিনি আইনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদের মতন প্রগতিশীল সমাজে বিবাহের অধিকার স্বীকৃত হওয়া যে খুবই যুক্তিসঙ্গত দাবী, ইহাও স্যার হেনরি কথাবার্তা প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় তিনি আরো একটি কথা বলিয়াছিলেন; সেটি এই: "It would be difficult for legal purposes to define a Brahmo, and if no definition was given, there might shortly be petitions for relief by persons who were in the same legal position as the present applicants," এবং এই কারণ দর্শাইয়াই তখন বিলের যে খসড়া তৈরি হইয়াছিল উহাতে 'ব্রাহ্ম' কথাটিকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয় নাই—ইহা অনেকটা সিভিল ম্যারেজ বিলের অনুরূপই ছিল, যাহাতে ঐ আইনের সুযোগ ভারতবর্ষের খ্রীষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায় ব্যতীত আর সকলেই গ্রহণ করিতে পারিত। সেই সময়ে ব্রাহ্ম ম্যারেজ বিলটি বিশেষভাবে আলোচনা করিবার জন্য একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মবিবাহ আন্দোলনের উদ্যোগ পর্ব এই পর্যন্তই।

তারপর ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মবিবাহ বিধি বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলেন; তাঁহার সমস্ত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য তিনি ইহাতে প্রয়োগ করিলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, আর আদি ব্রাহ্মসমাজ মানেই তো দেবেন্দ্রনাথ, সুতরাং ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাশ করাইতে কেশবচন্দ্রকে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হইল। আদি সমাজ হইতে বিলের বিরোধিতা করিয়া বড়লাটের নিকট একটি আবেদন প্রেরিত হইল। সেই আবেদনে বলা হইল যে, এই বিবাহবিধি ব্রাহ্মসমাজের জন্য হইতেছে, অথচ অধিকাংশ ব্রাহ্ম ইহা চাহেন না; সেই সঙ্গে ইহাও বলা হইল যে, "কেশবচন্দ্র সেন সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নহেন।" মিরারে এই আবেদনের প্রতিবাদ করিলেন কেশবচন্দ্র। সেই প্রতিবাদে তিনি বলিলেন, অধিকাংশ ব্রাহ্ম আইন চাহেন না, ইহা সত্য নহে। কেন না, তেতাল্লিশটি ব্রাহ্মসমাজ আইনের স্বপক্ষে স্বাক্ষর দিয়াছেন। আন্দোলন ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিল না, লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকাতেও এই আইনের সমর্থনে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাল্যবিবাহের দেশ ভারতবর্ষে ছেলে-মেয়েদের বিবাহের কোনো নির্দিষ্ট বয়স ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তদশকে কেশবচন্দ্র বিষয়টি গভীর-ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেন। সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে হইলে, পুরাতন বহু প্রথার সংস্কার প্রয়োজন। মেয়েদের বিবাহের বয়স ঠিক কি হওয়া উচিত, তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের অভিমত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ আত্মারাম পাণ্ডুরং, ডাঃ চার্লস, ডাঃ স্মিথ, ডাঃ নবীনকৃষ্ণ বসু, ডাঃ এ. ভি. হোয়াইট প্রমুখ তৎকালীন বিশিষ্ট দেশী ও বিদেশী চিকিৎসকগণের কেহই অবশ্য বয়স সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স এগার আর সর্বোচ্চ বয়স কুড়ি হওয়া উচিত—এই অভিমত তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র এইখানেই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি প্রসিদ্ধ

পণ্ডিতগণের মতও সংগ্রহ করিলেন। ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রমতে বিধিবদ্ধ, আদি ব্রাহ্মসমাজের এই যুক্তি অনেকের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতেছে দেখিয়াই তিনি পণ্ডিতগণের মত চাহিয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই আগষ্ট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে তিনি ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, হরিদাস শিরোমণি, পুরুষোত্তম ন্যায়রত্ন, শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি প্রমুখ বাংলার তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের নিকট পত্র পাঠাইলেন। ঐ পত্রে লেখা হইয়াছিল—"আপনারাই এই গুরুতর বিষয়ে যথার্থ মীমাংসা করিবার উপযুক্ত, এবং আপনাদের শাস্ত্রানুমোদিত বিধান অবশ্যই সর্বসাধারণের নিকট স্বীকৃত ও সমাদৃত হইবে।" তাঁহারা বলিলেন, হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রাহ্মবিবাহ অসিদ্ধ। কলিকাতায় বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণও ঐ প্রকার মত প্রকাশ করেন। কাশীর ব্যোপদেব শাস্ত্রী, রাজারাম শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উনচল্লিশজন পণ্ডিত ব্রাহ্মদিগের বিবাহ অবৈদিক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। কাশীর পণ্ডিতদের মত সংগ্রহ করিবার জন্য আদি সমাজের পক্ষ হইতে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ স্বয়ং সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি নাকি কৌশল করিয়া তাঁহাদের অনুকূলে মত সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। তখন ধর্মতত্ত্ব, মিরার ও সোমপ্রকাশের স্তম্ভে এই লইয়া প্রবল বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বহিয়া যায়। বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে পর্যন্ত এই বিষয়ে চিঠি প্রকাশিত হইয়াছিল। এইসব তর্ক-বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদের ভিতর দিয়া এই সত্যটিই সেদিন প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে—ব্রাহ্মেরা যখন হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাস করেন না এবং সেই কারণে তাঁহারা প্রতিমা পূজা পৌত্তলিকতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের পক্ষে হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি মানিয়া লওয়া অসম্ভব।

১৮৭১, ৩০ সেপ্টেম্বর। শনিবার।

স্থান—টাউন হল। সময়—বৈকাল চারটা।

ব্রাহ্মবিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে ইহাই প্রথম জনসভা এবং ব্রাহ্মবিবাহ বিল সম্পর্কে জনমত সংগ্রহ করিবার জন্য ইহাই প্রথম প্রকাশ্য প্রয়াস।

টাউনহলের ইতিহাসে এই তারিখটি বিশেষভাবে স্মরণীয়; স্মরণীয় এই কারণে যে, এইদিন কেশবচন্দ্র এইখানে যে বক্তৃতাটি দিয়াছিলেন ভারতবর্ষের সমাজজীবনে তাহার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। ইহার ফলে যে আইন পাশ হইয়াছিল (Special Marriage Act III of 1872), আধুনিক ভারতবর্ষের উহাই ছিল প্রকৃত সমাজসংস্কার। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইনের পূর্বে যদিও পার্শী বিবাহ আইন, দি লেক্স লোসি আইন, (Lex Loci Act), দি নেটিভ কনভার্টস্ ম্যারেজ ডিসলিউসন আইন, সতীদাহ নিবারণ আইন ও বিধবা বিবাহ আইন—এই কয়েকটি আইন পাশ হইয়াছিল, কিন্তু এই কয়েকটি আইনই ছিল সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি প্রযোজ্য। ব্রাহ্ম ম্যারেজ বিল এই আইনগুলি হইতে স্বতন্ত্র, কারণ ইহা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রচিত হয় নাই, জাতীয় ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র তাই এই দিনের বক্তৃতায় ইহাকে জাতীয় বিবাহ সংস্কার বা *National Marriage Reform* বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

টাউন হলের এই স্মরণীয় সভার সভাপতি ছিলেন কেশবচন্দ্র। এই সভায় প্রায় আটশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় ব্যক্তিও ছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি, রামতনু লাহিড়ী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ গোপালচন্দ্র রায়, নবগোপাল মিত্র, রেভারেণ্ড ডাঃ মিচেল প্রভৃতি। সভার প্রারম্ভে নরেন্দ্রনাথ সেন, 'ভারতে বিবাহ আইন' (*The Marraige Law in India*) সম্পর্কে যে সুচিন্তিত বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা এদেশের সমাজসংস্কারের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। বিবাহের প্রশ্নটি সম্পর্কে আইনগত এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক—যতগুলি দিক থাকিতে পারে, তিনি তাহার সব দিকই আলোচনা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা শুনিয়া সভার পরবর্তী বক্তা হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ সেদিন বলিয়াছিলেন: "It has seldom been my lot to listen to such an exhaustive statement." সকলের বলা শেষ হইলে পরে কেশবচন্দ্র বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলিলেন:

'In waging open war with the opponents of the Brahmo

Mariage Bill, I do honestly believe that I have been for some time engaged in a crusade against untruth, impurity and superstition, and all manner of injuries and frightful social customs which have committed frightful havoc for centuries in this county...The Brahmo Marriage Bill contemplates a more radical and more comprehensive reformation than it is possible for the present generation of educated natives to imagine or conceive. It seens to overthrow caste and not mere idolatory, It contemplates inter-marriage between the Sikhs and the Bengalees, the inhabitants of Bombay and Madras, between the Tamil and the Telegu races in Southern India and the people of the North Western Provinces, The Bill contemplates *a union and fusion* of the many discordant and social elements which lie scattered in the amplitude of the Indian continent."

কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতারই পাল্টা জবাব হিসাবে ১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ট্রেনিং একাডেমির হলে দেবেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে আর একটি স্মরণীয় বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু; বক্তৃতার বিষয়—'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'। নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সভা ঐ বক্তৃতা দেওয়াইবার জন্য প্রধান উদ্যোগী ছিল। ব্রাহ্মবিবাহ আইনের আন্দোলন লইয়া আদি ও ভারতবর্ষীয় সমাজের মধ্যে যে বিবাদ চলিতেছিল, রাজনারায়ণ বসুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই বক্তৃতা সেই বিবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র ছিল। কিন্তু সরকারকে এক প্রবল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের এক অংশ বিলের বিরোধিতা করিতেছে, অপর অংশ আইন দাবী করিতেছে, এই অবস্থায় নামের পরিবর্তন সাধন ভিন্ন কি করিয়া বিল পাশ হইতে পারে? ইহার উত্তরে কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতায় বলিয়াছেলেন যে নাম পরিবর্তনে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।" It is not the designation we care for, we want the substance, we wish

that early marrage, poligamy and bigamy should he suppressed among us, and also idolatory and caste. If a comprehensive marriage law be given to all India, we shall have no reasons to complain.''—ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল ; সমগ্র ভারতবর্ষের জন্যই তিনি একটি ব্যাপক বিবাহবিধি (comprehensive marriage law) চাহিয়াছিলেন। কতখানি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সমাজসংস্কারক হইলে একজনের পক্ষে এই কথা চিন্তা করা সম্ভব, তাহা আজ বোধ হয় আমরা বুঝিতে পারিয়াছি।

২১ শে ডিসেম্বর সিলেক্ট কমিটি কাউন্সিলে তাঁহাদের অভিমত পাঠাইয়া দিলেন। কমিটির মন্তব্যে বিবাহের বয়স নির্ধারিত হইল পাত্রের পক্ষে আঠার আর পাত্রীর পক্ষে চৌদ্দ। বিরোধিদল অর্থাৎ আদি সমাজের ব্রাহ্মগণ এই সময় তাঁহাদিগকে 'হিন্দু ব্রাহ্ম' বা 'ব্রাহ্ম হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা হিন্দুসমাজের মধ্যেই রহিয়াছেন এমন কথাও বলিয়াছিলেন ; অন্যদিকে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে বলা হইল যে, তাঁহারা হিন্দু নহেন, মুসলমান নহেন, পাশী নহেন—তাঁহারা ভারতীয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি বিলটি আইনে পরিণত হইবার কথা ছিল, কিন্তু সেদিন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মিঃ ইংলিসের প্রতিরোধে উহা হইতে পারিল না এবং তারপর বড়লাট লর্ড মেও'র আকস্মিক শোকাবহ মৃত্যুর ফলে উহা কিছুকালের জন্য স্থগিত থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বিল পাশ হইবার ঠিক পাঁচ দিন পূর্বে কেশবচন্দ্র সমাজবিজ্ঞান সভার বার্ষিক অধিবেশনে *Reconstruction of Native Society* শীর্ষক একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার সংস্কারক-জীবনের ইহাই শেষ প্রসিদ্ধ বক্তৃতা। ১৯শে মার্চ বিলটি আবার ব্যবস্থাপক সভায় উঠিল এবং চার ঘণ্টা তর্ক-বিতর্কের পর বিলটি আইনে পরিণত হয়। বিলের পাণ্ডুলিপিতে যে নাম ছিল, তাহার পরিবর্তে বিলের মূল কাঠামো প্রায় বজায় রাখিয়াই উহা '১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইনের বিশেষ বিবাহ বিধি' (Special Marriage Act III of 1872), এই নামে আইনে পরিণত হইয়াছিল। চার বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও

চিন্তা আজ সার্থক হইল—"বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ হইল, কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুদের আনন্দের পরিসীমা নাই।" এই প্রসঙ্গে প্রতাপচন্দ্র যথার্থ লিখিয়াছেন যে, "the passing of the marriage Bill was the greatest triumph of Keshab's career as a reformer—" এবং এই আইনের ফলেই যে উত্তরকালে ভারতবর্ষে সমাজবিপ্লবের ক্ষেত্র প্রশস্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমাজসংস্কারক কেশবচন্দ্র তাই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবেন।

॥ ষোল ॥

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ বাংলার তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ। এই যুগসন্ধিক্ষণেই আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম এই নূতন বিবাহবিধি আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'। সমাজসংস্কারক কেশবচন্দ্রের প্রতিভা যেমন ভারতবাসীকে বিস্মিত করিল, সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি শুনিল কেশবচন্দ্র নির্ভীক কণ্ঠে বলিতেছেন — 'আমি হিন্দু নই, আমার একটি মাত্র পরিচয়ই আছে, আমি ভারতবাসী', তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা 'বঙ্গদর্শন'কে আশ্রয় করিয়া আর এক আকারে দেখা দিল—রুশো-বেন্থাম-মিলের ভাবধারার সহিত বঙ্কিমচন্দ্র নব্য হিন্দুধর্মের, নব্য বাঙালিয়ানার পরিবেশন করিতে লাগিলেন। একা কেশবচন্দ্র 'আমি হিন্দু নই'—ইহা বলাতে গোটা ব্রাহ্মসমাজই যেন সেদিন হিন্দুসমাজের অবজ্ঞার তলে পড়িয়া গেল। বাংলার নবজাগরণের স্রোত ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একই খাতে বহিয়াছে, কিন্তু এই দুইটি ঘটনার পর হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, সেই স্রোত দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় ইতিহাসের পথ কাটিয়া চলিল। "ব্রাহ্মসংস্কার যুগের অন্তে প্রতিক্রিয়ামূলক এক সমন্বয় যুগের আরম্ভ হইতে দেখা গেল।" রামমোহন হইতে কেশবচন্দ্র পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া স্বাধীন চিন্তার যে আদর্শ বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণকে সেদিন বেগবান করিয়া তুলিয়াছিল, যে সর্বভারতীয় জাতীয়তার উদ্বোধন করিয়া দিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল ইসলাম-বিরোধী মনোভাব ও সঙ্কীর্ণ বাঙালি-য়ানা এবং তাহার সহিত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের প্রচলিত হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের প্রয়াস মিলিত হইয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার পরিণাম যে শুভ হয় নাই, বর্তমানের ইতিহাস কি তাহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে না?

১৮৭২ এর পর হইতেই যুগ-বিপ্লবী কেশবচন্দ্রের খোলস হইতে বাহির হইয়া আসিলেন নববিধানাচার্য কেশবচন্দ্র। গৈরিকবস্ত্র পরিহিত

মুণ্ডিত-মস্তক কেশবচন্দ্র। বুদ্ধিজীবি বাঙালি সে কেশবচন্দ্রকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাই ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র-রামকৃষ্ণের যুগ অনিবার্যভাবেই আসিয়া গিয়াছিল। আর রাজনীতিতে আরম্ভ হইল সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহনের যুগ। কিন্তু তাই বলিয়া কেশবচন্দ্রের জীবনেতিহাসের বাকী এগার বৎসরের কাহিনী আমাদের জাতীয় জাগরণের পক্ষে কম মূল্যবান নহে। এই এগার বৎসর কালের মধ্যে তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি আমরা অতঃপর সূত্রাকারে বলিয়া যাইব।

১৮৭২। এপ্রিল মাস। ভারত সংস্কার সভার পক্ষ হইতে বাল্যবিবাহ নিবারণ ও সমাজের পতিতা স্ত্রীলোকদিগের উদ্ধারের চেষ্টা হয়। সভার পাঞ্জাব-শাখা এই বৎসরের এই সময়েই স্থাপিত হয়। 'ক্যালকাটা স্কুল ফর বয়েজ'-এর পরিচালনা ভার কেশবচন্দ্র গ্রহণ করেন ও উহা ভারত-সংস্কার সভার সহিত সংযুক্ত হয় এবং কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ-বিহারী সেনের অধীনে স্কুলটির উন্নতি হইতে থাকে। এই বৎসরের মে মাস হইতে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কেশবচন্দ্র বড়লাট নর্থব্রুককে শিক্ষাসম্পর্কে নয়খানি খোলা চিঠি লিখিলেন, পূর্ব অধ্যায়ে আমরা ইহার উল্লেখ করিয়াছি। চিঠিগুলি তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজে 'ভারতবন্ধু' বা *Indo philus*—এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। আধুনিক ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের এই পত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে স্বীকৃত হইবার দাবী রাখে। ৮ই আগষ্টের পত্রে তিনি ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রচলিত শিক্ষানীতির সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন: It is as much the duty of the State to extend education amongst *the mass* of the people as to improve the *quality* of the instruction at present imparted to the upper classes. The present system of education in India is defective, incomplete, and in some respects in-effectual and even hurtful. There must be something radi-cally wrong in our system of education when the mind under its influence gathers largely but loses readily, and is

difficient in sustaining cultures." লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, শিক্ষা সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের এই উক্তি আজো তাহার মূল্য হারায় নাই এবং তাঁহার এই মন্তব্য বর্তমান ভারতের শিক্ষানীতি সম্পর্কেও তুল্যভাবে প্রযোজ্য। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, কেশবচন্দ্র শুধু সামাজিক উন্নতির কথাই চিন্তা করেন নাই, ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথাই তিনি আজীবন চিন্তা করিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষা ভিন্ন, এদেশে বিজ্ঞান অনুশীলনও যে নিতান্ত আবশ্যক তাহাও তিনি বলিয়াছেন। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার সহিত তাঁহার যেমন ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, তেমনি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার (১৮৭৬ খ্রীঃ) তিনি ছিলেন অন্যতম অধ্যক্ষ।

প্রচারক সভা সংস্থাপন কেশবচন্দ্রের এই সময়কার আর একটি মহৎ প্রয়াস। নিয়মিতভাবে ও পরিপূর্ণ শৃঙ্খলার সহিত যাহাতে সমাজের প্রচার কার্য নির্বাহ হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই এই সভা স্থাপিত হইয়াছিল। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই বৎসরের শেষভাগে কেশবচন্দ্র অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং "প্রচার ও শরীরের স্বাস্থ্য উভয় উদ্দেশ্যে তিনি সপরিবারে কলিকাতা হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন" এবং ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহেই তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

১৮৭৩।

আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কেশবচন্দ্রের মিলন, এই বৎসরের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। সমসাময়িক ভারতবর্ষের ইতিহাসে দয়ানন্দের সংস্কার-উদ্যম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। দয়ানন্দ কলিকাতায় আসিয়া যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাগানবাড়িতে বাস করেন। কেশবচন্দ্র সেইখানেই তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। "কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ-কারের পর তিনি তাঁহার বাটিতে আগমন করেন এবং তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া গৃহে সভা হয়। পৌত্তলিকতা, অদ্বৈতবাদ, বর্তমান প্রণালীর জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি অনেক কথা বলেন। "দয়ানন্দের উন্নত ধর্মজীবন ও তীক্ষ্ণ মনীষায় কেশবচন্দ্র মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং এই সময়ে স্বামীজীর সহিত তাঁহার প্রণয় হয়, তাহা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।"

এই বৎসরের এপ্রিল মাসে টাউন হলে ভারত সংস্কার সভায় দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব হইল। লর্ড বিশপ এই সভায় সভাপতির কার্য করেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জি, শিবচন্দ্র দেব, প্রেমচাঁদ বড়াল, সর্দার দয়াল সিংহ, মৌলবি আবহুল লতিফ খাঁ, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক লেথব্রিজ প্রভৃতি। শিক্ষা এবং স্ত্রীজাতির উন্নতির কথাই এই সভায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল। এই বৎসরের শেষভাগে কেশবচন্দ্র আবার দুইমাসের জন্য প্রচার কার্যে বহির্গত হন; সঙ্গে ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, মহেন্দ্রনাথ বসু ও দীননাথ মজুমদার। সেই যে আট বৎসর পূর্বে নাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে কেশবচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "মনে করিয়াছি, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কেবল প্রচারকার্যে নিয়োগ করিব"—দেখা যায় তাহা তাঁহার কথার কথা ছিল না, ইহা তিনি অক্ষরে অক্ষরেই পালন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সর্বজনমান্য রাজনারায়ণ বসুর সহিত কেশবচন্দ্রের কী প্রীতির সম্পর্ক ছিল, তাহা আমরা ইঁহাদের দুইজনের চিঠিপত্রে অতি সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। কেশবচন্দ্র তাঁহার প্রতি পত্রেই রাজনারায়ণকে 'আমার প্রিয় ব্রহ্মপরায়ণ দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহাই ছিল কেশবচন্দ্রের প্রকৃতি, যাহার সহিত একবার যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে, শত বিরোধের মধ্যেও আজীবন তিনি সেই সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছেন। কেশব-চরিত্রের ইহাও একটি আশ্চর্য মহত্ত্ব।

১৮৭৫।

এই বৎসর আদি সমাজের সহিত মিলনের আর একটি প্রয়াস হয় এবং ২১শে জানুয়ারি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে দুই সমাজের এই 'রি-ইউনিয়ন' অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একটি দলের মধ্যে কিছুকাল যাবৎ যে কেশব-বিরোধী ভাব দেখা গিয়াছিল এবং যাহা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়াই কেশবচন্দ্র এই দিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার কলুটোলার ভবনে প্রচারকদিগের এক সম্মেলনে একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। ভারতাশ্রমের গ্লানির জের তখনো চলিতেছে; প্রচারকগণের জীবনের গতি ফিরাইবার জন্য এবং তাঁহাদের

মধ্যে শান্তি ও প্রীতির পবিত্র ভাব জাগাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহার এই প্রয়াস লক্ষ্য করিবার বিষয়। কেশবচন্দ্রের এই বৎসরের টাউন হলের বক্তৃতাটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বক্তৃতার বিষয় ছিল: *Behold the Light of Heaven in India* এবং এই বক্তৃতার শেষভাগে তিনি "ব্রাহ্ম-সমাজের উপর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, সময়ে সময়ে আমার মস্তকে অনেক জঘন্য অপবাদ আসিয়া নিপতিত হইয়াছে, অনেক জায়গায় চরিত্রে পর্যন্ত কলঙ্কারোপ করিয়াছে; কিন্তু তাহাতে আমি ভীত নহি।...আমাকে যে যাহা বলিতে চায়, বলুক; কিন্তু ঈশ্বর যে আলোক প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা নির্বাণ করিবে কাহার সাধ্য? আমি যে সাধু সঙ্কল্প সাধনের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি তাহা হইতে কেহই আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। আমি অগ্রসর হইব। বীরত্বের সহিত অগ্রসর হইব।" এই বক্তৃতাতেই কেশবচন্দ্র সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে নববিধানের উল্লেখ করিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রেমের ধর্ম' বক্তৃতায় যে ভাবটি তাঁহার চিন্তায় প্রথম ধরা পড়িয়াছিল, আজ পনর বৎসর পরে তাহাই কেশবচন্দ্রের চিন্তায় একটি পরিণত রূপ পাইতে চলিয়াছে দেখা যায়। শুনিতে পাই কেশচন্দ্রের 'নববিধান দুর্বোধ্য'; কিন্তু তাঁহার এই কথাগুলির মধ্যে তো অস্পষ্টতার লেশমাত্র দেখিতে পাই না: "What I aceept as the New Dispensation in India neither shuts out God's light from the rest of the world, nor does it run counter to any of those marvellous dispensations of His mercy which were made in ancient times...A new dispensation, therefore, has been sent unto us which presents to us not indeed a new and singular creed but a new development of by-gone dispensations."

নববিধান সম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ কিছু আলোচনা করিব।

ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের একটিমাত্র পরিচয় আছে—তিনি নববিধানাচার্য—একটি নূতন বিধানের উদ্গাতা। ব্রাহ্মসমাজের যখন পঞ্চাশ বৎসরকাল পূর্ণ

হইল তখন ইতিহাসের এক শুভক্ষণে কেশবচন্দ্র এই নববিধান ঘোষণা করেন। সকল ধর্মকে এক করা, মানবসভ্যতার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে এত বড়ো সত্য ইতিপূর্বে আর কাহারো চিন্তায় ধরা দেয় নাই, আর কেহ এমন আশ্চর্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন নাই। রামমোহন তুলনামূলক ধর্মালোচনার সূচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা তো পৃথিবীর মাত্র তিনটি প্রধান ধর্মকে অবলম্বন করিয়া। বিশ্বের যাবতীয় ধর্মের অথবা ধর্মমতের তুলনা ভিন্ন একটি common measure নির্ণয় করা সুকঠিন। বস্তুতঃ সকল ধর্মকে এক করিতে না পারিলে, বহুত্বকে একত্বে পরিণত করিতে না পারিলে তুলনা নিষ্ফল। পরিণত জীবনে কেশবচন্দ্র যখন এই সত্যটি উপলব্ধি করিলেন তখন তিনি বলিলেনঃ "জগৎকে এমন কিছু দেখাইতে হইবে যাহা বেদ বেদান্ত বাইবেল কোরাণ প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যাইবে না।" এই তিনি প্রথম ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ভূমিকাটি নির্ণয় করিয়া বলিলেনঃ "যদি অন্যান্য ধর্ম যাহা দিয়াছে, তুমি আবার তাহাই দিতে আসিয়া থাক, তবে, হে ব্রাহ্মসমাজ, তোমার পৃথিবীতে না আসাই ভাল ছিল। যদি তোমার নিজের কিছু দিবার না থাকে, যদি তুমি পুনরুক্তি করিতে আসিয়া থাক, তবে তুমি চলিয়া যাও, পৃথিবীতে তোমার কোন প্রয়োজন নাই।" এই কথা একমাত্র কেশবচন্দ্রের পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল, রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে নয়। নূতন হইতে নূতনতর জীবনলাভ—ইহাই তো নববিধানের মূল সূত্র।

১৮৮০। ২৫শে জানুয়ারি। ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে আচার্য কেশবচন্দ্র নববিধান ঘোষণা করিলেন। একটি সুন্দর রূপকের আশ্রয়ে তিনি এই আশ্চর্য বার্তা পৃথিবীতে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি নববিধানকে একটি নবশিশুর জন্মের সহিত তুলনা করিয়া বলিলেনঃ "পৃথিবী, শোনো, পঞ্চাশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজ গর্ভে ধর্মের শিশু গঠিত হইতেছিল, বহুকালের প্রসবযন্ত্রণার পর এক সর্বাঙ্গ সুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই শিশুর ভিতরে যোগ, ধ্যান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদয় গুণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেই শিশুর অন্তরে বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র বাইবেল কোরাণ সমুদায় রহিয়াছে। পৃথিবীতে যত ভাবের অবতার হইয়াছে, শিশু সকলকে আপনার ভিতরে এক করিয়া লইয়াছেন। নববিধান শিশু সংসারে স্বর্গ দেখাইবার জন্য জন্মিয়াছেন।" কী অপূর্ব এবং কী সুন্দর

এই ঘোষণা! সত্যই ইতিহাস সেদিন প্রসবব্যথায় কাঁদিয়াছিল। মানব-সভ্যতার ক্রমোন্নতির বিচিত্র ধারা যাঁহারা গভীরভাবে অনুসরণ করিয়াছেন এবং সেই ধারাপথে যাঁহারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এক-একটি মহৎ ভাবের, মহৎ চিন্তার অভ্যুদয়ের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন উনিশ শতকের অষ্টম দশকের সেই সময়টি সকল দিক দিয়াই একটি নূতন চিন্তার অভ্যুদয়ের পক্ষে উপযুক্ত ছিল।

কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্ম জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস যাঁহারা গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই ইহা দেখিতে পাইয়াছেন যে, তাঁহার ধর্মমত তাঁহার ধর্মজীবনের আরম্ভ হইতেই বিবর্তনের দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতেছিল। কেহ যেন না মনে করেন নববিধান কেশবচন্দ্রের একদিনের বা এক মুহূর্তের চিন্তার ফল। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি একবার সশ্রদ্ধ ও সানুরাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন দেখিতে পাইবেন এক সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে—বর্জন ও অর্জনের দ্বারা, subtraction ও addition দ্বারা তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তার শিখরে উঠিয়াছিলেন। বাহিরে যখন তিনি নানাবিধ কর্মের প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিলেন, সেই একই সময়ে সকলের অলক্ষ্যে আপনার মনে সংযোগ বিয়োগের প্রণালী ধরিয়া কেশবচন্দ্র ধর্মজীবনে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছেন—বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে একটি বিশ্বজনীন ধর্মের সন্ধান পাইয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক জীবনের এই চরম অবস্থাতেই যখন তিনি ঈশ্বরকে রূপ এবং অরূপের মধ্যে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, জীবনের সেই পরিণত চিন্তা ও উপলব্ধির আলোকিত মুহূর্তেই কেশবচন্দ্র ইতিহাসের মহাসত্য নববিধান ঘোষণা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের জীবনে আমরা লক্ষ্য করি যে, বরাবরই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তকদের মধ্যে একটি সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার *Great Men* বক্তৃতাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই স্মরণীয়। পৃথিবীর সকল ধর্মের অনুশীলন কেশবচন্দ্র যতখানি গভীরভাবে করিয়াছিলেন, এতটা রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথ করিতে পারেন নাই। এমার্সনের একটি কথা মনে পড়ে: "Person makes event, and event person"—আধুনিক কালের ভারতবর্ষে ধর্মের ক্ষেত্রে রামমোহন ও কেশবচন্দ্র

সম্পর্কে এই কথাটি বিশেষ ভাবেই প্রয়োজ্য। রামমোহনের একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা যেমন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, ইহার পঞ্চাশ বৎসরকাল পরে কেশবচন্দ্র কর্তৃক নববিধান ঘোষণা তেমনি আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। উনিশ শতকের ভারতবর্ষে, আমি বলিব, এই দুইটিই সর্বপ্রধান ঘটনা এবং শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের দেশে পরে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, চিন্তা করিয়া দেখিলে পরে দেখা যাইবে, সেগুলির মূলে আছে এই দুইটি ঘটনা ও এই দুইটি ব্যক্তি।

পৃথিবীর সকল ধর্মের, সকল মহাপুরুষদের জীবন ও জীবন-সত্যকে কেশবচন্দ্র যেমন গভীরভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ করেন নাই। তিনি উপনিষদ্, বৌদ্ধ, শাক্ত ও বৈষ্ণবযুগের পূর্বগামীগণকে যেমন স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি ঈশা মুশা মহম্মদকেও বাদ দেন নাই। সকল ধর্মমতই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। কেশবের যুগ সামঞ্জস্য ও মিলনের যুগ—নববিধান তাহার মঞ্চ। কেশবচন্দ্রের জীবনের সহিত পৃথিবীর পূর্ববর্তী সকল ধর্মাচার্যের জীবন অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য এইখানেই—এইখানেই কেশবচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য। মহাপুরুষের পূজা কেশব-জীবনের সব চেয়ে বড়ো কথা। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মহাপুরুষদিগকে স্মরণ করিয়া, পূজা করিয়া, তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিয়া, কেশবচন্দ্র নিজের ধর্মজীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছিলেন—এই জিনিস একমাত্র তাঁহার জীবনেই আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। অনেকের ধারণা কেশবচন্দ্র অন্যের নিকটে ঋণ করিয়া ধর্মজীবন ও ধর্মসমাজ গঠন করিয়াছিলেন, তাঁহার বুঝি কোনো মৌলিকতা ছিল না। কেশবচন্দ্র নিজেই ইহার উত্তর দিয়াছেন। একটি মাঘোৎসবের বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন : "সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যত সাধু দেশে দেশে, যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট আমরা ঋণী। সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক জীবের নিকট আমরা ঋণী। আমাদের ধর্মজীবনের প্রত্যেক রক্তবিন্দুর মধ্যে পৃথিবীর সাধুমহাজনদিগের ঋণ রহিয়াছে।" এই ঋণস্বীকার আর কিছুই নয়—ইহা হইল exchange and assimilation of thought এবং এই প্রক্রিয়ার ফলেই সকল দেশের

দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব ও পরিপুষ্টি সংসাধিত হইয়াছে। এই ভাবেই কেশবচন্দ্র একদিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, সকল ধর্মই সত্য। নববিধান তাঁহার এই সিদ্ধান্তের পরিণত রূপ। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, পৃথিবীতে একের পর এক মহাপুরুষ আসিয়াছেন, কালের ভাণ্ডারে তাঁহাদের প্রত্যেকের সুমহৎ চিন্তার যে শাশ্বত সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছিল, কেশবচন্দ্রের পূর্বে সেই সম্পদের সন্ধান এমনভাবে আর কেহ করেন নাই। ইতিহাসের ক্রম-অভিব্যক্তির পথে মানুষের যে নিয়তিনির্দিষ্ট পরিণতি—The Brotherhood of man and the Fatherhood of God—এই পথে সমগ্র মানব সমাজকে লইয়া যাইবার অব্যর্থ সংকেত আছে এই নববিধানের মধ্যে—ইহা কোন dogmatic, বা compartmental বা sectarian ধর্মমত নয়—ইহা বিশ্বমানবের মিলনভূমি—ইতিহাসের গর্ভ হইতে উদ্ভূত ইহা একটি নূতন আদর্শ, নূতন শক্তি। আবার স্মরণ করি কেশবচন্দ্রের সেই উক্তি—I was destined to be a man of faith—ইহা তাঁহার কথার কথা ছিল না—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একাভিমুখী সাধনা। এই বিশ্বাস-সাধনের পথে চলিতে চলিতেই তিনি একদিন নিখিল মানবের মধ্যে এক মহা একাত্মতার সন্ধান পাইয়া পৃথিবীকে শুনাইলেন: "As love makes man one with Divinity, so it makes man one with Humanity." নিঃসন্দেহে ইহা কেশব-মনীষার একটি মৌলিক বাণী।

নববিধানের মঞ্চ হইতে কেশবচন্দ্র যে সত্য ঘোষণা করিলেন তাহার মূল কথা—এক ঈশ্বর, এক বিধান এবং এক সমাজ। পঁচিশ বৎসরের গভীর সাধনার ফলেই তিনি এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। নববিধান কেশবচন্দ্রের কল্পনাবিলাসের রঙীন ফানুস নয়। নববিধানের মর্ম বুঝিতে হইলে তাঁহার *Future Church* বক্তৃতাটি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে হয়। এই বক্তৃতার একস্থানে তিনি সর্বপ্রথম নববিধানের ইঙ্গিত দিয়া বলিয়াছিলেন: "ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যে ধর্ম প্রাধান্য লাভ করিবে সে ধর্মে বিশ্বস্রষ্টার একত্ব ও অনন্তত্ব স্বীকৃত ও সমর্থিত হইবে। ভগবান যে ত্রিবিধ উপায়ে আত্মপ্রকাশ করেন—বাহিরে বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে (God in Nature), মানুষের আত্মার মধ্যে (God in Soul) এবং মহাপুরুষদের

মধ্যে (God in history) লোক তাহা স্বীকার করিবে, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করিবে যে, একই ভগবান এই তিন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন।" ইহার পর আরো তিনটি বক্তৃতায় (১৮৭০-এ ইংলণ্ডে সেণ্ট জেমস হলে যীশু খৃষ্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা ; ১৮৭৩-এর মাঘোৎসবে প্রত্যাদেশ সম্পর্কে বক্তৃতা এবং ১৮৭৫-এ *Behold the Light of Heaven* বক্তৃতা) কেশবচন্দ্র নববিধানের ইঙ্গিত করেন। এই শেষের বক্তৃতাটিতেই তিনি সর্বপ্রথম 'বিধান' শব্দটির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার এই সমন্বয়ীমানসের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিবার বিষয়। পরিকল্পনাটি সুস্পষ্ট রূপ লইল ১৮৭৬-এর মাঘোৎসবের বক্তৃতায়—সে বক্তৃতার বিষয় ছিল—*Our Faith and Experiences*। এইবার তিনি বলিলেন: "আমরা জীবিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করি ; কোনো Creed বা doctrine নয়—ঈশ্বরই আমাদের সব।" এই যে Total conception of God—এই অভিজ্ঞতার আলোকেই পৃথিবীতে নববিধান-রূপ নবশিশুর আবির্ভাবের পথ সেদিন আলোকিত হইয়াছিল।

বলিয়াছি, নববিধান মানবসভ্যতার ক্রমোত্তরণের ইতিহাসে একটি নবতর আলোকের অধ্যায়—একটি বহু প্রত্যাশিত illumination বা উদ্ভাসন। সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক মত ও বিশ্বাসের আবেষ্টনে এই বিধান বদ্ধ নয়—To light and more light—ইহাই নববিধান। তাই না কেশবচন্দ্র বলিলেন: "প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়ে শ্রদ্ধার সহিত আরো উজ্জ্বলতর আলোকের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, আরো নব নব সত্যলাভের আশায় হৃদয়কে উন্মুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে।" এই নবতর আলোক ও সত্যের সন্ধান দিয়া সভ্যতার ইতিহাসে কেশব-মনীষা যে মহাবিপ্লব সাধন করিয়া গিয়াছে, তাহার পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার দিন আজ আসিয়াছে। আবার বলি, নববিধান কেশবচন্দ্রের কল্পনা নয়, ইতিহাসেরই একটি সত্যকে তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বর উপলব্ধির দিন চলিয়া গেল, অতঃপর সকল মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঈশ্বরই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। নববিধান পাঁচফুলের সাজি সত্য, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, কেশবচন্দ্রের সেই পাঁচফুলের সাজি কি সকল ধর্মবিশ্বাসের একটি মৌলিক সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের রূপ লয় নাই? রামমোহনের সমন্বয় ছিল

বুদ্ধিভিত্তিক, কেশবচন্দ্রের সমন্বয় সম্পূর্ণ জীবনভিত্তিক—ইহা যুগপৎ synthesis ও fusion. একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, নববিধান এক কথায় সকল বিশ্বাসের সমন্বয়—syntheses of all faiths এবং এই আশ্চর্য সমন্বয় সাধন একমাত্র তাঁহার পক্ষেই সম্ভব ছিল যিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিয়াছিলেন: "I was destined to be a man of faith." এই বিশ্বাস—সকল ধর্মের সকল সত্যে বিশ্বাস হইতেই নববিধানের অভ্যুদয়। কেশবচন্দ্র জানিতেন প্রকৃত ধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই, সংঘর্ষ নাই। ধর্মে ধর্মে যে বিভাগ বা বিভেদ, ইহা বিধিনির্দিষ্ট নয়, ইহা কৃত্রিম। ধর্ম অখণ্ড উদার বস্তু, আকাশের ন্যায় বিশাল, বায়ুর ন্যায় বিশ্বব্যাপী, উহাতে সীমা নাই, সংকীর্ণতা নাই, গতি নাই। বিভাগ মানুষ করিয়াছে—বিভাগের ভিতর দিয়া প্রকৃত ধর্মলাভ অসম্ভব; ইহা দ্বারা ধর্মসাধন হয় না, ধর্মযুদ্ধ হইতে পারে। কেশবচন্দ্র এই বিভেদ—বিভাগকেই নববিধানের আদর্শের মধ্যে মিলাইয়া মিশাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। এই বিধানই একদিন পুরাতনকে রূপান্তরিত করিয়া এক নূতন জাতি গড়িয়া তুলিবে। নববিধান ক্রমবিকাশেরই চরম বিকাশ। *Yoga—Subjective and Objective*—এই গ্রন্থে কেশবচন্দ্র নববিধানের অতি সুন্দর ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ দিয়াছেন।

তারপর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাঘোৎসবের সময় মন্দিরের বেদি হইতে কেশবচন্দ্র এই বিশ্বজনীন উদার ধর্মের কথা ঘোষণা করেন। সমস্ত পৃথিবী তাহা কান পাতিয়া শুনিয়াছিল। এই বছরের টাউনহল বক্তৃতায় তিনি নিজেকে এবং তাঁহার অনুগামীদের নববিধানের বার্তাবহ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কেশবচন্দ্রের এই প্রসিদ্ধ বক্তৃতা হইতে কয়েকটি লাইন এইখানে তুলিয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন: "এই নববিধান সকল ধর্মপ্রবর্তক, সকল ধর্মশাস্ত্র ও সকল বিধানের এক অপূর্ব সঙ্গতি। ইহা কোন বিচ্ছিন্ন মতবাদ নয়। ইহা একরূপ বিজ্ঞান যাহা অন্য সকল ধর্মের অর্থ বুঝাইয়া দেয়, বিভিন্ন ধর্মের ভিতর সংযোগ ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করে, কলহনিরত ধর্মের ভিতর বন্ধুতা আনিয়া দেয় এবং পরবর্তী ধর্মের সহিত পূর্ববর্তী ধর্মের যোগ রক্ষা করে। জগতে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু শিব, যাহা কিছু সুন্দর, সে সমস্তই এই ধর্মে গৃহীত হইয়াছে।"

ব্রহ্মানন্দ স্বহস্তে এই নববিধানের পতাকা উড়াইয়া গিয়াছেন; পৃথিবীর সকল জাতি একদিন এই সার্বভৌমিক নববিধানের পতাকাতলে সমবেত হইবে, এমন আশা তাঁহার ছিল। বস্তুতঃ নববিধান সকল ধর্মের সার অর্থাৎ substance লইয়া জগৎকে প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞানের সামঞ্জস্য ও মিলন—synthesis and harmony বুঝাইয়া দিয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় বিধানের পূর্ণতা ইহারই মধ্যে। নিখিলবিশ্বে এই সজীব ধর্মের বিধান প্রচারের জন্য কেশবচন্দ্র দশহাজার ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ চাহিয়াছিলেন। কোথায় সেই অগ্নিময় উৎসাহে উদ্দীপ্ত মানুষ, যাঁহারা নববিধানের পতাকা স্কন্ধে লইয়া সারা পৃথিবীতে এই সমন্বয়ের বাণী ছড়াইয়া দিবেন? কেশবচন্দ্র তো যাহা দিবার তাহা দিয়া গিয়াছেন, এখন পৃথিবীর বুকে নববিধানের জয়রথ চালাইবার দায় ও দায়িত্ব আমাদের।

রামকৃষ্ণ-কেশবচন্দ্র সাক্ষাৎকার এই বৎসরের (১৮৭৫ খ্রীঃ) আর একটি ঘটনা।

বেলঘরিয়ার যে উদ্যানে ভারতাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল, উহাই পরে 'তপোবনে' রূপান্তরিত হয় এবং সেই নির্জনাবাসে কেশবচন্দ্র যখন বাস করিতেছিলেন সেই সময়ে একদিন মার্চ মাসের শেষের দিকে রামকৃষ্ণ পরমহংস কেশব-সন্দর্শনে এখানে আসিলেন। ইতিপূর্বে রামকৃষ্ণ যখন আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনা শুনিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি কেশবচন্দ্রকে উপাসনা করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সেই ঘটনার বার বৎসর পরে রামকৃষ্ণ আজ আসিলেন কেশবচন্দ্রের নিকট—তখনও পর্যন্ত কলিকাতায় শিক্ষিত সমাজে তিনি সুপরিচিত হইয়া উঠেন নাই; দুই চারি-জন ব্যতীত তখনো রামকৃষ্ণের নাম কেহ শোনে নাই, তাঁহার আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য জানা তো দূরের কথা। এই মিলনের ফলে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং রামকৃষ্ণ যে মাতৃভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন, সেই আদর্শের প্রভাব কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনে গভীরভাবেই পড়িয়াছিল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: "The acquaintance of this devotee which soon matured into intimate friendship,

had a powerful effect upon Keshav's catholic mind." রামকৃষ্ণকে প্রথম দেখিয়া কেশবচন্দ্রের মনোভাব কি হইয়াছিল তাহা তিনি এই সময়কার 'সুলভ সমাচার' 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ও ধর্মানুরাগী সমাজে তিনিই সেদিন রামকৃষ্ণকে প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন—ইহাই প্রকৃত ইতিহাস। একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র প্রতিমা-পূজক হিন্দু সাধু রামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে প্রকাশ্য পত্রিকায় লিখিয়াছেন—সংরক্ষণশীল আদি-সমাজীদের ইহা মনঃপূত হয় নাই, এমন কি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কাহারো কাহারো চক্ষে ইহা সেদিন বিসদৃশ মনে হইয়াছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্রের দৃষ্টিতে দক্ষিণেশ্বরের এই সহজ সরল, ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত মানুষটি কি ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের কথাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন: "আমরা এই মহাত্মাকে যতবার দেখিতেছি, ততবার তাঁহার উচ্চ জীবন ও ভাব দেখিয়া অবাক হইতেছি। আমরা দেখিতেছি, তিনি একজন প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার মতন লোক আর এদেশে আছে কি না সন্দেহ।...তিনি নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী দুই-ই।" (সুলভসমাচার, ১৬ই আশ্বিন, ১২৮৮, ইং ১৮৮২ খ্রীঃ) কলিকাতায় রামকৃষ্ণের সহিত যেমন, গাজীপুরের পওহারি বাবার সহিতও তেমনি কেশবচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা ছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে যখন তিনি উত্তর ভারতে ধর্মপ্রচারে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে কেশবচন্দ্র গাজীপুরে একমাস কাল অবস্থান করেন ও তখনই তিনি পওহারি বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পওহারি বাবা কেশবচন্দ্রকে 'স্বামিজী' বলিয়া ডাকিতেন। কেশবচন্দ্রের জীবনেতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তিনি প্রায়ই কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য কলুটোলায় আসিতেন; কেশবচন্দ্রও মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিয়া আসিতেন। ১৮৭৭-এর মাঘোৎসবের পর একদিন রামকৃষ্ণ স্বয়ং ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া সেই উপাসনা স্থলের পবিত্রতা দেখিয়া সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন।

১৮৭৭।

এই বৎসর টাউনহলে (৫ই মার্চ) কেশবচন্দ্র *Philosophy and Madness in Religion* সম্পর্কে যে বক্তৃতা করিলেন তাহাতে তিনি পাশ্চাত্ত্য দর্শনের বিবর্তনবাদের সহিত ভারতীয় সাংখ্যদর্শনের সমন্বয় করিবার একটি চেষ্টা করেন। এই বৎসরের শেষভাগে দেখিতে পাই যে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম—পৃথিবীর এই চারিটি প্রাচীন ধর্মের গভীর অনুশীলনের জন্য তিনি যথাক্রমে গৌরগোবিন্দ, অঘোরনাথ, প্রতাপচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্রের উপর ভার অর্পণ করিলেন। কেশবচন্দ্রের কর্মজীবনে এই চারজনই ছিলেন তাঁহার বিশেষ অনুবর্তী। গৌরগোবিন্দের অসাধারণ মনীষা ছিল; 'ধর্মতত্ত্ব' সম্পাদনে তিনি কেশবচন্দ্রের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াই কেশবচন্দ্র ইঁহার উপর হিন্দুশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়া গ্রন্থ প্রচারের ভার দিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে সাধু অঘোরনাথ ছিলেন একজন মহাভক্ত যোগী ও সাধক। অঘোরনাথ ছিলেন বিজয়কৃষ্ণের সহপাঠী এবং বিজয়কৃষ্ণই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ তথা কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে লইয়া আসিয়াছিলেন। 'শ্লোকসংগ্রহ' সংকলনে তিনিই ছিলেন কেশবচন্দ্রের প্রধান সহায়ক। 'শাক্যমুনি চরিত' অঘোরনাথের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; বাংলা ভাষায় বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে এমন উচ্চাঙ্গের আলোচনা তাঁহার পূর্বে আর কেহই করিতে পারেন নাই। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ছিলেন কেশবচন্দ্রের নিকটতম আত্মীয়। মাত্র সতর বৎসর বয়সে ইনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে আসেন; প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ, পরে কেশবচন্দ্রের অনুবর্তী হইয়া প্রতাপচন্দ্র ধর্মের জন্য জীবনোৎসর্গ করেন। ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত প্রতাপচন্দ্র ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি পর্যটন করিয়াছিলেন এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বধর্মসম্মেলনে তিনি ভারতবর্ষের ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল এবং তাঁহার *Oriental Christ* একখানি জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ। গিরিশচন্দ্র সেনের নাম বাংলা সাহিত্যে সুবিদিত। রামমোহনের পর আমাদের দেশে ইসলামধর্ম সম্বন্ধে এমন গভীর ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা আর কেহ করেন নাই। "কেশবচন্দ্র যখন সর্বধর্ম-

সমন্বয় করিবার জন্য বিভিন্ন ধর্মের মূলতত্ত্ব আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি গিরিশচন্দ্রের উপর মূল আরব্য ও পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্ম-গ্রন্থাদি অনুবাদ করিবার ভার অর্পণ করেন।" পরিণত বয়সে তিনি লক্ষ্ণৌ গিয়া ঐ দুই ভাষা আয়ত্ত করেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি 'কোরাণ শরিফ' অনুবাদ করেন। মূল আরব্য ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় 'কোরাণ শরিফে'র ইহাই প্রথম অনুবাদ। তখন হইতেই তিনি 'মৌলভি' গিরিশচন্দ্র নামে খ্যাত হন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রথম জীবনচরিতকারও ইনি। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' আমরা যে গোষ্ঠী-মনের (Collective mind) পরিচয় পাই, কেশবচন্দ্রও তেমনি এইভাবে ইঁহাদের লইয়া অনুরূপ একটি গোষ্ঠীমন গঠন করিয়া বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি-সাধন করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সাহিত্যসাধনায় কেশব-মণ্ডলীর দান অতুলনীয়। বলা বাহুল্য, কেশবচন্দ্রই ছিলেন ইহার নেপথ্য প্রেরণা।

এই বৎসরে কেশবচন্দ্রের জীবনের আরো দুইটি ঘটনা প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে একটি হইল মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সমাজের পক্ষ হইতে সাহায্যের ব্যবস্থা করা ; দ্বিতীয়টি হইল পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র স্থানে বাস করিবার জন্য সার্কুলার রোডে 'কমলকুটীর' স্থাপন।

ইহার পর কেশবচন্দ্রের জীবনের কাহিনী একান্তভাবেই আধ্যাত্মিক। তাঁহার সেই সুগভীর এবং ব্রহ্মানুভূতি উদ্ভাসিত দিব্য জীবনের পরিচয় মিলিবে 'প্রার্থনা', 'আচার্যের উপদেশ', 'জীবনবেদ', 'সাধুসমাগম' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির মধ্যে। বাংলার ধর্মসাহিত্যে কেশবচন্দ্রের এই বইগুলি বিশিষ্ট সম্পদ এবং কেশব-মানসের অনুশীলনের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য। কেশব-চন্দ্রের শেষ জীবনের দুইটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য ; একটি তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর সহিত কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজার বিবাহ (১৮৭৮, ৬ই মার্চ)। এই বিবাহ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন অনুসারে হইয়াছিল। আর দ্বিতীয়টি হইল এই বিবাহের অব্যবহিত পরেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম (১৪ই মে, ১৮৭৮)। এই দুটি ঘটনাই সমকালীন বাংলার

ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে এবং প্রথম ঘটনাটি অত্যন্ত বিতর্কমূলক বলিয়া আমরা এখানে তাহার সবিস্তার উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামটি দেবেন্দ্রনাথই দিয়াছিলেন। চার্চ অব ইংলণ্ডের অনুকরণে গঠিত এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সেদিন যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শিবচন্দ্র দেব, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথশাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতসভা (Indian Association) সমসাময়িককালের আর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা এবং ইহার উদ্যোক্তাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন ছিলেন প্রধান। জাতীয় আন্দোলন ও রাজনৈতিক উন্নতি ছিল ভারতসভার লক্ষ্য। ব্রাহ্মসমাজ দ্বিতীয়বার বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায়, এই সময় হইতেই কেশবচন্দ্রের অন্যান্য মহৎ কার্যের প্রতি অনেকে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে থাকেন এবং কেশবচন্দ্রের নিজের সমাজও তখন কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র যাহা কিছু করেন, ঈশ্বরের আদেশে করেন, এই কথা কুচবিহারের বিবাহের পর অনেকেই আর নির্বিচারে মানিয়া লইতে পারে নাই। ক্রমে কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হইয়া উঠিল; কেশবচন্দ্র ইহা বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের টাউনহল বক্তৃতায় (২২ জনুয়ারি) কেশবচন্দ্র তাঁহার আচরণের কৈফিয়ৎ দিলেন। এই দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল: *Am I an inspired Prophet?* এবং তাঁহার বহু প্রসিদ্ধ বক্তৃতার মধ্যে ইহা অন্যতম। এইদিন দুই হাজার শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সকলে অতি উৎসুক অন্তঃকরণে, স্থির শান্তভাবে কেশবচন্দ্রের মুখে শুনিলেন: "I am a singular man, I am not as ordinary men are and I say this deliberately. I say this candidly. I am conscious of marked peculiarities in my faith and character... Am I a prophet? No. Am I a singular man? Yes. The whole of my life blood that is in me will dry up in a moment if I am cut off from my mission; I have no life apart from my Father's work...Would you have me reject God and

Providence and listen to your dictates in preference to this inspiration? Keshub Chandra Sen cannot do it, will not do it. I must do the Lord's will."

কেশবচন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম, প্রত্যেকটি চিন্তা এই সাক্ষ্যই বহন করে যে, তিনি আজীবন ঈশ্বরাদেশেই চালিত হইয়াছিলেন। তারপর ব্রাহ্মধর্মকে সকল দেশের, সকল জাতির, সকল সম্প্রদায়ের উপযোগী প্রগতিশীল ক্রমবিকাশোন্মুখী এক বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণত করিয়া, সকল প্রাচীন ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়া কেশবচন্দ্র যেদিন (১৮৮১ খ্রীঃ) ব্রহ্মমন্দিরের বেদি হইতে জগতে নবধর্ম—'নব বিধান' ঘোষণা করিলেন সেইদিন আমরা বুঝিলাম যে কেশবচন্দ্র একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি—*singular* মানুষ। ইতিহাসে এমন মানুষের সাক্ষাৎ কদাচিৎ পাওয়া যায়।

১৮৮৪। ৮ই জানুয়ারি।

কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু হইল।

জীবনবেদের উদ্গাতা, অগ্নিমন্ত্রের সাধক কেশবচন্দ্রের জীবনব্যাপী সাধনা ইতিহাসের কোন্ গূঢ় অভিপ্রায়কে সিদ্ধ করিল, মহাকাল তাহার বিচার করিবেন। কিন্তু আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা এই যে, ব্রাহ্মধর্মকে তিনি একটি সমন্বয়ের ধর্মে ও সর্বজনীন ধর্মে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। মানবজাতির নিয়তি যে পূর্ণতার পথে তাহাও তিনি নানাভাবে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। রামমোহন হইতে কেশবচন্দ্র—ব্রাহ্মসভা স্থাপনের কাল হইতে নববিধানের ঘোষণাকাল পর্যন্ত মাত্র অর্ধশতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং ইহারই মধ্যে ইতিহাসের একটি নিগূঢ়তম এবং প্রয়োজনীয় সত্যের আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। যে অসাধারণ প্রতিভা এই অসাধ্যসাধন করিল—যাঁহার ধর্মানুরাগ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র একটি শতাব্দীর ইতিহাসের একাংশকে চিরদিনের জন্য মহিমামণ্ডিত করিয়া গেল—সেই কেশবচন্দ্র সম্পর্কে মহর্ষির একটি কথাই আমাদের বার বার মনে পড়ে—"ব্রহ্মানন্দ তো কোনো অভাব রাখেন না।"

মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনে একা কেশবচন্দ্র কত যে কাজ করিয়া গিয়াছেন এবং আরো কত বিষয়ের সূচনাও তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একটি পুস্তকে তাঁহার বৈপ্লবিক মনীষার সকল কথা আলোচনা করা অসম্ভব, আমি শুধু দিগ্‌দর্শন করিলাম। বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাসে ধর্মনেতা, ধর্মোপদেষ্টা, স্বাধীন চিন্তার প্রবর্তক, সমাজ ও রাষ্ট্র-সংগঠক এবং সমাজসেবী হিসাবে যিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন সেই কেশবচন্দ্র সম্পর্কে আজ নূতন করিয়া আলোচনা করিবার দিন আসিয়াছে। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল যথার্থই বলিয়াছেন: "বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাঙালি যে স্বাধীনতা মন্ত্র সাধন করিয়া আসিয়াছে, বলিতে গেলে কেশবচন্দ্রই সেই মন্ত্রের একরূপ দীক্ষাগুরু। জাতীয় স্বাধীনতা জগতের সর্বত্রই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রচেষ্টা যে পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শের প্রচেষ্টা লাভ করিয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহা বিশুদ্ধ উদার এবং অপরাজেয় হইয়াছে এবং হইতেছে। এই দিক দিয়া ভারতের বিশেষতঃ বাংলার বর্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার মূলে একরূপ প্রথম শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুরূপে কেশবচন্দ্রকে দেখিতে পাই।"

এই সত্যের আজ অনুশীলন প্রয়োজন, তবেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের স্থাননির্ণয় এবং তাঁহার বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হইবে। সাহিত্যে, সমাজসংস্কারে, ধর্মসংস্কারে, সমাজসেবায় এবং সর্বোপরি জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সংস্কার-সাধনে এই একটি মানুষের জীবনব্যাপী কর্মসাধনার সহিত পরিচিত হইবার দিন আজ আসিয়াছে। কেশবচন্দ্রের জীবনব্যাপী কর্ম ও চিন্তার মধ্যে কোনো ফাঁক ও ফাঁকি নাই, উহা যেন একখানি নিটোল গ্রানিট পাথর। বাঙালির সমাজজীবনকে, তাহার অধ্যাত্মজীবনকে তিনি যেন নূতন গরিমা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সামঞ্জস্য ও মিলন—synthesis and harmony—ইহাই কেশবচন্দ্র। ইতিহাসের ঈশ্বরকে তিনি মানুষের প্রাত্যহিক

জীবনের চেতনায় চিরকালের মতন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। সভ্যতার পথে মানুষের ক্রমোত্তরণ নিয়তিনির্দিষ্ট, সম্প্রসারণ ও উন্নতি তাঁহার অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। তাহার সেই ক্রমোত্তরণের পথকেই এক নূতন সত্যের নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন উনবিংশ শতকের একটি মানুষ। আগামীকালের মানুষ যখন প্রশ্ন করিবে—কে তিনি ?

ইতিহাস সেদিন উত্তর দিবে—তিনি কেশবচন্দ্র সেন।

Colootola.
Calcutta
16 February 1874.

My dear Sir,

The bearer will hand you Rs. 120 being the Maharaj Cooman of Bettiah's donation to the Sanscrit College to be given to the best student of the institution who may fail to obtain a Government Scholarship. The amount should be awarded in the shape of a scholarship of 10 Rs. a month tenable for one year.

Yours sincerely
Keshub Chunder Sen

I hope you will kindly send a formal receipt of the money to the Maharaj Coomar, 15 Theatre Road, tomorrow positively.

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে লিখিত কেশবচন্দ্রের একখানি চিঠির প্রতিলিপি

॥ পরিশিষ্ট ॥

কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ'—প্রার্থনা

[কেশবচন্দ্রের 'জীবনবেদ' জীবনতত্ত্ব বিষয়ে একটি অপূর্ব গ্রন্থ। ভাব ও ভাষার দিক হইতে নিঃসন্দেহে ইহা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃত, তেলেগু, মারাঠি, ইংরেজি ও ফরাসী—এই কয়টি ভাষায় বইটি অনুবাদিত হইয়াছে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইবার পর হইতে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বইটির আটটি সংস্করণ হইয়াছে। "সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন। বিশ্বাসীর জীবন, সাধকের জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ।"—এই মহান্ তত্ত্বই 'জীবনবেদ' গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ে ব্যক্ত হইয়াছে। এইখানে 'প্রার্থনা' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়টির কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল।]

আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্মসমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্মগুলি প্রচার করিয়া কোন একটী ধর্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক শ্রেণীতে যাই নাই,—ধর্ম-জীবনের সেই উষাকালে "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর" এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল। ধর্ম কি, জানি না ও ধর্মসমাজ কোথায়, কেহ দেখায় নাই; গুরু কে, কেহ বলিয়া দেয় নাই; সঙ্কট বিপদের পথে সঙ্গে লইতে কেহ অগ্রসর হয় নাই—জীবনের সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভাস স্বরূপ "প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই" এই শব্দ উচ্চারিত হইত। কেন, কিসের জন্য প্রার্থনা করিব তাহাও সম্যক্‌রূপে বুঝিতাম না। তর্ক করিবারও সময় হয় নাই। কেন প্রার্থনা করি, জিজ্ঞাসা করিবার লোকও ছিল না। কে প্রার্থনা করিতে বলিল, তাহাও কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভ্রান্ত হইতে পারি—এ সন্দেহও হইল না। প্রার্থনা করিলাম। ভিত্তিস্থাপনের সময় কে অট্টালিকার সৌন্দর্য চিন্তা করে? কি রং দিব

বারান্দায়, তাহা কি মানুষ তখন ভাবে? তখন কেবল অটলভাবে ভিত্তিই স্থাপন করিতে হয়।

"প্রার্থনা কর, বাঁচিবে; চরিত্র ভাল হইবে; যাহা কিছু অভাব, পাইবে" —এই কথাই জীবনের পূর্বদিক হইতে পশ্চিমে, উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইত। এই ভাবনারই ভাবুক হইয়াছিলাম; এই কর্মেরই কর্মী হইয়াছিলাম। প্রার্থনা গুরু, অসহায় জনের অপার সহায়। এই একজনকেই চিনিয়াছিলাম, একজনের সঙ্গেই আলাপ হইয়াছিল, আর কাহাকেও জানিতাম না। ধর্মবন্ধু কেহ ছিল না। আকাশের দিকে তাকাইতাম, কোন বিধানের কোন কথা শুনিতাম না, কোন ধর্মতত্ত্ব বুঝিতাম না। গির্জায় যাইব কি মস্‌জিদে যাইব, দেবালয়ে যাইব কি বৌদ্ধদিগের দলে যোগ দিব,— তাহার কিছুই ভাবিতাম না। প্রথমেই বেদ বেদান্ত, কোরাণ পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম।

আমি বিশ্বাসী; বিচার করি, আর বিশ্বাস করি। একবার বিশ্বাস করিলে আর টলি না। চক্ষু দ্বারা বিচার করিলাম। হইয়াছে কি?—বিচারের জন্য এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। "হইয়াছে—আরও চল"—এই উত্তর পাইলাম। সকালে একটি আর রাত্রিতে একটি, লিখিয়া প্রার্থনা সাধন করিতে লাগিলাম। ক্রমে উষা হইতে প্রাতঃকালে আসিলাম। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। চারিদিক আচ্ছন্ন ছিল অন্ধকারে, পরিষ্কৃত হইয়া পড়িল। পথ ঘাট, বাড়ি ঘর, সকল দেখা গেল। এই প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, দুর্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম। দেখি, আর সে শরীর নাই, সে ভাব নাই। কি কথার বল! কি প্রতিজ্ঞার বল! বলিলেই হয়, প্রতিজ্ঞা করিলেই হয়! পাপকে ঘুসি দেখাইতাম আর প্রার্থনা করিতাম। সন্দেহ, অবিশ্বাস, পাপ, প্রলোভনকে ভয়ানক মূর্তি দেখাইতাম। প্রার্থনা করিব, বলিলেই সব ভয় পাইত।

যেমন আন্ধার করিয়া বসিতাম ঠাকুরের পদতলে, কিছু লইতাম। কিছু পাইতে হইবে, কে দিবে? কোথায় যাইতে হইবে? কে পথ দেখাইবে? পাপকে কে দূরীভূত করিবে? সকল বিষয়ই সহায় প্রার্থনা। তখন কেবলমাত্র প্রার্থনা-ধনই ছিল; তাহারই উপর কেবল নির্ভর করিতাম।

সুখের প্রত্যাশা করিতাম প্রার্থনার নিকট। সাহায্য পাইতে হইলে প্রার্থনার আশ্রয় লইতাম। "সবে ধন নীলমণি" যেমন কথায় বলে, প্রার্থনা আমার তেমনই ছিল।

তোমাদের বন্ধু কেবল এই একটী পরম সহায় পাইয়াছিল। কি পুস্তক পড়িতে হইবে, কি আলোচনা করিতে হইবে, কার কাছে যাইতে হইবে,—কিছুই জানিতাম না। সে অবস্থায় না ফেলিলে এত বিশ্বাস বোধহয় প্রার্থনার উপর হইত না। কেহ কিছু বলিলে চক্ষু বন্ধ করিয়া বলিতাম,—"প্রার্থনা! কোথায় রহিলে? বিপদকালে কাছে এস।" আমি বাংলা ভাল জানিতাম না যে, ভাবাবদ্ধ করিয়া প্রার্থনা করি। ভাব রাখিতে পারিতাম না। জানালার ধারে বসিয়া চক্ষু খুলিয়া একটি কথা বলিতাম। তাহাতেই আনন্দ ভারি। এক মিনিটে মহামূল্য রত্ন লাভ। রত্ন পাইয়া কাকে দিব, কার কাছে গিয়া বলিব, তখন এমনই করিয়া সময় গেল। এই জন্যই প্রার্থনাকে এত ভালবাসি। তোমরা যেমন বন্ধু, প্রার্থনা আবার তদপেক্ষা বন্ধু। যদিও অদৃশ্য, তথাপি তাঁহাকে আমি বন্ধু বলিয়াই জানি। বোধহয় এখানকার সকল লোক অপেক্ষা আমি অধিক ঋণে প্রার্থনার কাছে আবদ্ধ আছি; কেন না, এমন সময় ছিল যখন আমার প্রার্থনা ব্যতীত আর কেহই ছিল না।

আমি জানিতাম, প্রার্থনা করিলেই শোনা যায়। আদেশের মত এইরূপ প্রথম হইতেই হৃদয়ে নিহিত আছে। কি ধর্ম লইব, প্রার্থনা তাহার উত্তর দিতেন। অফিসের কাজ ছাড়িব কি, ধর্মপ্রচারক হইব কি, প্রার্থনাই তাহা বলিয়া দিতেন। স্ত্রীর সহিত কিরূপ সম্পর্ক রাখিব, প্রার্থনা তাহা নির্ধারণ করিতেন। টাকার সহিত কি সংস্রব, প্রার্থনাই তাহার ব্যবস্থা করিতেন। আদেশের মত বড় তখন ভাবিতাম না। প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, দেখিতে চাহিলে দেখা যায়, শুনিতে চাহিলে শোনা যায়,—এই জানিতাম। বুদ্ধি এমনই পরিষ্কার হইল প্রার্থনা করিয়া, যেন দশ বৎসর বিদ্যালয়ে ন্যায়-শাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, কঠোর শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া আসিলাম। আমাকে ঈশ্বর বলিলেন,—"তোর বইও নাই, কিছুই নাই, তুই কেবল প্রার্থনাই কর্।" প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতাম। কই, কাজ ছাড়িব কি না, বলিলে না? উহা কিরূপে হইবে, জানাইয়া দিলে না?

কেবল এইরূপ করিতাম, ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলাম, সাধক হইলাম, প্রচারক হইলাম, উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলাম,—সব হইল। প্রার্থনা মানি বলিয়াই, জীবন যাহা, তাহা। প্রার্থনা মানি বলিয়াই বন্ধুদিগের অবস্থা মন্দ দেখিতেছি।

প্রার্থনা সম্বন্ধে প্রবঞ্চনা আমাদের মণ্ডলী হইতে দূর করা আবশ্যক। যে প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য অপেক্ষা করে না,—সে প্রবঞ্চক। যার উপরে ভিতরে সমান নয়, যে বহুভাষী হয়, মনটা সে সবসময় ঠিক রাখে না,—সে প্রবঞ্চক। প্রার্থনার অবস্থা বড় কঠিন অবস্থা। যে বহুভাষার স্রোতে চলিয়া যায়—সে প্রবঞ্চক। সকালে প্রার্থনার সময় কি বলিয়াছে, বৈকালে মনে নাই ; রবিবারে কি বলিয়াছে, মঙ্গলবারে জিজ্ঞাসা করিলে আর বলিতে পারে না,—সে প্রবঞ্চক। ধন মানের জন্য, সংসারের জন্য, কিম্বা চৌদ্দ আনা ধর্ম আর দুই আনা সংসারের জন্য, অথবা সাড়ে পনের আনা পারত্রিক সদ্গতি আর আধ আনা সংসারের জন্য যে কামনা করে, প্রার্থনা সম্বন্ধে সে প্রবঞ্চক। পরীক্ষাতে শিখিয়াছি,—একটী পয়সা সংসারের জন্য যে চাহিবে, তার সমস্ত প্রার্থনা বিফল হইবে ; এই জন্য প্রার্থনা বিমল রাখিবে। শেষে ইহলোক, পরলোক, সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হইবে। এক, দুই, তিন, চার, ঠিক দিয়া তেরিজ কষিয়া যেমন অভ্রান্তরূপে কি হইল বলা যায়,—প্রার্থনার সত্যও তেমনি করিয়া বোঝান যায়। বন্ধুদিগকে এই জন্য কেবল প্রার্থনা করিতে বলি। সকলেই স্ত্রী-পুত্র অপেক্ষা প্রিয় জানিয়া, ধর্ম-গ্রন্থ জানিয়া, ধর্ম্ম ও সংসারের সম্বন্ধে সার বস্তু জানিয়া এই প্রার্থনাকে যেন আদর করেন।*

---

* ২৩শে জুলাই, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিবৃত।

॥ গ্রন্থ নির্দেশিকা ॥

১। **জীবনবেদ**—কেশবচন্দ্র সেন
২। **সঙ্গত**— ঐ
৩। **নবসংহিতা**— ঐ
৪। **প্রার্থনা**— ঐ
৫। **আচার্যের উপদেশ**—ঐ
৬। **সাধু সমাগম**— ঐ
৭। **পত্রাবলী**— ঐ
৮। **আচার্য কেশবচন্দ্র**—গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়
৯। **কেশব-চরিত**—চিরঞ্জীব শর্মা
১০। **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট**—প্রিয়নাথ শাস্ত্রী
১১। **আত্মচরিত**—রাজনারায়ণ বসু
১২। **আত্মচরিত**—শিবনাথ শাস্ত্রী
১৩। **অতীতের ব্রাহ্মসমাজ**—ত্রৈলোক্যনাথ দেব
১৪। **ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন**—গিরিশচন্দ্র নাগ
১৫। **কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য**—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১৬। **ধর্মতত্ত্ব, সুলভসমাচার ও** *Indian Mirror*
১৭। *Keshab Chandra Sen*—Protap Chandra Mazumder
১৮। *Biography of a New Faith*—P. K. Sen
১৯। *Autobiography of Maharshi Devendra Nath*
—S. N. Tagore
২০। *Autobiography of an Indian Princess*
—Maharani Sunity Deve
২১। *Brahmananda Keshav*—Prem Sunder Basu
২২। *Lectures in India*—Keshab Chandra Sen
২৩। *Lectures in England*— do
২৪। *Nine Letters on Educational Measures*—do

“সামঞ্জস্য ও মিলনই কেশবচন্দ্রের জীবন। কেশবচরিত্র মহাসাগরের ন্যায় প্রশান্ত এবং গম্ভীর। বিচিত্রতায় ইহা অনুপম। সেই মহাজীবনের কমনীয় স্নিগ্ধ রশ্মি পুরুষানুক্রমে দেশ-দেশান্তরে বিকীর্ণ হইয়া পড়িবে। কেশবের সঞ্চিত ধর্ম-সম্পত্তি এখন পৃথিবী মনের সাধে উপভোগ করুক। ধন্য বঙ্গদেশ! যে সে এমন লোকগুরু ধর্মাচার্যকে বক্ষে ধরিয়াছিল। ধন্য ঊনবিংশ শতাব্দী! যে সে এমন পবিত্র সন্তানকে দেখিল।”

—চিরঞ্জীব শর্মা

চার টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ